ক্রীড়াবিজ্ঞান

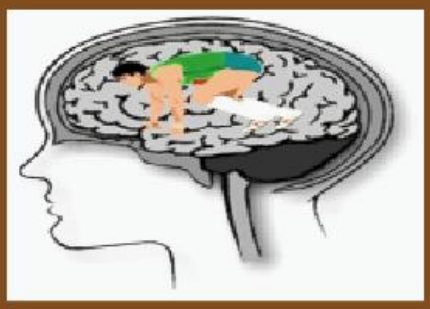

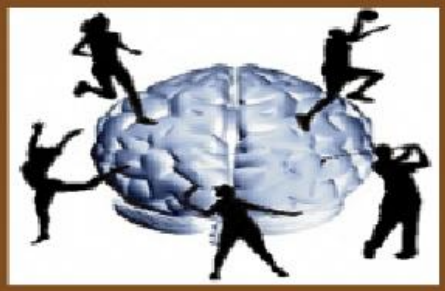

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বি-স্পোর্টস/বিএ/বিএসসি ডিগ্রির সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত

ক্রীড়াবিজ্ঞান

স্নাতক শ্রেণির জন্য

রচনায়

- **নুসরাৎ শারমিন** উপ-পরিচালক, ক্রীড়াবিজ্ঞান (অ.দা)
- **মো: বখতিয়ার** সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, এক্সারসাইজ ফিজিওলজি
- **ড. আবু তারেক** সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স
- **সাদেকা ইয়াসমীন** রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটস, স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স
- **মোহাঃ শফিকুল ইসলাম** স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট
- **আবু ওবায়দা ভুঞা লিংকন** ফিজিও থেরাপিস্ট, স্পোর্টস মেডিসিন
- **লুৎফা আক্তার** ফিজিও থেরাপিস্ট, স্পোর্টস মেডিসিন

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ক্রীড়াবিজ্ঞান

- নুসরাৎ শারমিন
- মো. বখতিয়ার
- ড. আবু তারেক
- সাদেকা ইয়াসমিন
- মোহাঃ শফিকুল ইসলাম
- আবু ওবায়দা ভুইয়া লিংকন
- লুৎফা আকতার

প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল-২০১৬
মুদ্রণ ও পরিবেশনা: রূপ প্রকাশন
৩৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন-০১৮১৯১৩৭৪৫৫
মূল্য : ৩৫০.০০
আইএসবিএন-৯৭৮-৯৮৪-৯১১৮২-২-৯

Sports Science by

- Nusrat Sharmeen
- Md. Bokhtiar
- Dr. Abu Tareq
- Sadeka Yesmin
- Md. Shafiqul Islam
- Abu Obaida Bhuian
- Lotfa Akter

First Published April-2016. Cover designed by Kazi Abdul Hoque. Printed by Rup prokashon, Dhaka. Price-350
ISBN-978-984-91182-2-9

বিষয় সূচি

- স্পোর্টস সাইকোলজি----------০৫
- এক্সারসাইজ ফিজিওলজি----------৪৩
- স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স----------৭৩
- সায়েন্স অব স্পোর্টস ট্রেনিং----------৯৩
- স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট----------১২৯
- ক্রীড়াজনিত আঘাত ও পুষ্টি----------১৫৩
- সিলেবাস----------২১১

স্পোর্টস সাইকোলজি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বি-স্পোর্টস/বিএ/বিএসসি ডিগ্রির সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত

নুসরাৎ শারমিন

বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (সাইকোলজি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস সাইকোলজি (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
এবং পিজিডি ইন পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট (বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট)
ও
সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা (স্পোর্টস সাইকোলজি)
উপ-পরিচালক (ক্রীড়াবিজ্ঞান)অ.দা.
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাভার, ঢাকা

মুখবন্ধ

শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান নতুন একটি বিষয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস সায়েন্স এবং স্নাতক পর্যায়ে এ বিষয়টি ইতোমধ্যে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ এ বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় রচিত কোনো বই নেই বললেই চলে। ছাত্র-ছাত্রীদের এ হেন অসুবিধার কথা বিবেচনা করে বাংলা ভাষায় এমন একটি বই প্রণয়নে আমি উদ্বুদ্ধ হই। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীসহ সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীও বইটি পড়ে উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস সায়েন্স এর অন্তর্গত একটি বিষয় হলো স্পোর্টস সাইকোলজি। স্নাতক পর্যায়ের সম্পূর্ণ সিলেবাস অনুসরণ করে বইটি লেখা হলেও ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস সাইকোলজি ছাড়াও বিপিএড এবং এমপিএড এর শিক্ষার্থীগণও ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের (Sports Psychology) উপর লিখিত ইংরেজি ভাষায় অনেক বই আছে। সেসব বইয়ে এমন কিছু ইংরেজি শব্দ আছে যাদের পরিভাষা এখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। আমি সেসব শব্দের সহজ-সরল অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি পাঠকের কাছে সেসব অনুবাদ যেন দুর্বোধ্য না হয় সেজন্য বন্ধনীর মধ্যে মূল ইংরেজি শব্দ উল্লেখ করে দিয়েছি। আশা করছি এর ফলে বইটির মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে সকলের জন্য সহজ হবে।

বইটি যেহেতু প্রথমবার প্রণয়ন করা হয়েছে তাই এতে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সেজন্য পাঠকবৃন্দের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব নির্ভুল করতে সচেষ্ট থাকব।

ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান বইটি প্রণয়নে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাকে ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করায় তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার সহকর্মী জনাব শফিকুল ইসলাম (ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানী) বইটির মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করায় তাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। স্নেহপ্রতিম মাহ্জাবীন রহমান মুন্নী নির্ভুলভাবে ও দ্রুত সময়ে বইটি কম্পোজ করে আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। তাকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার পরিবারের সদস্যগণ আমার সুপ্রিয় জীবনসঙ্গী অধ্যাপনার ব্যস্ততার মাঝে সময় এবং উৎসাহ প্রদান করে যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে সেজন্য তার প্রতি রইল আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

পরিশেষে যাদের জন্য বইটি লেখা হলো তারা পড়ে উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। এছাড়া বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

নুসরাৎ শারমিন

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: পরিচিতি----------০৮

১.১। মনোবিজ্ঞান এবং ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ

১.২। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব

১.৩। বৃদ্ধি ও বিকাশের স্বরূপ

১.৪। বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য

অধ্যায় ২: সঞ্চালন শিক্ষণ----------২১

২.১। শিক্ষণ ও সঞ্চালন শিক্ষণের সংজ্ঞা

২.২। সঞ্চালন শিক্ষণের প্রভাবিত উপাদান

২.৩। সঞ্চালন শিক্ষণের নির্বাচিত তত্ত্ব: সাপেক্ষ প্রতিবর্তীক্রিয়া

২.৪। অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিক্ষা: প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিক্ষণ

অধ্যায় ৩: আবেগ ও ক্রীড়া----------২৭

৩.১। উদ্বিগ্নতার স্বরূপ

৩.২। উদ্বিগ্নতার প্রকারভেদ

৩.৩। ক্রীড়া নৈপুণ্য উদ্বিগ্নতার প্রভাব

অধ্যায় ৪: ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া----------৩৬

৪.১। ব্যক্তিত্বের স্বরূপ

৪.২। ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি

৪.৩। ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ ও ব্যক্তিত্ব

অধ্যায় ৫: প্রেষণা ও ক্রীড়া ----------৩৯

৫.১। প্রেষণার স্বরূপ

৫.২। প্রেষণার প্রকারভেদ

৫.৩। লক্ষ্য নির্ধারণ - ক্রীড়া নৈপুণ্য উন্নয়নে ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: স্পোর্টস সাইকোলজির পরিচিতি

মনোবিজ্ঞান এবং ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ

মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি শব্দ Psychology. 'Psyche' এবং 'Logos' এ দুটি গ্রিক শব্দ থেকে Psychology শব্দটি এসেছে। 'Psyche' শব্দের অর্থ আত্মা এবং 'logos' শব্দের অর্থ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। তাই আক্ষরিক অর্থে মনোবিজ্ঞানকে আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলা যায়। কিন্ত আত্মা অতীন্দ্রিয় বিষয় বিধায় পরবর্তীতে আত্মাকে বাদ দিয়ে মনকে করা হয় মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটে। জন বি ওয়াটসন (১৯১০) বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মনোবিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী সংজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'মনোবিজ্ঞান হলো আচরণের বিজ্ঞান।'

নিম্নে মনোবিজ্ঞানের দুটি আধুনিক সংজ্ঞা প্রদান করা হলো। মনোবিজ্ঞানকে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। ("Psychology can be defined as the scientific study of behavior and mental process ." Cridal & etal, 1983:)

মনোবিজ্ঞান হলো জীবন আচরণ এবং জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান সম্মত অনুধ্যান। ("Psychology is the scientific study of the behavior and cognitive processes of individual organisms.")

কাজেই উপর্যুক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, মনোবিজ্ঞান হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষ ও প্রাণীর আচরণ এবং মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনুধ্যান করে।

মনোবিজ্ঞানের এ সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। যথা-

১) আচরণ (Behavior)
২) মানসিক প্রক্রিয়া (Mental Process)
৩) মানুষ ও প্রাণী (Man & Other animals)
৪) বিজ্ঞান (Science)

আচরণ: সাধারণ অর্থে আচরণ হলো প্রাণীর কার্যকলাপ যা বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। বাহ্যিক বস্তুর সংগে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটলে স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপ্ত হয় এবং প্রাণী তার প্রতি সাড়া দেয়। এই সাড়া দেয়াকে প্রতিক্রিয়া বলে। আর এই প্রতিক্রিয়া হলো আচরণ।

মানসিক প্রক্রিয়া: মানসিক প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় আবেগ, চিন্তন, স্বপ্ন, স্মৃতি, প্রেষণা প্রত্যক্ষণ বিশ্বাস ইত্যাদিকে। মানসিক কার্যকলাপ সরাসরি বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এসব প্রক্রিয়া অনুধ্যান করার জন্য মনোবিজ্ঞানীগণ বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

মানুষ ও প্রাণী: মনোবিজ্ঞান মূলত মানুষের আচরণ ও মানসিক কার্যকলাপ নিয়ে অনুধ্যান করে। যে সকল ক্ষেত্রে মানুষের উপর পরীক্ষণ করা সম্ভব হয় না যে সকল ক্ষেত্রে প্রাণীর উপর পরীক্ষণ পরিচালনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বিজ্ঞান: বিজ্ঞান হলো সেই বিশেষ জ্ঞান যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে লাভ করা যায়। মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের সূচনা

একবিংশ শতাব্দীর এই পর্যায়ে এসে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সাথে সাথে মনোবিজ্ঞানের জয়যাত্রা সমান তালে এগিয়ে চলেছে। উন্মোচিত হয়েছে মনোবিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক, প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্র। তেমনই একটি ক্ষেত্র হচ্ছে ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি নির্ণয় করা কঠিন কাজ, কেননা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সহজভাবে বলতে গেলে এটি এক্সারসাইজ ও স্পোর্টস সায়েন্সের একটি শাখা। পাশাপাশি এটি মনোবিজ্ঞানেরও একটি শাখা।

ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা—

বিভিন্ন মনীষী ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো

ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান হলো: "মানব আচরণের উপর ক্রীড়াজনিত ফল" । ("The effect of sport itself on human behavior" Alderman, 1983) 'ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান হলো অনুধ্যানের সেই ক্ষেত্র যেখানে ক্রীড়াশৈলী সুবিন্যস্ত করতে মনোবৈজ্ঞানিক নীতিগুলোর প্রয়োগ হয়। "A field of study in which the principles of psychology are applied in a sports setting (Cox, 1983) "ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান হলো মনোবিজ্ঞানের সেই শাখা যা খেলা ও খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে"। "A subcategory of psychology focusing in athletes and athletics" (Cratty, 1989) "ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান ক্রীড়া এবং অনুশীলন বিজ্ঞানের সেই শাখা যা ক্রীড়াক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের আচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ায়। (The branch of sport and exercise science that seeks to provide answers to questions about human behavior in sport Gill-1986)

ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা। ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণের যথার্থতা বিশ্লেষণ ও তার মাধ্যমে ক্রীড়াবিদদের আত্মপ্রত্যয় ও মানসিক দৃঢ়তার উন্মেষ সাধন ও খেলোয়াড়ের ক্রীড়া সম্পর্কিত আচরণের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং এগুলোর সমাধানে মনোবিজ্ঞানের এবং এক্সারসাইজ ও স্পোর্টস সায়েন্সের মূলনীতিসমূহ কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ক্রীড়ার সংগে সম্পর্কিত খেলোয়াড়ের সব ধরনের আচরণই ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। এটি প্রতিযোগিতামূলক খেলায় মানবীয় আচরণের একটি অনুধ্যান এবং তিনটি প্রাথমিক উৎস দ্বারা খেলোয়াড়ের আচরণ (পারফরমেন্স) কীভাবে প্রভাবিত হয় এটি তা নির্দেশ করে। সেই তিনটি উৎস হলো (১) খেলোয়াড় (২) প্রশিক্ষক (কোচ) এবং (৩) পরিবেশ- যে স্থানে তারা (প্রশিক্ষক ও খেলোয়াড়) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে।

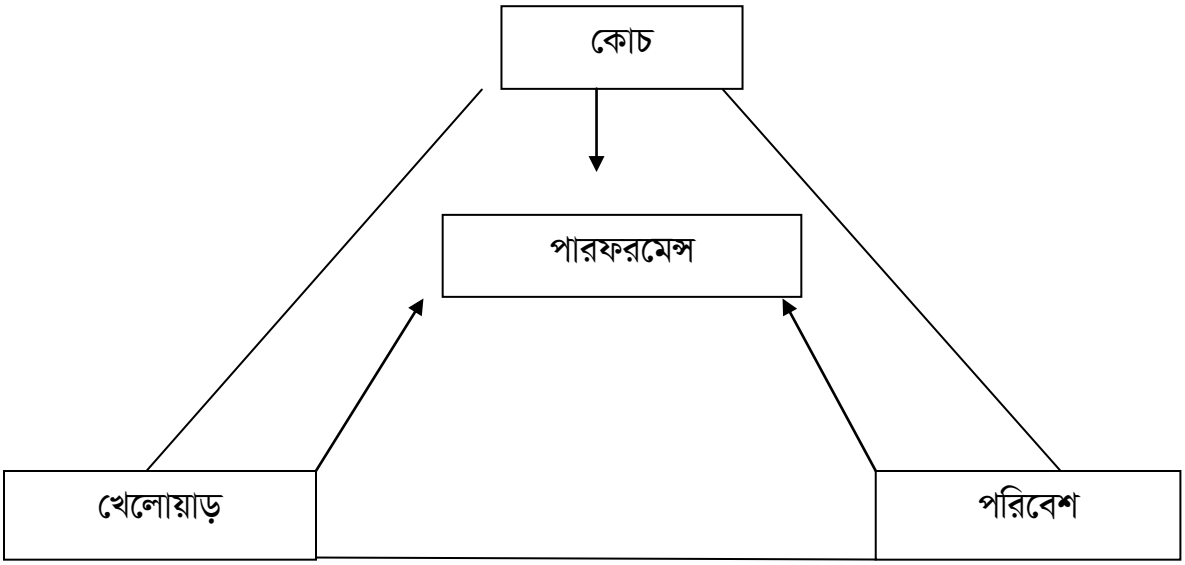

ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান স্পোর্টস ও এক্সারসাইজ সায়েন্সেরও একটি শাখা। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো আবেগ, মনোযোগ, ব্যক্তিত্বের গঠন, তাগিদ (Motivation) আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, নেতৃত্ব, দলীয় সংশক্তি (Group cohesion) ইত্যাদি।

স্পোর্টস সাইকোলজির পরিধি

স্পোর্টস সাইকোলজি বা ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেখানে মনোবিজ্ঞানের নীতিসমূহ অনুসৃত হয়। তবে মনোবিজ্ঞানের সকল তথ্য এখানে সমভাবে প্রযোজ্য হয় না। অপরদিকে, ক্রীড়ামনোবিজ্ঞান এক্সারসাইজ অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্সেরও একটি অন্যতম শাখা। এক্সারসাইজ এন্ড স্পোর্টস সাইন্স (অনুশীলন এবং ক্রীড়া বিজ্ঞান) একটি বহুমাত্রিক ক্ষেত্র; যেমন- এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো- অনুশীলন ও ক্রীড়ামনোবিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা, স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রীড়া অধ্যয়ন, সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষণ অনুশীলন, শরীর বিদ্যা ইত্যাদি। অনুশীলন ও ক্রীড়া বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীগণ অনুশীলন ও ক্রীড়ার বাছাইকৃত তত্ত্ব, ধারণা ও পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে থাকেন। ক্রীড়া মনেবিজ্ঞান ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। মনোবিজ্ঞানের সাথে, যোগসূত্র রয়েছে এমন বিষয়সমূহ থেকে তত্ত্ব ধার করলেও ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান নিজস্ব তাত্ত্বিক মডেল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হচ্ছে।

আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (APA) ক্রীড়া বিজ্ঞানের পরিধিকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করেছেন-

যেমন- (১) খেলোয়াড়দের মানসিক দক্ষতায় প্রশিক্ষণ ।
(২) খেলোয়াড়দের সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধন ।
(৩) বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার সাথে রীতিবদ্ধ বিচার্য বিষয়সমূহের উন্নয়ন
(৪) খেলোয়াড়দের উন্নয়ন ও সামাজিক দিক অবলোকন ।

নিম্নে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

(১) খেলোয়াড়দের মানসিক দক্ষতায় প্রশিক্ষণ

একজন খেলোয়াড় প্রশিক্ষণের সময় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নিরসনের জন্য বিভিন্ন ধরনের মানসিক কৌশল ও কর্মপন্থা প্রয়োগ করা হয়। যেমন-

- খেলোয়াড়দের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পারফরমেন্স প্রোফাইল তৈরি করা।
- খেলোয়াড়দের ভিজিওলাইজেশন ও পারফরমেন্সের পরিকল্পনা করা ।
- খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস উন্নত করা।
- খেলোয়াড়দের চিন্তনজনিত আত্মনিয়ন্ত্রণ কৌশল নির্ধারণ।
- লিঙ্গভিত্তিক পরামর্শ দানের ক্ষেত্র নিরূপণ ।
- সহিংস আচরণ রোধে পরামর্শ প্রদান ।
- দলীয় সংহতি।

(২) খেলোয়াড়দের সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধন -

- খাদ্যঅনীহা এবং ওজনরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি।
- ড্রাগে আসক্তদের কাউন্সেলিং করা।
- নৈরাজ্য, হতাশা, ব্যর্থ হওয়া এবং আত্মহত্যার প্রবণতায় কাউন্সেলিং করা।
- ওভার ট্রেনিং এবং বার্ন আউট কাউন্সেলিং।
- পেশা পরিবর্তন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে আত্মপরিচিতির বিকাশ
- খেলোয়াড়দের পিতামাতা ও পরিবারের চাহিদা পূরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরামর্শ প্রদান।

(৩) বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার সাথে রীতিবদ্ধ বিচার্য বিষয়সমূহের উন্নয়ন–

সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াসংগঠনের কর্তৃপক্ষের মধ্যে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা যেমন- দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবোঝি, দ্বিধা ইত্যাদি দূরীকরণের জন্য ক্রীড়ামনোবিজ্ঞানের ভূমিকা রাখা।

(৪) খেলোয়াড়দের উন্নয়ন ও সামাজিক দিক অবলোকন -

- খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলোয়াড়সুলভ নৈতিকতা ও চরিত্র উন্নত করা।
- আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মাভিমান এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা (ISSP, NASPSPA, AAASP) ক্রীড়ামনোবিজ্ঞানের তিনটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন

১. মানসিক স্বাস্থ্য
২. পারফরমেন্সের উন্নতি
৩. সামাজিক মনোবিজ্ঞান

ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিসমূহ

কোনো বিষয়বস্তু বিজ্ঞানসম্মত কিনা তা নির্ভর করে কি পদ্ধতির মাধ্যমে সেই বিষয়ে গবেষণা করা হয় তার উপর, প্রমাণসাপেক্ষ উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করা বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানে বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে এরূপ প্রমাণসাপেক্ষ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে এই পদ্ধতিগুলো ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

১। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation method)

- আত্মপর্যবেক্ষণ (Self bservation)
- অন্যের দ্বারা পর্যবেক্ষণ (Observation by others)

২। প্রশ্নয়ন পদ্ধতি (Interrogation method)

- মৌখিক (Verbal)
  - সাক্ষাৎকার (Formal interview)
  - ব্যাখ্যামূলক (Informal interview or Exploration)
- লিখিত (Written)
  - মুক্তপ্রান্ত (Open)
  - বদ্ধপ্রান্ত (Closed)

৩। পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experiment)

- গবেষণাগারে পরীক্ষণ (Lab Experiment)
- প্রকৃত পরিবেশে পরীক্ষণ (Field Experiment)

অভীক্ষা (Test)

- অভিক্ষেপণ (Projective test)
- কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষা (Structured test)

৪. কেস স্টাডি পদ্ধতি

(১) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি: এমন কতগুলো আবেগ বা ঘটনা আছে যা গবেষণাগারে তৈরি করা যায় না, সেসব আবেগ বা ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণকারী

স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রেখে পরীক্ষণ পাত্রের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরীক্ষণ পাত্রের স্বাভাবিক আচরণ যাতে বিঘ্নিত না হয়, পর্যবেক্ষণকারী সেদিকে খেয়াল রাখেন।

আত্ম পর্যবেক্ষণ: মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য যখন ব্যক্তি নিজের মনের সাহায্যে নিজের মনকে জানে তখনই তাকে আত্ম পর্যবেক্ষণ বলে। প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতা চলাকালীন একজন খেলোয়াড়ের ক্রীড়া নৈপুণ্যের পাশাপাশি তার মানসিক এবং আবেগীয় অবস্থা বিশ্লেষণ করে নিজের সম্পর্কে সজাগ থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অন্যের দ্বারা পর্যবেক্ষণঃ এক্ষেত্রে একজন খেলোয়াড়ের আচরণ এবং মানসিক প্রক্রিয়াগুলো অন্যের মাধ্যমে পর্যবেক্ষিত হয়। একজন খেলোয়াড়কে অধিকতর ভালোভাবে জানতে হলে প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতার সময় তাকে কোচ এবং ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ করাতে হবে।

পর্যবেক্ষণের জন্য কতিপয় বিবেচ্য বিষয়:

১। পর্যবেক্ষণের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত।
২। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের জন্য সঠিক পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত।
৩। পর্যবেক্ষণের প্রামাণিক কাগজপত্র বা রেকর্ড থাকা উচিত।
৪। দীর্ঘসময় ধরে পর্যবেক্ষণ সম্পাদন করা উচিত।
৫। সম্ভাব্য ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা উচিত।
৬। পর্যবেক্ষণের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য বেশিসংখ্যক বা পর্যাপ্তসংখ্যক পর্যবেক্ষক থাকা উচিত।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ:

১। প্রায় সব ধরনের আচরণই এই পদ্ধতির আয়ত্তাধীন।
২। তাৎক্ষণিকভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।
৩। নির্ধারিত ঘটনা বা আচরণকে স্বাভাবিক পরিবেশে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা চলাকালীন অর্থাৎ যখন ঘটনাটি ঘটছে তখন পর্যবেক্ষণ করা যায়।

অসুবিধাসমূহ:

১। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল ব্যক্তিনিষ্ঠ হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত সংস্কার, পূর্বধারণা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের ফলাফলের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।
২। সময় বেশি লাগে এবং প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা যাচাই করা খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ পর্যবেক্ষণ সহজে পুনরাবৃত্তি করা যায় না।

(২) **প্রশ্নায়ন পদ্ধতি:** এক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের কাছ থেকে মৌখিক বা লিখিত আকারে কোনো প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যক্তির সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য:

১। সাক্ষাৎকার মূলত একটি বাচনিক পদ্ধতি।
২। এই পদ্ধতিতে সামনাসামনি কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
৩। এটি একটি গতিশীল পদ্ধতি।

৪। এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সরাসরি সংযোগ ঘটে।
৫। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর প্রদত্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেন।

Formal interview বা আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে প্রশ্নগুলো এবং তাদের ধারা পূর্বেই সুনির্দিষ্ট করা থাকে। কিন্তু Informal interview বা অনানুষ্ঠানিক এর ক্ষেত্রে সেরূপ থাকে না। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভেদে প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক উত্তর চাওয়া হয়। প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা বিষয়ে তার মনোভাব সম্পর্কে মৌখিক এবং লিখিত প্রশ্নমালা একজন খেলোয়াড় সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য জানতে ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানীকে অনেক সাহায্য করে। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার পদ্ধতির চেয়ে অনানুষ্ঠানিক প্রশ্নায়ন পদ্ধতিতে মৌখিকভাবে অধিকতর ভালো তথ্যাদি পাওয়া যায়।

মুক্তপ্রান্তঃ এ ধরনের প্রশ্নে উত্তরদাতা মনের মতো করে যে কোনো উত্তর দিতে পারে। উত্তরদাতা এক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে তার মত প্রকাশ করতে পারে।

বৃদ্ধপ্রান্তঃ এ ধরনের প্রশ্নপত্রে সম্ভাব্য বেশ কটি উত্তর দেয়া থাকে। উত্তরদাতাকে তার মধ্যে থেকে যেকোনো একটি উত্তর বেছে নিতে হয়।

প্রশ্নায়ন পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে প্রশ্নকারীর দক্ষতার উপর। কত সহজভাবে খেলোয়াড়দের তিনি প্রশ্ন করেন এবং কত বেশি পরিমাণে তাদের কাছ থেকে তথ্য বের করতে পারেন তার উপর প্রশ্নকারীর সাফল্য নির্ভর করে। সঠিক তথ্য প্রদানে খেলোয়াড়দের অবশ্যই প্রশ্নকারীর প্রতি বিশ্বাসী থাকতে হবে।

(৩) পরীক্ষণ ও অভীক্ষা পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতিতে সুব্যবস্থিত ও সুপরিকল্পিত অবস্থায় এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষণ পাত্রের উপর উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। যে কোনো অনুসন্ধান কার্য যেখানে উদ্দীপকের প্রভাবের উপর অনুসন্ধানকারীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে তাকে পরীক্ষণ বলাা হয়। ক্রীড়ামনোবিজ্ঞানে দুই ধরনের পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

১. গবেষণাগারে পরীক্ষণ (Lab Experiment)
২. কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষণ (Field Experiment)

পরীক্ষণ কার্য সাধারণত গবেষণাগারে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের ভেতর পরিচালনা করা হয়ে থাকে। তবে অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে গবেষণার বাইরেও পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করা যেতে পারে। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানে এই দুই ধরনের পরীক্ষণ পদ্ধতিরই গুরুত্ব রয়েছে।

অভীক্ষাঃ এই পদ্ধতিতে পরোক্ষভাবে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হয়। এতে অভীক্ষার্থী মিথ্যা উত্তর দিতে পারে না। এতে অভীক্ষার্থীকে এমন কতগুলো সমস্যা সমাধান করতে দেয়া হয় যেগুলো অনির্দিষ্ট, অসংগঠিত ও অসম্পূর্ণ। এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে গিয়ে ব্যক্তি নিজের অজান্তে পরোক্ষভাবে তার আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাবাবেগ ইত্যাদি প্রকাশ করে। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিত্বকে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে তবে এই অভীক্ষাগুলোর ফলাফল ব্যাখ্যা এবং এগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন কাজ।

অভিক্ষেপণ পদ্ধতির ব্যক্তিত্ব অভীক্ষাগুলোর মধ্যে দুটি বহুল প্রচলিত অভীক্ষা হচ্ছে রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষা (Rorschack Ink of Test) এবং কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা (Thematic Appercerticn Test)।

পরীক্ষণ পদ্ধতি এবং অভীক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য এবং যথার্থ। এই পদ্ধতি মূলত গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

(৪) কেস স্টডি : এই পদ্ধতিতে একজন খেলোয়াড়ের উপর দীর্ঘসময় ধরে উপরোল্লিখিত সবগুলো পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তার আচরণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়।

ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব

একজন কোচ অনেকটাই একজন মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। কিন্তু তারপরও তিনি যদি ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করেন তবে তার শিক্ষা প্রদান আরো বেশি পদ্ধতিগত ও বিজ্ঞানসম্মত হয়। নিম্নে ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান Motor learning-এর ক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিক সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে।

ক) প্রবৃদ্ধি এবং উন্নতিকে প্রভাবিত করে।

খ) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পার্থক্য তুলে ধরে।

গ) পরিপক্কতা এবং ছেলে/ মেয়ের ভূমিকা নির্দেশ করে।

ঘ) বংশগত ও পরিবেশগত ভূমিকা নির্দেশ করে।

২। নিবিড় শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম ও বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে।

৩। অধিকতর ভালোভাবে শিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতায় অধিকতর ভালো পারফরমেন্স করতে খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করে।

৪। নির্দিষ্ট কোনো খেলায় নির্দিষ্ট মানসিক চাহিদা বুঝতে এবং তার উন্নতি সাধনে সহায়তা করে।

৫। পারফরমেন্স লেভেল উন্নত করতে এবং তা ধরে রাখতে সহায়তা করে।

নিম্নে বর্তমান যুগে ক্রীড়ার মান উন্নয়নে ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

ক্রীড়াক্ষেত্রে ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব আধুনিক যুগে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মূলত ক্রীড়াবিদদের বিভিন্ন আচরণ বিশ্লেষণ এবং তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রেখে কীভাবে উচ্চ ক্রীড়া দক্ষতা অর্জন করা যায় তার পথ ও পদ্ধতি আলোচনাই হলো ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন জ্ঞান আহরণের পর কোচ বা ক্রীড়া শিক্ষকগণ নিজেরাই নির্ণয় করতে পারেন কীভাবে তাকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান যেমন কোচ বা ক্রীড়া শিক্ষকদের দরকার, তেমনই যাদের উপর প্রয়োগ করা হবে অর্থাৎ খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষণার্থীদের এ বিষয়ে জ্ঞান থাকার দরকার। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারলে তা একজন খেলোয়াড় বা ক্রীড়াবিদের ক্রীড়া দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করে।

নিম্নে বর্তমান যুগে ক্রীড়ার মান উন্নয়নে ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১। যান্ত্রিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শারীরিক ও মানসিক সম্পর্ক বুঝতে ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান সাহায্য করে।

মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের বিষয়সমূহ কোচ বা ক্রীড়া শিক্ষকগণ না জানলে তাদের পক্ষে ভালো শিক্ষক বা প্রশিক্ষক হওয়া সম্ভব নয়। শারীরিক বিষয় বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন ধাপে বা বয়সে

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত দিক থেকে বৈষম্য থাকে (Individual difference) এছাড়া বংশগতিধারা, পরিবেশ, শিখন প্রস্তুতি (Readiness of learing), পরিপক্কতা এবং কোনো বয়সে কীভাবে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে ইত্যাদি বিষয়সমূহ ক্রীড়া মনোবিদ্যা আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়। একজন খেলোয়াড় বা প্রশিক্ষণার্থীর যে কোনো উন্নতি বা বিকাশ নির্ভর করে তার জন্মগত ক্ষমতার উপর। সে যেসব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তার উপর ভিত্তি করে তার বিকাশের পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো খেলোয়াড়ের শরীরে জন্মগতভাবে Slow twies muscles fiber থাকে তবে তাকে দিয়ে কখনও ১০০ মিটার দৌড়বিদ বানানো যাবেনা। আবার উচ্চতায় ছোটো খেলোয়াড়কে দিয়ে বাস্কেটবল বা ভলিবল খেলোয়াড় বানানো যাবেনা। যেহেতু কোচ বা ক্রীড়া শিক্ষকের দায়িত্ব ভালো খেলোয়াড় প্রস্তুতে সহায়তা করা সে কারণে কোচদের ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। কী ধরনের মানসিক চাপ প্রয়োগ করলে খেলাধুলার মান উন্নয়ন করা যাবে ইত্যাদি বিষয়সমূহ ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায়।

২। ক্রীড়া প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে ক্রীড়াবিদদের আচরণ পর্যবেক্ষণ ও বুঝতে সাহায্য করে।

একজন ক্রীড়া প্রশিক্ষককে দীর্ঘদিন ধরে ক্রীড়াবিদদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হয়। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের সঠিক জ্ঞান কোচ বা ক্রীড়া শিক্ষকদের তার নিজ সম্পর্কে (Self) জানার পাশাপাশি অপরের আচরণ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে সাহায্য করে। কোচদের ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে সঠিক আচরণের মাধ্যমে যথাযথ পারফরমেন্স বের করে আনতে সাহায্য করে। নিজেকে প্রকৃতভাবে জেনে পারিপার্শ্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় বলেই স্পোর্টস সাইকোলজির অনুশীলন ক্রীড়াক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ।

৩। ক্রীড়াবিদদের উন্নত প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় ভালো করতে প্রেষণা প্রদান করে।

প্রেষণার বিভিন্ন ধরনের কৌশল রয়েছে। এই কৌশলগুলোর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় ভালো করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

৪। নির্দিষ্ট ক্রীড়ায় নির্দিষ্ট মানসিক চাহিদা বুঝতে ও উন্নতিতে ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান সাহায্য করে।

পৃথক পৃথক ক্রীড়ায় পৃথক পৃথক শারীরিক ও মানসিক চাহিদা দরকার হয়। এই মানসিক চাহিদা সম্পর্কে বুঝতে ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান সাহায্য করে। সাধারণত কোচ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং মানসিক চাহিদার দিকগুলোকে অবহেলোা করেন। এক্ষেত্রে কোচদের ধারণা থাকলে মানসিক বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবেই উন্নতি ঘটবে। প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিক্ষণ হলে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। এমনকি এই ধরনের শিক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটতে পারে যা ক্রীড়াবিদদের জন্য অধিক ক্ষতিকর দৃষ্টান্ত তৈরি হতে পারে। শুটিং, আর্চারী, গলফ ইত্যাদি খেলাতে নিম্নমাত্রার মানসিক উত্তেজনার দরকার আবার বক্সিং, জুডো, ভার উত্তোলন ইত্যাদি ক্রীড়ায় অধিক মানসিক উত্তেজনার দরকার হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এক এক ক্রীড়ায় মানসিক উত্তেজনা এক এক রকম। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে প্রশিক্ষক ও ক্রীড়া শিক্ষকদের এ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে।

৫। নির্দিষ্ট ক্রীড়ার জন্য যথাযথ ট্যালেন্ট বের করতে সাহায্য করে।

প্রশিক্ষণ বেশ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল একটি বিষয়। প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে কার্যকরী ক্রীড়াবিদ নির্বাচন করা সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক এই দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হয়। প্রেষণা, বোধ ক্ষমতা, আবেগীয় পরিপক্কতা সাফল্য লাভের তাগিদ ইত্যাদি বিষয় গুলোতে অধিক গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে ভালো ক্রীড়াবিদ খুঁজে বের করা সহজ হয়।

৬। পারফরমেন্সের উন্নতি এবং তা ধরে রাখতে সাহায্য করে।

ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান একজন খেলোয়ারের ক্রীড়া নৈপুণ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বিশেষ করে লক্ষ্য নির্ধারণ, মনোযোগ, আত্মবিশ্বাস, কল্পচিত্র, উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ মানসিক দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদির উন্নতিতে সাহায্য করে। এই সকল মানসিক দক্ষতাগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এই দক্ষতাগুলো শারীরিক দক্ষতার মতোই যা প্রতিনিয়ত অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করতে হয় যা দীর্ঘদিন পারফরমেন্স ধরে রাখতে সাহায্য করে।

বৃদ্ধি ও বিকাশ

বৃদ্ধি এবং বিকাশ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। ক্রীড়া এবং শারীরিক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে বৃদ্ধি এবং বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। সেই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো-

১. শরীর ও শারীরবৃত্তীয় দৃষ্টিকোণ (Physical & Phyiological Aspect):

বৃদ্ধি এবং বিকাশ-এ শরীর এবং শারীরবৃত্তীয় বিষয়গুলো স্পোর্টস মেডিসিন ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা অধ্যয়ন করা হয়। উচ্চতা, ওজন, শারীরিক বিন্যাস, দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আনুপাতিক বিন্যাস, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ও তন্ত্রসমূহ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা বৃদ্ধি এবং বিকাশের আলোচ্য বিষয়। হৃদপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রসমূহ যেমন স্নায়ুতন্ত্র, রক্তসংবহন তন্ত্র, অন্তক্ষরা গ্রন্থিসমূহ, পরিপাকতন্ত্র, পেশীতন্ত্র, কংকালতন্ত্র ইত্যাদির পরিবর্তন ক্রীড়াক্ষেত্রে গতিসঞ্চালন মানসিক ও সামাজিক বিকাশে যে পরিবর্তন হয় তার ভিত্তি হিসেবে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।

২. মানসিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ (Psycological & Social Aspect):

এটা ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের একটি বিষয়বস্তু। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মানসিক এবং সামাজিক কার্যাবলি যেমন- জ্ঞানীরা (Cognitive) এবং আবেগীয় গুণাবলি ও দক্ষতার কারণে যে পরিবর্তন হয় সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক বিকাশ ও মানবীয় আচরণের পরিবর্তনও এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। শিশু, তরুণ, প্রাপ্ত বয়স্কদের আচরণ বোঝার জন্য বৃদ্ধি ও বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুধ্যান।

৩. গতীয় বিকাশীয় দৃষ্টিকোণ (Motor Development Aspect):

ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি ও বিকাশের এটি একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুধ্যান। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো- গতি, সামর্থ্য, ক্রীড়া দক্ষতা, কৌশলগত সক্ষমতা এবং গতি পারদর্শিতা ও আচরণের বিকাশ। গতি বিকাশের অনুধ্যান প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান ও শারীরিক শিক্ষার জন্য জরুরি।

ক্রীড়াক্ষেত্রে বৃদ্ধি ও বিকাশের নিম্নবর্ণিত দুটি আদর্শ রয়েছে। যেমন-

- শিশু এবং তরুণ খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের উপর কোনো নেতিবাচক বা ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে বাধা দেওয়া।
- যে বয়সে পারফরমেন্স এর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে সেই সময়ে পারফরমেন্স প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্রীড়াক্ষেত্রে যথাযথ সাফল্য লাভ করা।

শারীরিক, শারীরবৃত্তীয় এবং মানসিক উৎকর্ষ ঘটিয়ে পদ্ধতিগতভাবে আশানুরূপ খেলার মানে উন্নতি করা এবং খেলাধুলায় তৎপর করাই হলো ক্রীড়া প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য।

বৃদ্ধি এবং বিকাশের পার্থক্য

আমাদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধি এবং বিকাশ নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপের মৌলিক পার্থক্যের দিকগুলো নিচের ছকে তালিকাবদ্ধ করে তুলে ধরা হলো-

বৃদ্ধি	বিকাশ
১. বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের দৈহিক আকার আয়তনের পরিবর্তনকেই বোঝানো হয়।	২. বিকাশের মাধ্যমে আমাদের দৈহিক আকার-আকৃতির পরিবর্তনসহ আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকেই বোঝানো হয়।
৩. বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য।	৩. বিকাশের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণযোগ্য।
৪. বৃদ্ধি দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট।	৩. বিকাশ শিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট।
৫. বৃদ্ধির সমাপ্তি হয় পরিমাণে।	৪. বিকাশের সমাপ্তি নেই
৬. বৃদ্ধি পরিমাপগত পরিবর্তন আনে।	৫. বিকাশ গুণগত পরিবর্তন আনে।
৭. বৃদ্ধি সাময়িক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।	৬. বিকাশ জীবনব্যাপী।
৮. বিকাশের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির সম্পৃক্ততা বেশি।	৭. বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিকাশের সম্পৃক্ততা কম।

বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:

বৃদ্ধি এবং বিকাশ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। প্রত্যেক মানুষের জীবনপ্রক্রিয়া বৃদ্ধি ও বিকাশের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এটি ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মানসিক ও সামাজিক কার্যাবলি যেমন জ্ঞান-প্রত্যক্ষণ, ঐচ্ছিক এবং আবেগীয় গুণাবলির দক্ষতার

কারণে যে পরিবর্তনগুলো হয় সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। শিশু, তরুণ, প্রাপ্তবয়স্কদের আচরণ বোঝার জন্য বৃদ্ধি ও বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুধ্যান। মনোবৈজ্ঞানিক বৃদ্ধি ও বিকাশ নিম্নরূপ:

১. **জ্ঞান-সংক্রান্ত ক্ষমতা- প্রত্যক্ষণ, চিন্তন, স্মৃতি, মনোযোগ ইত্যাদি।**
২. **মনন বা ইচ্ছা শক্তির ক্ষমতা আগ্রহ, মনোভাব, প্রেষণা বা তাগিদ।**

৩. **আবেগীয় গুণাবলি- মেজাজ, আবেগ, আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।**
৪. **ব্যক্তিত্ব**
৫. **আচরণ**

শারীরিক ও মানসিক উন্নতির ধাপসমূহ:

জীবনের প্রথম তিন বছর (০-৩): মানব শিশুর জন্মলগ্ন থেকেই মূলত তার গতিয় বিকাশ শুরু হয়। মাতৃগর্ভে শিশুর বয়স যখন তিন চার মাস তখন থেকেই সে স্বেচ্ছায় তার হাত পা নাড়াতে সক্ষম হয়। জন্মের পর প্রথম তিন চার মাস পর্যন্ত মানব শিশু থাকে একেবারে অসহায়, শরীরের নড়াচড়া করতে পারলেও সে থাকে নির্ভরশীল। এই সময় সে ধীরে ধীরে কথা বুঝতে এবং বলতে শিখে যা তার মানসিক বিকাশের প্রমাণ দেয়। কিন্তু কোনো বিষয়ে মনসংযোগ করা তার জন্য মুশকিল। তার স্মৃতিশক্তি থাকে দুর্বল। আবেগের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং তার আবেগসমূহের শারীরিক প্রকাশ ঘটে। এই সময় তার চিন্তা ভাবনা হয় বস্তুকেন্দ্রিক। যে বস্তু সে দেখেনি সে বিষয়ে তার কোনো ধারনা বা চিন্তা থাকে না।

প্রাথমিক শৈশব (৪-৭ বছর) Early Childhood:

জীবনের ৪র্থ থেকে ৭ম বছর পর্যন্ত এই সময়কে প্রাক শৈশব বলা হয়। এটা একজন শিশুর চলন প্রক্রিয়ার (movement) ভিত্তিস্বরূপ এবং মানসিক ও সামাজিক বিকাশের উপযুক্ত সময়। পাশাপাশি তার গতীয় বিকাশের সক্ষম সময়ও। জন্মগত সময়ের লিঙ্গগত (sexual) পার্থক্য ব্যতীত শারীরিক দিক দিয়ে অন্য কোনো পার্থক্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে থাকে না। এই সময়ে তার মানসিক বিকাশ বিশেষ করে জ্ঞানীয়-প্রত্যক্ষণ (Cognitive aspect) বেশ উল্লেখযোগ্য। শিশু যৌক্তিকভাবে ভাবতে শিখে। সে আগের চেয়ে বেশি বাস্তবধর্মী হয়। তার প্রত্যক্ষণ, স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এগুলো অর্জন করতে অধিক মাত্রায় আগ্রহ ও অনুপ্রেরণার দরকার হয়। এ সময় তার ভাষাগত দক্ষতা বাড়ে। সে বড়োদের কথা ভালোভাবে বোঝতে পারে। তেমন উল্লেখ করার মতো না হলেও আবেগের উপর তার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আসে। ছয় বছরের মাথায় স্কুলে যাওয়ার মতো পরিপক্কতা তার মধ্যে এসে যায়।

মধ্য শৈশব (৭-১০) Middle Childhood:

শিশুর ৭-১০ বছর পর্যন্ত সময়কে মধ্য শৈশব বলে। এ সময় শিশুর অতিদ্রুত গতীয়, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটে। স্কুলগামী শিশুদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশ ঘটার এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। এ সময়ে

শিশুদের মানসিক বিকাশ উল্লেখযোগ্য। ভাষার উপর তাদের পূর্ণ দখল চলে আসে। প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিপুষ্ট থাকে। অর্থাৎ সময়, স্থান, আকার, আকৃতি, শব্দ, বল ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তারা যৌক্তিকভাবে ভাবতে শিখে এবং সে পারিপার্শ্বিকতাকে গুরুত্ব দেয়। এই সময় শিশু বাইরে যেতে, খেলাধুলা করতে এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পছন্দ করে। তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও পূর্বের তুলনায় ভালো থাকে। সে খেলাধুলা করতে এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে জয় লাভ করতে চায়।

প্রাপ্ত শৈশব (১০-১২ বছর) Late childhood:

শিশুর ১০ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত সময়কে প্রাপ্ত শৈশব বলা হয়। এই সময় তাদের কাজগুলো খুব বেশি উদ্দেশ্যপ্রবণ ও লক্ষ্যসংক্রান্ত হয়। আবেগীয় বিকাশে স্থিরতা চলে আসে এবং আত্মানিয়ন্ত্রিত হয় (Self control)। এ সময় সে কল্পনাপ্রবণ এবং রহস্য উদ্‌ঘাটনে আগ্রহী হয়।

বয়ঃসন্ধিকাল Pubescence:

বয়ঃসন্ধিকাল মেয়েদের ক্ষেত্রে ১১ থেকে ১২ বছর বয়সে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১১ থেকে ১৩ বছর বয়সে শুরু হয়। এই সময় মানসিক বিকাশ (Mental development) খুব দ্রুত গতিতে হয়ে থাকে। এ সময় তাদের স্মৃতিশক্তি ভালো, যৌক্তিক ক্ষমতা ভালো থাকে এবং বিমূর্ত সম্পর্কিত ধারণা ভালো থাকে। তাদের চিন্তাগুলো শিশুদের চেয়ে ভাল এবং কিছুটা প্রাপ্তবয়স্কদের মতো। এই সময় ছেলে-মেয়ে পারস্পরিক আকর্ষণ বোধ করে।

প্রাপ্ত বয়স (Adulthood):

এই সময় ছেলে ও মেয়ে শারীরিকভাবে পরিপূর্ণভাবে পরিপক্কতা অর্জন করে। মেয়েদেও ক্ষেত্রে ১৭ থেকে ১৮ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। এটা এমন একটা সময় যখন ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং স্থিরতা তৈরি হয়। ইচ্ছা, মূল্যবোধ, ধারণা, মনোভাব এই ধরনের ব্যক্তিগত গুণাবলিগুলো পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং স্থির অবস্থায় চলে অসে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সঞ্চালন শিক্ষণ

সঞ্চালন শিক্ষণ (Motor learning)

অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে অব্যবহিত অথবা আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয় তাকেই শিক্ষণ বলে। এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে পাই-

১. শিক্ষণ হলো আচরণের পরিবর্তন।
২. এই পরিবর্তন সূচিত হয় অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে। যেমন- একজন ব্যক্তি সাঁতার, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার ফলে বা অনুশীলনের ফলে আচরণের যে পরিবর্তন হয় সেটাই শিক্ষণ।
৩. অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের ফলে আচরণের যে পরিবর্তন হলো সেটিকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হতে হবে।

প্রত্যেক ক্রীড়ায় গতি, দক্ষতা, ক্রীড়া কলাকৌশল একই রকম হয় না। ক্রীড়াভেদে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ সমস্ত কলাকৌশল, গতি বা দক্ষতা কোনো ক্রীড়ার উপযোগী হয়ে যখন আমাদের দেহ যন্ত্রের স্বাভাবিক গতি প্রকৃতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে সঞ্চালন শিক্ষণ বলা হয়। এটিকে এভাবেও বলা যায়, 'Where as if any change occurs in our action on movements of the body through training or prachce is called motor learning.'

> Motor learning is a term which is concerned with the study of motor behavior, motor control, and motor development. Motor learning involves physiological and psychologiological aspect and is a continuum that runs the gamut from physical to cognitive and there is always an integrative there aspect of human behavior.

খেলাধুলায় সাফল্য আনতে হলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বা প্রশিক্ষণকালীন বিভিন্ন ধরনের গতি বিশেষ করে হাঁটা, দৌড়, লাফ, বর্শা নিক্ষেপ ইত্যাদি যখন কোনো ক্রীড়াক্ষেত্রের কলাকৌশল হয়ে উঠে বা কোনো বিশেষ ক্রীড়ার স্কিল হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেই সমন্বিত গতি প্রকৃতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রীড়ামান উন্নয়নে সঠিক অবস্থান আনয়নকে সঞ্চালন শিক্ষণ (Sports motor learning) বলে।

সঞ্চালন শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য:

সঞ্চালন শিক্ষণের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. সাধারণ সঞ্চালন শিক্ষণ পদ্ধতি (Motor learning method) প্রেষণা দানের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়।

২. সঞ্চালন শিক্ষণ পদ্ধতিতে বলবর্ধক (Reinfoncement) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৩. অধিক শিক্ষণ বা প্রশিক্ষণ সঞ্চালন শিক্ষণকে স্থায়ী রূপ দান করে।
৪. পূর্ব অভিজ্ঞতা ও নিজের ইচ্ছাশক্তির উপর সঞ্চালন শিক্ষণ নির্ভর করে।
৫. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individual difference) সঞ্চালন শিক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
৬. আবেগীয় উত্তেজনা সঞ্চালন শিক্ষণ পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৭. শিক্ষাদান পদ্ধতি (Teaching method) সঞ্চালন শিক্ষণকে প্রভাবিত করে।

যে সকল উপাদান শিক্ষণকে প্রভাবিত করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

সাধারণত শিক্ষণের শর্তাবলিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয় -

১. শিক্ষণের কৌশল সংক্রান্ত শর্ত (Technique learning)
২. ব্যক্তিগত মানসিক সংক্রান্ত শর্ত (Subjective conditions)

নিম্নে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. শিক্ষণের কৌশল সংক্রান্ত শর্তাবলি:

সাধারণত কোনো কিছু শিক্ষণের পূর্বে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিষয়টি কোচ বা প্রশিক্ষক দুইভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন।

প্রথমত সামগ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি (whole method of learning)

দ্বিতীয়ত আংশিক শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of part learning)

সামগ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি:

যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বা স্কিলকে সম্পূর্ণভাবে বার বার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষণ করা হয় তখন তাকে বলা হয় সামগ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি।

আংশিক শিক্ষণ পদ্ধতি:

যখন শিক্ষণের বিষয়বস্তু বা স্কিলকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন তাকে বলা হয় আংশিক শিক্ষণীয় পদ্ধতি।

এই দুই ধরনের পদ্ধতি শিক্ষণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন: ক্রিকেটে পেস্ বোলিং (Pace bowling) শিক্ষণের ক্ষেত্রে কোচ স্কিলটি সম্পূর্ণভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। আবার সে ঐ স্কিলটি ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন।

শিক্ষণের ব্যক্তিগত শর্তাবলি (Subjective condition of learning)

শিক্ষণের ব্যক্তিগত শর্তাবলি হচ্ছে সেই সকল শর্তাবলি, যেগুলো বিশেষভাবে প্রশিক্ষণার্থী বা ক্রীড়াবিদদের মানসিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এসব শর্তগুলোকে শিক্ষণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য কোচ বা প্রশিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

নিম্নে শিক্ষণের ব্যক্তিগত শর্তাবলি আলোচনা করা হলো:

ক) প্রেষণা:

প্রেষণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রীড়াক্ষেত্রে খেলোয়াড় বা ক্রীড়া প্রশিক্ষণার্থীদের প্রেষণা সৃষ্টির জন্য কোচ বা প্রশিক্ষকগণকে নিম্নলিখিত কৌশলগুলো অবলম্বন করতে হবে।

১. **আর্থিক এবং অনার্থিক প্ররোচক:** প্রেষণা বা তাগিদ বৃদ্ধির জন্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক এবং অনার্থিক প্ররোচক প্রদান করা হয়। আর্থিক প্ররোচকের মধ্যে রয়েছে অর্থ প্রদান, ক্রীড়া সরঞ্জামাদি প্রদান (ট্র্যাকস্যুট, জুতা, স্পাইক কেড্স)। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ার সঙ্গে জড়িত যন্ত্রপাতি যেমন- হকি খেলোয়াড়দের জন্য হকি স্টিক, ক্রিকেট খেলোয়াড়দের জন্য প্যাড, ব্যাট। তেমনিভাবে অনার্থিক প্ররোচকের মধ্যে রয়েছে ক্রীড়ানৈপুণ্য বা প্রশিক্ষণে সাফল্যের প্রশংসা, খেলোয়াড়দের প্রতি ভালো ব্যবহার, সুসম্পর্ক, নেতৃত্ব প্রদান, ভালো খেলোয়াড় হিসেবে মর্যাদা প্রদান, প্রশিক্ষণের ভালো পরিবেশ ইত্যাদি। ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রেষণা বা তাগিদ বৃদ্ধির জন্য দুই ধরনের প্ররোচক বা পুরস্কারের গুরুত্ব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পুরস্কার প্রদানের মাত্রা শুরুতে কম তারপর ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। একইভাবে সমগ্র সেশনব্যাপী পুরস্কার প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। সেশনের শুরুতেই পুরস্কার দেয়া যাবে না। কিংবা কিছু সময়ের জন্য পুরস্কার প্রদান বন্ধ করা যাবে না। বেশির ভাগ গবেষণায় দেখা গেছে প্রেষণা বৃদ্ধিতে শাস্তির চেয়ে পুরস্কার বেশি ফলপ্রসূ। কারণ শাস্তির ফলে সঠিক প্রতিক্রিয়ার চেয়ে ভুল প্রতিক্রিয়ার উপরই মনোযোগ বেশি নিবদ্ধ থাকে এবং শাস্তির ফলে শিক্ষণের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। অপর পক্ষে, কোনো কোনো গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভুল করার সঙ্গে সঙ্গে ভুলের কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক মৃদু শাস্তির ব্যবস্থা করলে প্রেষণা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২. **অনুশীলন সময়কাল:** প্রতিযোগিতামূলক খেলায় প্রশিক্ষণ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এজন্য প্রশিক্ষণে বহুমাত্রিকতা, নতুনত্বের সংযোগ ঘটানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রশিক্ষণে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। কেননা গতানুগতিক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া তরুণ বা উঠতি খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দেয়। এজন্য ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণে গতিশীলতা আনয়নের জন্য সঠিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের পরিবেশ পরিবর্তন, সময় পরিবর্তন, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে।

৩. **নেতা বা কোচের আচরণ:** ক্রীড়াক্ষেত্রে কোচকে নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়। একজন কোচ কীরূপ আচরণ করছেন, কীভাবে তিনি দলের সদস্যদের পরিচালিত করছেন সেটার উপরও খেলোয়াড়দেও প্রেষণা নির্ভর করে। একজন কোচের সময়ানুবর্তিতা, প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া, সঠিক সময়ে সঠিক পোশাক পরিধান প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে যা তাদের প্রেষণার উপর প্রভাব ফেলে।

৪. **প্রতিযোগিতা:** প্রতিযোগিতায় সাফল্যজনক ফলাফল প্রেষণা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বার বার ব্যর্থতা প্রেষণার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং হতাশার সৃষ্টি করে। তাছাড়া প্রশিক্ষণে আগ্রহও কমিয়ে দেয়। সাফল্য বলতে ক্রীড়াক্ষেত্রে শুধুমাত্র জয় লাভ করাকেই বোঝায় না; বরং লক্ষ্যপূরণ হওয়াকেও বুঝায়।

৫. **ফলাফল পর্যালোচনা:** সব সময় খেলার ফলাফল পর্যালোচনা করতে হবে। ফলাফলের জ্ঞান প্রশিক্ষণকে দুভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত, খেলোয়াড় যদি তার ফলাফল সম্পর্কে সব সময় অবগত থাকে তবে তার প্রেষণা বা তাগিদ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, এর ফলে প্রশিক্ষণার্থী কোথায় কী ভুল করেছে তা জানতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ভুল সংশোধন করার সুযোগ পায়। ফলাফল পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রথমে দলীয়ভাবে, পরে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা পর্যালোচনা করতে

হবে। ফলাফল পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সৎ থাকতে হবে। পর্যালোচনা প্রথমে ইতিবাচক থেকে শুরু করতে হবে এবং পরে নেতিবাচক সমালোচনা করতে হবে।

৬. **লক্ষ্য নির্ধারণ:** প্রেষণা বা তাগিদ বৃদ্ধিতে লক্ষ্য নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো একটি কাজে দক্ষতা অর্জনকে লক্ষ্য নির্ধারণ বলা হয়। লক্ষ্য নির্ধারণে কতিপয় বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।
- লক্ষ্য অর্জন করার জন্য নিজের পারফরমেন্সর উপর আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে।
- লক্ষ্যের রেকর্ড রাখতে হবে (ডায়েরিতে বা সব সময় চোখে পড়বে এমন কোথায় লিখে রাখা)।
- লক্ষ্যের মূল্যায়ন করতে হবে। অর্থাৎ সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণগুলো খুঁজে বের করে তার মূল্যায়ন করতে হবে।
- দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।
- কেবলমাত্র বিজয় বা পুরস্কার লাভের জন্য লক্ষ্য স্থির না করে ক্রীড়া নৈপুণ্য উন্নতি করার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে।

খ) মনোযোগ: মনোযোগ হলো সার্থক শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। মনোযোগ হলো এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে চেতনাকে একাধিক বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ করাই হলো মনোযোগ।

মনোযোগ শিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। ক্রীড়াক্ষেত্রে কোনো স্কিল শিক্ষা দেবার সময় যদি প্রশিক্ষণার্থী বা ক্রীড়াবিদ যথাযোগ্যভাবে মনোনিবেশ করতে না পারে তা হলে স্কিল সম্পর্কিত জ্ঞান বা বিষয়বস্তু সামগ্রিকরূপে তাদের সামনে পরিস্ফুটিত হবে না।

গ) ফলাফল সংক্রান্ত জ্ঞান: ক্রীড়াবিদ বা প্রশিক্ষণার্থীদের কৃতকার্যতা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা তাদের শিক্ষনে শক্তি যোগায়। বিশেষ করে সফলতা সম্পর্কে সচেতনতা খেলোয়াড় বা প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সন্তুষ্টির ভাব জাগ্রত করে এবং এ সন্তুষ্টি তাদের শিক্ষণে প্রেষণা যোগায়।

ঘ) ব্যক্তি মধ্যস্থ আকাঙ্ক্ষার স্তর: ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা স্তর অনেকক্ষেত্রে শিক্ষণ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। কোনো ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র ক্রীড়ার মাধ্যমে শরীরকে ফিট রাখা, আবার কারো আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে জাতীয় পর্যায়ে খেলা আবার কারো আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে খেলোয়াড় হওয়া। এ আকাঙ্ক্ষার মাত্রা অনুযায়ী একজন খেলোয়াড় তার প্রচেষ্টার মাত্রা অব্যাহত রাখে। এ আকাঙ্ক্ষা যত উচ্চ হয় প্রেষণাও তত শক্তিশালী হয়। তাই শিক্ষণের ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষার স্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য: ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য শিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই কোনো প্রশিক্ষণার্থী খুব তাড়াতাড়ি অনেক কিছু শিখে, আবার কেউ কেউ তা পারে না। অনেক প্রশিক্ষণার্থী একই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে একই কোচের পরিচালনায় অনেক বেশি শিক্ষা লাভ করে আবার কেউ কেউ তা পারে না। প্রশিক্ষণ গ্রহণের সমান সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষণ মান সকলের সমান হয় না।

চ) শিক্ষণ পদ্ধতি: প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উপর শিক্ষণ নির্ভর করে। কোনো বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সময় কোচ বা প্রশিক্ষককে সেই বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্ব ধারণার মাধ্যমে কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। প্রশিক্ষণ প্রদান করার সময় যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা একঘেয়েমি বোধ না করে সে দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রশিক্ষণের ভিতরে সবসময় নতুনত্বের আধিক্য রাখতে হবে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারলে, সহজেই শিক্ষণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

শিক্ষণের প্রকারভেদঃ শিক্ষণের প্রকারভেদ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণের কথা বলেছেন। তবে শিক্ষণকে মোটামুটিভাবে নিম্নরূপে শ্রেণি বিভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

১. চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ।
২. করণ শিক্ষণ বা সহায়ক শিক্ষণ বা ভুল প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষণ।
৩. অন্তদৃষ্টিমূলক শিক্ষণ।
৪. আকস্মিক শিক্ষণ।
৫. পরিহার শিক্ষণ।
৬. সুপ্ত শিক্ষণ।

চিরায়ত সাপেক্ষণ (Classicla conditioning)**:** এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন স্বনামধন্য রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ আইভান পেট্রোভিচ প্যাভলভ (Ivan petrovich Pavlov, 1849-1936)

প্যাভলভের তত্ত্বঃ পূর্বে যে প্রতিক্রিয়াটি একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি হতো, স্বাভাবিক উদ্দীপকের সাথে অন্য একটি সাপেক্ষ উদ্দীপক জুড়ে দেয়ার ফলে সাপেক্ষ উদ্দীপকটিও সেই প্রতিক্রিয়াটি তৈরি করতে সক্ষম হয়। তত্ত্বটিকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হলো- কুকুরের মুখে মাংসের টুকরা দেওয়া হলে লালা ক্ষরণ হয়। খাদ্য হলো অসাপেক্ষ উদ্দীপক (Unconditional stimulus) এবং লালা ক্ষরণ হলো অসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া। এর পর খুশিমত বেছে নেওয়া হলো কোনো একটি উদ্দীপককে; যেমন- ঘণ্টাধ্বনি সঠিক সময়ের ব্যবধানে অসাপেক্ষ উদ্দীপকের সঙ্গে বার বার উপস্থাপন করা হলে শুধু মাত্র ঘণ্টাধ্বনি স্বাধীনভাবে লালা ক্ষরণ সৃষ্টি করে। একে বলা হয় সাপেক্ষ উদ্দীপক (Conditioned stimulus) এবং এর প্রতি যে লালা ক্ষরণ ঘটে তাকে বলা হয় সাপেক্ষ উদ্দীপক (Conditioned response) চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের সময় ৫টি প্রধান প্রক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে। প্রথমটি হলো অর্জন অন্যান্য প্রক্রিয়া হলো অবলুপ্তি, স্বতঃস্ফূর্ত পুনরাগমন, সাধারণীকরণ ও পৃথকীকরণ।

অর্জন (Acquisition)**:** চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের প্রধান লক্ষ্য সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া অর্জন করতে প্রাণীর যে কটি প্রচেষ্টার প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা।

অবলুপ্তি (Extinction)**:** প্যাভলভ তার পরীক্ষণে লক্ষ্য করেন যে, মাংসের টুকরা না দিয়ে শুধু ঘণ্টাধ্বনি বাজালে লালা নিঃসরণের পরিমাণ কমতে থাকে এবং শেষে এমন এক পর্যায়ে আসে যখন আর কোনো লালা নিঃস্বরণ হয় না। লালা নিঃসরণের এই তিরোধানকে তিনি চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের অবলুপ্তি বলে আখ্যায়িত করেন।

স্বতঃস্ফূর্ত পুণরাগমন (Spontaneous recovery)**:** প্যাভলভ লক্ষ্য করেন যে, চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের অবলুপ্তি ঘটার পরের দিন কুকুরটিকে পরীক্ষাগারে এনে মাংসের টুকরা উপস্থাপন না করে শুধু ঘণ্টাধ্বনি করলে কুকুরটি লালা ফেলে। তিনি এ ঘণ্টাধ্বনিকে স্বতঃস্ফূর্ত পুণরাগমন বলে বর্ণনা করেন।

সাধারণীকরণ (Generalization)**:** কোনো একটা বিশেষ পরিবেশে শিক্ষাকৃত প্রতিক্রিয়া ঐ একই ধরনের অন্য পরিবেশে ব্যবহার করার প্রবণতাই হলো সাধারণীকরণ।

পৃথকীকরণ (Differentciation) ঃ পৃথকীকরণ হলো দুটি সাপেক্ষ উদ্দীপকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা।

প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিক্ষণ (Trial and Error Learning)**:** কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এলোমেলোভাবে চেষ্টা করলে ভুল হবে। ভুল করা আবার চেষ্টা করা এভাবে একে বার বার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এক সময় সমস্যা সমাধানের কৌশল আয়ত্তে আসে। বার বার এলোমেলো প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনে মাধ্যমে শিক্ষণ বলা হয়।

এডওয়ার্ড এল, থর্নডাইক (১৮৭৪-১৯৪৯) একটি ক্ষুধার্থ বিড়াল ও ধাঁধাঁ বাক্স (Puzle box) নিয়ে এই বিষয়ে গবেষণা করেন। এই বাক্সটিতে একটি দরজা আছে যা ভিতর থেকে আটকালো। ক্ষুধার্ত বিড়ালটি প্রথমে মিউ মিউ শব্দ করে এবং দেয়ালে নখ দিয়ে আঁচড় কাটে। এভাবে এলোমেলো প্রচেষ্টার ফলে হঠাৎ করে পাদানীতে চাপ লাগে। পাদানীটি একটি হুড়কার সাথে সংযুক্ত। পাদানীতে চাপ লাগার ফলে হুড়কা সরে আসে এবং দরজা খুলে যায়। কিন্তু বিড়ালটি টের পেল না কিভাবে দরজা খুলে গেল। সে বাইরে বের হয়ে খাবার খেল আবার তাকে ঐ বাক্সে রাখা হলো। এবারও তার মধ্যে অনুরুপ আচরণ দেখা গেল একইভাবে বাক্স থেকে বের হয়ে খাবার খেল। কিন্তু কীভাবে দরজা খুলে গেল বুঝতে পারল না এভাবে বেশ কয়েকবার প্রচেষ্টার পর দেখা গেল যে বিড়ালটি দরজা খোলার কৌশলটি শিখে ফেলেছে। থর্নডাইক বহুবার এ প্রণালীটির পুণাবৃত্তি করেন এবং আবিষ্কার করেন যে, চেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে পাদানীতে চাপ দেয়ার সময়ের পরিমাণ দ্রুত কমে যায়। অর্থাৎ বিড়ালটি খাদ্য পাওয়ার কৌশল হিসেবে একটি প্রতিক্রিয়া করতে শিখে ফেলে।

প্রচেষ্টা ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য:

১. এই শিক্ষণ শুরু হয় একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে।
২. প্রথম পর্যায়ে নানাবিধ প্রচেষ্টা।
৩. অজ্ঞাতসারে হঠাৎ সমস্যার সমাধান।
৪. ভুল প্রতিক্রিয়া ক্রমাগতভাবে অবলুপ্তি।
৫. নির্ভুল প্রতিক্রিয়া দৃঢ়করণ।

তৃতীয় অধ্যায়: আবেগ ও ক্রীড়া

আবেগ (Emotion)

ইংরেজি Emotion এর আভিধানিক বাংলা অর্থ আবেগ। Emotion শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Emover হতে উৎপত্তি লাভ করে, যার অর্থ বাহিরে পরিচালিত করা (To move out)। মানুষের কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে, সুখে-দুঃখে অনেক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। আর এ সকল ঘটনার সাথে মানুষের আবেগ জড়িত রয়েছে। কেননা, আবেগ মানুষের নিত্যসঙ্গী। আবেগের কারণে মানুষ বিচিত্র ধরনের আচরণ করে। তাছাড়া আবেগ হলো এক প্রকার জটিল অনুভূতি। এ অনুভূতি কতগুলো সহজাত প্রবৃত্তি এবং বিশেষ বস্তু বা ধারনা থেকে জাগরিত হয়। অধিকন্তু আবেগের ফলে কতগুলো বিশেষ ধরনের দৈহিক প্রকাশ ঘটে। আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটলে মানুষ নানাবিধ কাজে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করার সময় মানুষ বা প্রাণীর মধ্যে যে আলোড়ন বা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাকে আবেগ বলে।

আবেগের একটি অভিজ্ঞতার দিক রয়েছে। যেমন– আনন্দ, ভয়-ভীতি, ক্রোধ ইত্যাদি। তাছাড়া আবেগের একটি আভ্যন্তরীন আচরণিক দিকও রয়েছে। তাই আবেগ সৃষ্টি হলে মানুষ বা প্রাণীর আচরণের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন- দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি ইত্যাদি। সুতরাং আবেগ হলো অভ্যন্তরীন ভারসাম্যচ্যুত একটি শারীরিক অবস্থা যা ব্যক্তিগত বা আত্মগতভাবে অনুভব করা যায় এবং স্নায়বিক, পেশীয় রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রমণ্ডলী, শ্বাসযন্ত্র ও হরমোন সম্বন্ধীয় শারীরিক পরিবর্তন সূচিত করে। এই সব অভ্যন্তরীণ যন্ত্রমণ্ডলীর পরিবর্তন দৈহিক প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতি তৈরি করে, যার বহি:প্রকাশ হতেও পারে- নাও হতে পারে:

আবেগের প্রকারভেদ: আবেগ প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে। (১) ইতিবাচক আবেগ। যেমন- আনন্দ, সুখ, ভালবাসা, গর্ব (২) নেতিবাচক আবেগ। যেমন- রাগ, দুঃখ, ভয়, বিরক্তি।

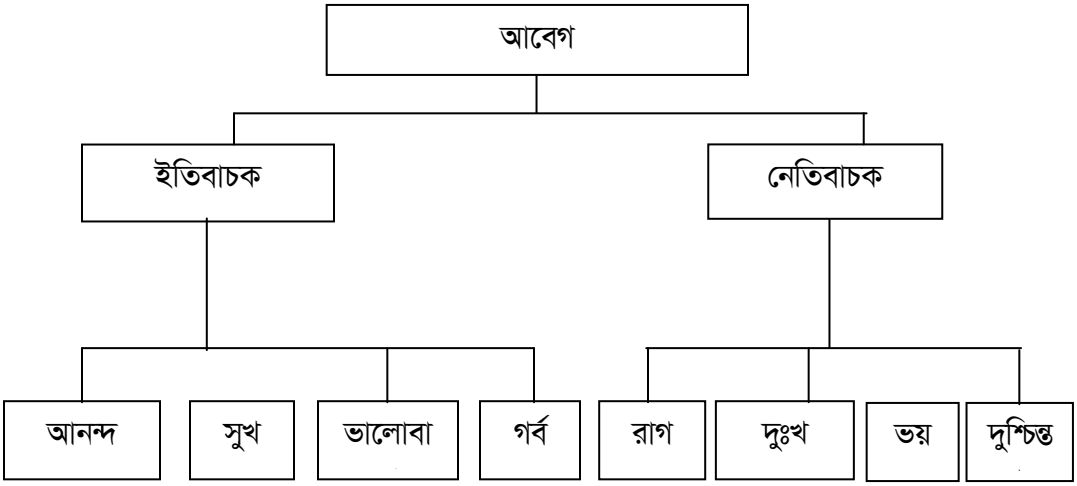

উদ্বিগ্নতা (Anxiety) ঃ এটি হলো একটি নেতিবাচক আবেগীয় অবস্থা যার পশ্চাতে থাকে ঘাবড়ে যাওয়া, উদ্বিগ্নতা, আশংকা প্রভৃতি কারণ এবং রয়েছে নেতিবাচক কর্মকান্ড এবং শারীরিক বিপর্যয়।

উদ্বিগ্নতা দুই রকমের হয়ে থাকে-

(১) প্রকৃতিগত উদ্বিগ্নতা (Trait anxiety)
(২) অবস্থানগত উদ্বিগ্নতা (State anxiety)

প্রকৃতিগত উদ্বিগ্নতা: আপাত দৃষ্টিতে বিপদঘটিত পরিস্থিতি না হলেও ব্যক্তি বিপদের আশংকা করে থাকে। ব্যক্তির এই উদ্বিগ্নতা কেবলই ব্যক্তিত্বনির্ভর। যাদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি তারা বড় ধরনের প্রতিযোগিতায় তুলনামূলকভাবে বেশি উদ্বিগ্নতায় ভোগে।

অবস্থানগত উদ্বিগ্নতা: এটা ক্ষণস্থায়ী, সদা পরিবর্তনশীল বাস্তবিক আবেগীয় অবস্থা। অবস্থানগত উদ্বিগ্নতা বলতে পরিস্থিতি এবং ব্যক্তির অবস্থানগত তারতম্যের নিরিখে পরিবর্তনশীল। এটি দুই রকমের হয়ে থাকে।

১. জ্ঞানীয় উদ্বিগ্নতা (Cognitive anxiety)
২. শারীরবৃত্তীয় উদ্বিগ্নতা (Somatic anxiety)

জ্ঞানীয় উদ্বিগ্নতা (Cognitive state anxiety)**:** চিন্তাভাবনার স্তরে এমন এক উদ্বিগ্নতা যা নেতিবাচক আত্মমূল্যায়ন ঘটায়। যেমন- পারফরমেন্স সম্পর্কিত নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা, অমনোযোগ ইত্যাদি।

শারীরবৃত্তীয় উদ্বিগ্নতা (Somatic state anxiety)**:** নেতিবাচক আত্মমূল্যায়ন থেকে সৃষ্ট যে উদ্বিগ্নতা যা দৈহিক সক্রিয়তার মুহুর্মুহু পরিবর্তন ঘটায়। ব্যক্তির প্রকৃতিগত উদ্বিগ্নতার মাত্রা অনুযায়ী অবস্থানগত উদ্বিগ্নতার তীব্রতা নির্ধারিত হয়। যেমন- ঘাম নিঃসরণ হওয়া, পেটের মধ্যে মোচড় অনুভব করা, হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে যাওয়া, কাঁপুনি ইত্যাদি।

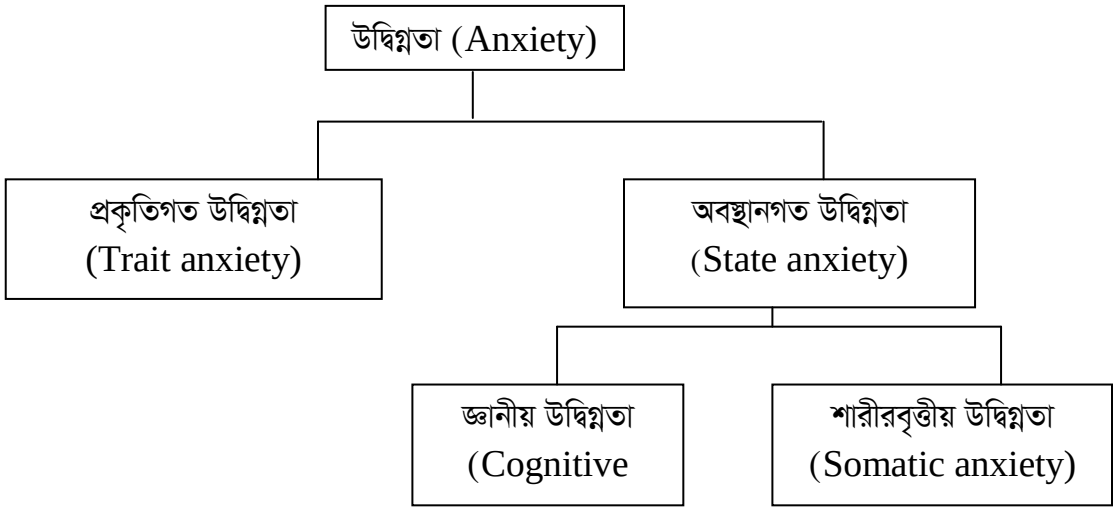

ক্রীড়া পারদর্শিতায় উদ্বিগ্নতা বা উত্তেজনার সম্পর্ক:

ক্রীড়াক্ষেত্রে আবেগিক উত্তেজনা ক্রীড়াবিদ বা প্রশিক্ষণার্থীদের আচরণে কতটা প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ক্রীড়াক্ষেত্রে আবেগিক উত্তেজনার কারণে সাধারণত দুই ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়:

১. **বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন।**
২. **আভ্যন্তরীন আচরণের পরিবর্তন।**

বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন:

ক) মুখের ভাবের পরিবর্তন।
খ) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়ার পরিবর্তন।
গ) গলার স্বরের পরিবর্তন।
ঘ) চক্ষু গোলকের পরিবর্তন।
ঙ) মুখের লালাক্ষরণের পরিমাণে তারতম্য।

অভ্যন্তরীণ আচরণের পরিবর্তন:

ক) হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের পরিবর্তন।
খ) রক্তচাপের গতিবেগের পরিবর্তন।
গ) নাড়ির গতিবেগের পরিবর্তন।
ঘ) রক্ত সঞ্চালনের পরিবর্তন।
ঙ) মস্তিষ্কের ক্রিয়ার পরিবর্তন।
চ) শ্বাসকার্যের পরিবর্তন।

নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

বাহ্যিক পরিবর্তন:

১. **মুখের ভাবের পরিবর্তন:** ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রশিক্ষকগণ খেলোয়াড়দের অঙ্গভঙ্গি ও মুখের ভাব পর্যালোচনা করে আবেগিক উত্তেজনা নিরূপণ করে থাকেন।
২. **গলার স্বরের পরিবর্তন:** আবেগের সময় অনেক ক্ষেত্রে স্বরের পরিবর্তন হয়। সাধারণত যখন আবেগিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় তখন খেলোয়াড়গণ উচ্চ গলায় চিৎকার করে থাকে।
৩. **চক্ষু গোলকের নড়াচড়ার পরিবর্তন:** আবেগিক উত্তেজনা বেড়ে গোল চোখের পেশির টান কখনও বাড়ে, আবার কখনও কমে। ফলে আবেগের সময় কোনো সময় চোখ বড়ো লাগে আবার অনেক সময় চোখ ছোটো লাগে।
৪. **মুখের লালা-ক্ষরণের পরিমাণের তারতম্য:** আবেগিক উত্তেজনা বেড়ে গেলে আবেগ ক্ষেত্রে লালা-ক্ষরণের পরিমাণ কমে যায়। যেমন : ভয়ে বা টেনশনের সময় গলা শুকিয়ে যায়।

অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন:

১. **হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের পরিবর্তন:** সাধারণত সুস্থ অবস্থায় হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের সংখ্যা মিনিটে থাকে ৭৫ বার। ক্রীড়াক্ষেত্রে সাধারণত একজন খেলোয়াড়ের হৃদযন্ত্রের স্পন্দন খেলা চলাকালীন ১২০ থেকে ১৪০ পর্যন্ত বা তার বেশি উঠতে পারে। যদি আবেগিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, তবে হৃদস্পন্দন আরো বৃদ্ধি পায়। তখন খেলোয়াড় দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

২. **রক্তচাপের পরিবর্তন:** আবেগিক উত্তেজনার কারণে রক্তচাপ খুব বেশি পরিমাণে বাড়ে।

৩. **নাড়ির গতিবেগের পরিবর্তন:** আবেগিক উত্তেজনার প্রভাবে নাড়ির গতিবেগের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন- ভয়ের কারণে যখন নিরাপদ অবস্থানে যেতে চাই তখন নাড়ির গতি বেড়ে যায়। আবার অতিরিক্ত উদ্বিগ্নতার কারণে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

৪. **ত্বকের পরিবহন ক্ষমতার পরিবর্তন:** আবেগিক উত্তেজনার কারনে ত্বকের সাধারন পরিবহন ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। মানুষের ত্বকে তড়িৎ পরিবাহী ক্ষমতাকে Galvanic Skin Reflex বা সংক্ষেপে G.S.R বলে যা আবেগের তারতম্যের কারণে পরিবর্তন হয়।

৫. **মস্তিষ্কের ক্রিয়ার পরিবর্তন:** আবেগিক উত্তেজনার কারণে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার পরিবর্তন হয় যার ফলে ঐ সময় খেলোয়াড়গণ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

৬. **শ্বাসকার্যের পরিবর্তন:** শ্বাসকার্যের পরিবর্তন নিরূপণের লক্ষ্যে সূচক হিসেবে। অনুপাত ব্যবহার করেন।

$$= \frac{\text{প্রশ্বাসের সময়কাল}}{\text{নিশ্বাসের সময়কাল}}$$

স্বাভাবিক অবস্থায় এ অনুপাত থাকে ৪০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে। খেলাধুলা বা ব্যায়ামের সময় এই অনুপাত বেড়ে ৭৫ হয়ে থাকে।

ক্রীড়া পারদর্শিতায় উদ্বিগ্নতার প্রভাবঃ

ক্রীড়া পারদর্শিতায় আবেগিক উত্তেজনা খেলোয়াড়দের নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ ও ব্যক্তিসত্তা বিকাশে সহায়তা করে। আবেগ আমাদের সামাজিক জীবনের প্রাণশক্তি ও অনুরাগকে বাড়িয়ে তোলে। ভাল পারফরমেন্স এর জন্য খেলোয়াড়দের যথাযথ উত্তেজনার (Optimum level of arousal) দরকার হয়। এই যথাযথ উত্তেজনার মাত্রা ২টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

ক) খেলার ধরন

খ) ব্যক্তিত্ব

খেলার ধরন (Type of sports): বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, খেলার ধরন অনুযায়ী খেলোয়াড়দের উত্তেজনা আলাদা হবে এবং এটা ক্রীড়াদক্ষতার মূল চালিকা শক্তি। হারমন এবং জনসন, তারা কলেজ ফুটবল দলের উপর গবেষণা করে দেখেছেন যে, যখন তারা ভালো করেছে তখন খেলোয়াড়দের উত্তেজনা ছিল উচ্চ পর্যায়ে। আবার সেই দল যখন খারাপ খেলেছে তখন দেখা গেছে তাদের উত্তেজনা ছিল খুব নিম্ন পর্যায়ে।

এ বিষয়ে পরিস্কার ধারণা দেওয়া হলো

উত্তেজনার মাত্রা	ক্রীড়া
#৫ চরমভাবে উত্তেজনার মাত্রা	ফুটবল (ব্লকিং এবং ট্যাকলিং), সিট আপ, পুশ আপ, ভারোত্তলন
#৪ বেশি উত্তেজনার মাত্রা	দৌড়, দীর্ঘ লাফ, শর্ট পুট, সাঁতার, রেসলিং এবং জুডো
#৩ মাঝামাঝি উত্তেজনার মাত্রা	বাস্কেটবল, বক্সিং, উচ্চ লাফ, জিমন্যাস্টিক্স
#২ অপেক্ষাকৃত কম উত্তেজনার মাত্রা	বেইসবল, ফেন্সিং
#১ কম উত্তেজনার মাত্রা #০ স্বাভাবিক উত্তেজনার মাত্রা	আর্চারি, বোলিং, গোল কিপিং, গলফ

উপরের টেবিল থেকে বঝা যায় ক্রীড়াক্ষেত্রে আবেগিক উত্তেজনার প্রভাব রয়েছে। কোনো কোনো ক্রীড়াক্ষেত্রে বেশি মাত্রা # ৫ পরিমাণ উত্তেজনার ধাপ দরকার। যেমন- ফুটবল, ভলিবল, সাঁতার ইত্যাদি। আবার কিছু ক্রীড়ায় অল্পমাত্রায় উত্তেজনা দরকার। যেমন- শুটিং, আর্চারী, গলফ। মধ্যবর্তী উত্তেজনার স্তর যে সমস্ত ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রয়োজন সেগুলো হলো- জিমন্যাস্টিক্স, মুষ্টিযুদ্ধ, গোলক নিক্ষেপ, ফুটবলের মধ্যমাঠের খেলোয়াড়, বাস্কেটবল ইত্যাদি।

যথাযথ উত্তেজনা ভালো পারফরমেন্স এর মধ্য একান্ত প্রয়োজন। আবার এই যথাযথ উত্তেজনা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। এ সম্পর্কিত কিছু তত্ত্ব রয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে বিষয়টি বর্ণনা করা হলো :

Drive Theory

Drive Theory মূলত Hull (1943) কর্তৃক প্রবর্তিত। তবে পরবর্তী সময়ে (Spence & spence. 1966) এটার পরিমিত রূপ দেন। এই তত্ত্বানুযায়ী পারফরমেন্স হলো উদ্যোগ (drive) এবং অভ্যাস শক্তি (habit strength) এর মিলিত ফল। উদ্যোগ এর সমার্থক হলো " জাগরণ" (arousal) এবং অভ্যাস শক্তি হলো ভুল কিংবা শুদ্ধভাবে যেভাবে সাড়া দেওয়া হচ্ছে তা অর্থাৎ সুদক্ষ কিংবা নতুন করে শিখছে উভয় হতে পারে। জাগরণ (Arousal) এবং ক্রীড়া নৈপুণ্যের (Performance) মধ্যকার সম্পর্ককে এভাবে দেখানো যেতে পারে-

$P = H \times D$

এখানে, P = ক্রীড়া নৈপুণ্যের (Performance)

H = অভ্যাস শক্তি (Habit strength)

D = উদ্যোগ বা জাগরণ (Drive or arousal)

এই তত্ত্বের মূলকথা হলো জাগরণ (arousal) বৃদ্ধি পেলে তার প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ ক্রীড়া নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাবে এবং জাগরণ কমলে ক্রীড়া নৈপুণ্য কমবে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মনে করা হয় যে, দক্ষতা অর্জন চলাকালীন arousal বৃদ্ধি পেলে Performance খারাপ হয়, এবং পুরোপুরি দক্ষতা অর্জিত হয়ে গেলে তারপর arousal বৃদ্ধি পেলে Performance উন্নত হয়।

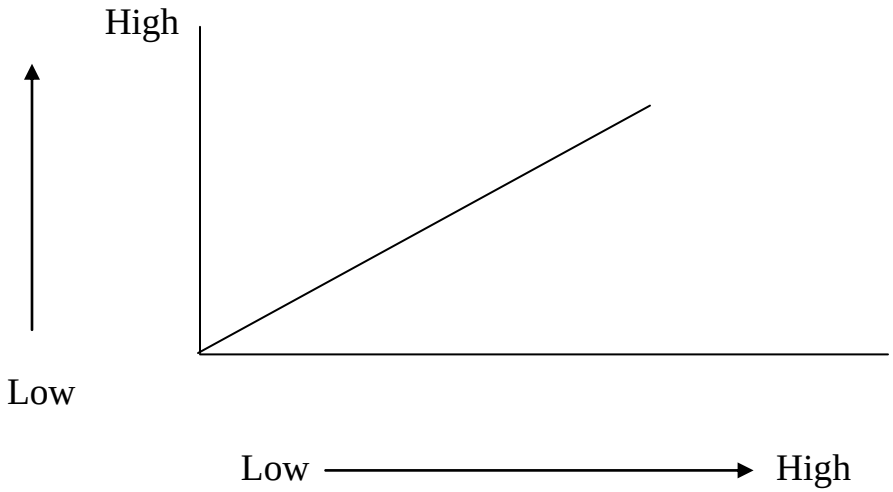

Physiological Arousal

Drive Theory

The Inverted "U" Theory

১৯০৮ সালে Yerkes এবং Dodson পারফরমেন্স এবং arousal এর মধ্যে সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে Inverted "U" Drive Theory এর ব্যাখ্যা দেন।

তাদের মতে, arousal বৃদ্ধি পেলে Performance ভালো হয় কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় (optimal level) এ আসার পর arousal বৃদ্ধি পেলে Performance ভালো হয় না বরং খারাপ হতে থাকে। গ্রাফে এটি বক্ররেখা তৈরি করে যা দেখতে ইংরেজি উল্টা U এর মতো। এই তত্ত্বের সমর্থনে Duffy উল্লেখ করেন যে, ক্রমবর্ধিত পেশিগত চাপ (Muscular tension) দুর্বল পারফরমেন্স ঘটায় এবং সাড়া প্রদানে এক ধরনের ঢিলেমি চলে আসে। তার মতে একটি পরিমিত মাত্রায় arousal থাকলে সর্বোচ্চ পারফরমেন্স হয় কিন্তু arousal সেই পরিমিত মাত্রায় চেয়ে কম বা বেশি হলেই পারফরমেন্স খারাপ হতে থাকে। Inverted "U" Drive Theory অনেক গবেষক দ্বারা পরীক্ষিত ও সমর্থিত হয়েছে।

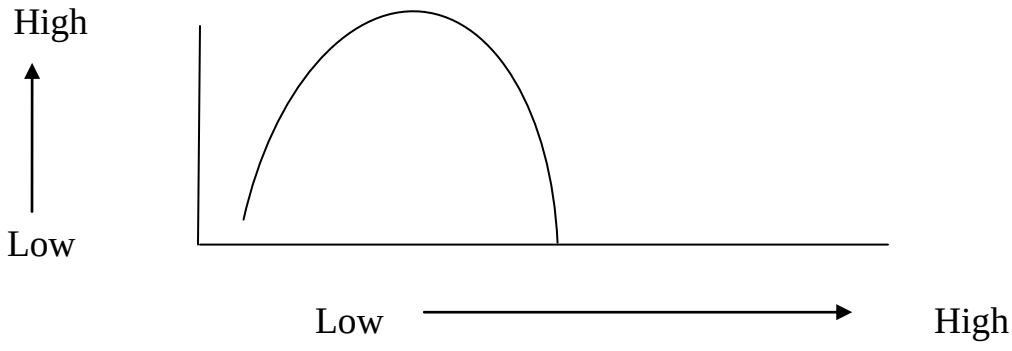

Physiological Arousal

The Inverted – U Arousal Performance Relationship

ZOF (Zone of optimal functioning)

ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানী Yuri Hamim (1980) অবস্থানগত উদ্বিগ্নতা ও পারফরমেন্সর মধ্যে সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে এই তত্ত্বটির প্রস্তাব করেন। যথাযথ মাত্রার উত্তেজনা (Optimal level) যেখানে একজন খেলোয়াড় সর্বোচ্চ পারফরমেন্স দেখাতে পারে সেটি এক জায়গায় স্থির নয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যথাযথ মাত্রার উত্তেজনা (Optimal level) সব সময় অবস্থানগত উদ্বিগ্নতা (State anxiety) এর ঠিক মাঝামাঝিতেই হয় না। এটি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ZOF মডেল অনেক গবেষণা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে (Gould and Tottery, 1996). Hanin 1997 সালে উদ্বিগ্নতা সম্পর্কিত IZOF ধারণাটি দেখাতে চেয়েছেন। কীভাবে নানা ধরনের আবেগ যেমন- দৃঢ়তা, আনন্দ, মমতাকে ভালো পারফরমেন্সের জন্য ব্যবহার করতে হয়। তিনি আরো পরামর্শ দেন যে, এ্যথলেটদের যথাযথ মাত্রার উত্তেজনা কোনোটি তা শুধু জানলেই হবে না বরং বিভিন্ন আবেগকে কীভাবে ব্যবহার করে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় তার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

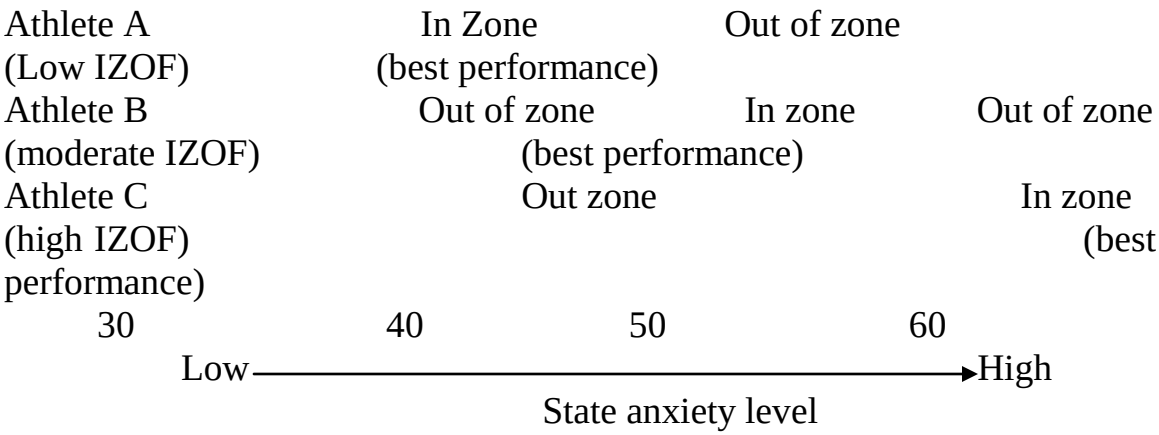

Multidimensional Theory

আবেগ আসলে কমপক্ষে দুইটি উপাদানে গঠিত এবং সেগুলো হলো জ্ঞানীয় (Cognitive) এবং শারীরবৃত্তীয় উদ্বিগ্নতা (Somatic anxiety). Multidimensional Theory ব্যাখ্যা করে যে, Cognitive anxiety পারফরমেন্সের সাথে ঋনাত্মক সম্পর্ক তৈরি করে অর্থাৎ Cognitive anxiety বৃদ্ধি পেলে পারফরমেন্স খারাপ হবে এবং Cognitive anxiety কমলে পারফরমেন্স ভালো হবে। অপরদিকে যে Somatic anxiety রয়েছে তা পারফরমেন্সের সাথে Inverted "U" তত্ত্বের মত সম্পর্কিত। অর্থাৎ Somatic anxiety একটি নির্দিষ্ট optimal level পযর্ন্ত সর্বোচ্চ পারফরমেন্স সাধিত হয় এবং anxiety সেই level এর চেয়ে বেশি হলে পারফরমেন্স খারাপ হয়।

Catastrophe Theory

Rene Thom (১৯৭৫) সর্বপ্রথম Catastrophe মডেলটি তৈরি করেন। এটি ছিল একটি গাণিতিক মডেল। যদিও মডেলটি Thom এর কিন্তু এটিকে বেশি জনপ্রিয় করে তোলেন Zeeman (1976)। তিনি এটিকে সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। অনেকগুলো Catastrophe মডেল বিকশিত হয়েছে। এদের মধ্যে Cusp মডেলটি বেশি বোধগম্য।

Cusp catastrophe মডেলটি ত্রিমাত্রিক এবং এটি স্বাভাবিক উপাদান (normal factor) এবং শারীরবৃত্তীয় জাগরণে (Physiological arousal), ব্যাঘাত উপাদান (Splitting factor), জ্ঞানীয় উদ্বিগ্নতা (Cognitive Anxiety) এবং নির্ভরশীল চল (Dependent variable), ক্রীড়া নৈপুণ্য (Performance) নিয়ে গঠিত (Zeeman- 1975)। Normal factor সম্পর্কযুক্ত থাকে dependent variable এর সঙ্গে। এক্ষেত্রে Physiological arousal যদি Cognitive Anxiety (Splitting factor) ব্যতিরেকে বৃদ্ধি পায় তবে তা Inverted "U" hypothesis এর সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ Arousal বৃদ্ধি পেলে পারফরমেন্স ধীরে ধীরে অবনতি ঘটবে। অপরদিকে Physiological arousal এর সঙ্গে Cognitive Anxiety যুক্ত হয় তখন পারফরমেন্সের আকস্মিক বিপর্যয় ঘটে।
Catastrophe Theory তে anxiety performance সম্পর্কিত বিষয়টি সাম্প্রতিক কালের হওয়ায় সমর্থন করার মতো যথেষ্ট গবেষণা প্রমাণ নেই।

প্রতিযোগিতা প্রারম্ভে আবেগিক অভিব্যক্তি ব্যক্তিজীবনে আবেগিক প্রভাব যে অনেক, সে বিষয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই। আবেগের যেমন খারাপ প্রভাব আছে তেমনি আবেগ আমাদের সামাজিক জীবনের প্রাণশক্তি ও অনুরাগকে বাড়িয়ে তোলে। ক্রীড়া-শিক্ষাক্ষেত্রে আবেগিক উত্তেজনা খেলোয়াড়দের নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সহায়তা করে। ক্রীড়াক্ষেত্রে আবেগিক উত্তেজনাগুলো হলো:

১. প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি (Competitive readiness)
২. অতিরিক্ত উত্তেজনা (Pre-start fever)
৩. আগ্রহের অভাব (Pre-start apathy)

এ তিন ধরনের আবেগিক উত্তেজনা খেলোয়াড়দের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এ মৌলিক আবেগগুলোর মধ্যে অনেকগুলোকে ক্রীড়াক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এদের অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ ক্রীড়াদক্ষতাকে ব্যাহত করে। এদের বলা হয় হানিকর আবেগ। অন্যদিকে কিছু আবেগ আছে যেগুলো সমাজ-জীবন ব্যক্তিজীবন এমনকি ক্রীড়াক্ষেত্রে উচ্চ-ক্রীড়াদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। বিশেষ করে মাঝামাঝি আবেগিক উত্তেজনা উচ্চ-ক্রীড়াদক্ষতা অর্জনে খেলোয়াড়দের সহায়তা করে। এক্ষেত্রে ধণাত্মক আবেগিক উত্তেজনা হলো মাঝামাঝি প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি এবং ঋণাত্মক আবেগ নিম্ন উত্তেজনা। তবে সকল খেলাধুলায় খেলোয়াড়দের মাঝামাঝি উত্তেজনা থাকা দরকার। মাঝামাঝি উত্তেজনা খেলোয়াড়দের উচ্চ দক্ষতা অর্জনসহ সুন্দর ক্রীড়া দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। অধিক আবেগিক উত্তেজনায় কোনো খেলাধুলার খেলোয়াড়গণ ভালো ক্রীড়াদক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে না। তবে কিছু কিছু খেলোয়াড় অধিক উত্তেজনায়ও ভালো ক্রীড়াদক্ষতা প্রদর্শন করে। আবার একদম নিম্ন উত্তেজনাও খেলোয়াড়দের ক্রীড়াদক্ষতাকে ব্যাহত করে। তবে কিছু কিছু খেলাধুলায় নিম্ন উত্তেজনার দরকার রয়েছে। কোচ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হবে, যে সব আবেগ ঋণাত্মক ক্রীড়ামানকে নিম্ন করে। তাদের দূর করা বা যতদূর সম্ভব তাদের প্রভাব কমিয়ে আনা, আর যে সব আবেগ ক্রীড়ামান বিকাশে সহায়তা করে, তাদের যতটা বাড়িয়ে তোলা যায় তার চেষ্টা করা।

এখানে আমরা একটি চার্টের মাধ্যমে আবেগিক উত্তেজনা ও ক্রীড়াবিদ্‌দের মানসিক ও ক্রীড়াদক্ষতা অভিব্যক্তিসমূহ আলোচনা করব।

Pre start	Psychological Characteristics	Manifestation is sports
প্রতিযোগিতায় মাঝামাঝি আবেগ	প্রতিযোগিতার মাঝামাঝি আবেগ ক্রীড়াবিদদের প্রতিযোগিতার মনোভাব আত্মপ্রত্যয়, মনোযোগ ও ক্রীড়াদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।	মাঝামাঝি আবেগ প্রতিযোগিতায় আশানুযায়ী ফল দেয় এবং প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়গণ সফলভাবে ক্রীড়া কলা-কৌশল ব্যবহার করতে পারে।
অধিক আবেগিক উত্তেজনা	এটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। এর ফলে ক্রীড়াবিদদের মনোযোগ ব্যাহত হয়।	এ ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের ক্রীড়াদক্ষতায় এলোমেলোভাব লক্ষ্য করা যায়। তাদের ক্রীড়া কৌশল, খেলার গতি ও ছন্দ কমতে থাকে। তাদের আচরণ হয় মারমুখী।
নিম্ন আবেগিক উত্তেজনা	এ স্তরে খেলোয়াড়দের আবেগিক উত্তেজনা কমে যায় এবং তাদের প্রতিযোগিতার উপর মনোযোগ থাকে না।	এ স্তরে সামান্য শক্তি গতিশীল থাকে যার ফলে খেলোয়াড়গণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রতিযোগিতা প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না।

উদ্বিগ্নতার উৎসসমূহ (Source of anxiety)

১. পরিস্থিতিগত (Situational)

(ক) কোনো একটি বিষয়কে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া (Even importance)

(খ) অনিশ্চয়তা (Uncertainity)

২. ব্যক্তিগত (Personal)

(ক) ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত উদ্বিগ্নতা (Trait anxiety)

(খ) নেতিবাচক আত্মমূল্যায়ন (Self esteem)

উদ্বিগ্নতা দূর করার উপায়ঃ

১. পরিবেশগত কৌশল (Environmental technique)

(ক) প্রতিযোগিতার গুরুত্বের মাত্রা কমিয়ে আনা (Reduction of importance of competitive events)

(খ) অনিশ্চয়তার মাত্রা কমানো (Reduction of uncertainties)

(গ) রিলেক্সেশন টেপস এবং মিউজিক কোনো (Listening relaxation taps and music)

২. শারীরিক কৌশল (Physical technique)

(ক) প্রোগ্রেসিভ মাসল রিলেক্সেশন টেকনিক (Progressive muscle relaxation technique)

(খ) শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (Brithing control)

(গ) বায়োফিডব্যাক (Biofeedback)

৩. মানসিক কৌশল (Mental technique)

(ক) কল্পচিত্র (Imagery technique)

(খ) ইতিবাচক চিন্তন (Positive thinking)

(গ) সেলফ ইপনোসিস (Self-Hypnosis)

(ঘ) অটো সাজেশন (Auto-Suggestion)

চতুর্থ অধ্যায়: ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া

ব্যক্তিত্ব (**Personality**)

ইংরেজি Personality শব্দের আভিধানিক বাংলা অর্থ ব্যক্তিত্ব। Personality শব্দটির ল্যাটিন শব্দ persona হতে উৎপত্তি লাভ করে। Persona শব্দের অর্থ মুখোশ। প্রাচীনকালে রোমের অভিনেতারা মুখোশ পরে অভিনয়ের মাধ্যমে নিজেকে অপরের নিকট উপস্থাপন করত। মূলত নিজেকে অপরের নিকট উপস্থাপন করার জন্য প্রথমে ব্যক্তিত্ব শব্দটি ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ হিসেবে ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে। ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্রভাব। সাধারণত কোনো ব্যক্তির পছন্দ, কার্যপদ্ধতি, অভ্যাস, প্রকাশ ভঙ্গি, ব্যক্তিসত্তা ইত্যাদি গুণাবলি অন্য ব্যক্তির মনে সামগ্রিক রেখাপাত অংকন করে। তাই ব্যক্তির গুণাবলির সমষ্টিকে ব্যক্তিত্ব বলা হয়। তবে প্রকৃতিগত কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে পৃথক। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পৃথক বা স্বাতন্ত্রবোধকেও ব্যক্তিত্ব বলে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ব্যক্তির আচরণের যে সকল বৈশিষ্ট্য স্থায়ীভাবে গুণাবলি প্রকাশ করে তাকে ব্যক্তিত্ব বলে।

উড ওয়ার্থ এবং মারকুইস এর মতে, "ব্যক্তিত্বকে ব্যাপক অর্থে একজন ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক গুণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। ব্যক্তির চিন্তার ধরন ও প্রকাশভঙ্গি, তার মনোভাব ও আগ্রহ, তার কাজের প্রকৃতি এবং তার ব্যক্তিগত জীবন দর্শনে প্রকাশ পায়।"

বাসকির্স্ট এবং জারবিং বলেন, "ব্যক্তিত্ব হলো সময় ও পরিবেশের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত আচরণ ও চিন্তার এক বিশেষ ধরন যা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি থেকে পৃথক করে।"

লুইট টেকারে মতে, "ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের একক যে সংগঠন ব্যক্তির আচরণে পুনরাবৃত্তি দান করে তাকে ব্যক্তিত্ব বলে।"

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও আলোচনা বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ব্যক্তিত্ব হচ্ছে একটি একক সংগঠন যা একজন ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি হতে পৃথক করে উপস্থাপন করে। তাছাড়া ব্যক্তিত্ব কতিপয় বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলির সমষ্টি এবং গুণাবলির স্থায়িত্ব যা আচরণে পুনরাবৃত্তি ঘটায়। অতএব যে সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সংগঠন কোনো ব্যক্তিকে স্বকীয়তা দান করে আচরণে পুনরাবৃত্তি ঘটায় তাকে ব্যক্তিত্ব বলে। ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন আমাদের ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করে।

ব্যক্তিত্বের গঠন প্রকৃতি:

ব্যক্তিত্বকে পৃথক কিছু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা :

১. মানসিক মৌলিক দিক (Psychological core)
২. বৈশিষ্ট্যমূলক সাড়া (Typical responses)
৩. ভূমিকা সম্পর্কিত আচরণ (Role related behavior)

১. মানসিক মৌলিক দিক: ব্যক্তিত্বের মানসিক মৌলিক দিকটি হলো ব্যক্তিত্বের গভীর উপাদান ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি। এর মধ্যে রয়েছে মনোভাব ও মূল্যবোধ, আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমূল্যায়ন।

২. **বৈশিষ্ট্যমূলক সাড়া:** বৈশিষ্ট্যমূলক সাড়া বলতে সেসব প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা দ্বারা আমরা যেকোনো পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে শিখি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিকতার প্রতি সাড়া দেই। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যমূলক সাড়া উক্ত ব্যক্তির মানসিক মৌলিক দিককে নির্দেশ করে থাকে।

৩. **ভূমিকা সম্পর্কিত আচরণ:** এই আচরণটি হলো ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে পরিবর্তনযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পৃথক পৃথক পরিস্থিতিতে পৃথক পৃথক ভূমিকার প্রয়োজন হয়। একই দিনে হয়ত কখনও একজন ব্যক্তিকে ছাত্রের, কখনও খেলোয়াড়ের, আবার কখনও সন্তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। এই তিনটি পর্যায়ের মধ্যে মানসিক মৌলিক দিকই কেবল সবচেয়ে অন্তর্নিহিত এবং ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে স্থায়ী বিষয়বস্তু। অপর অন্যান্য পর্যায়গুলোর রয়েছে বেশি বাহ্যিক ভূমিকা সম্বলিত আচরণ এবং এগুলো বাহ্যিক সামাজিক পরিবেশ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।

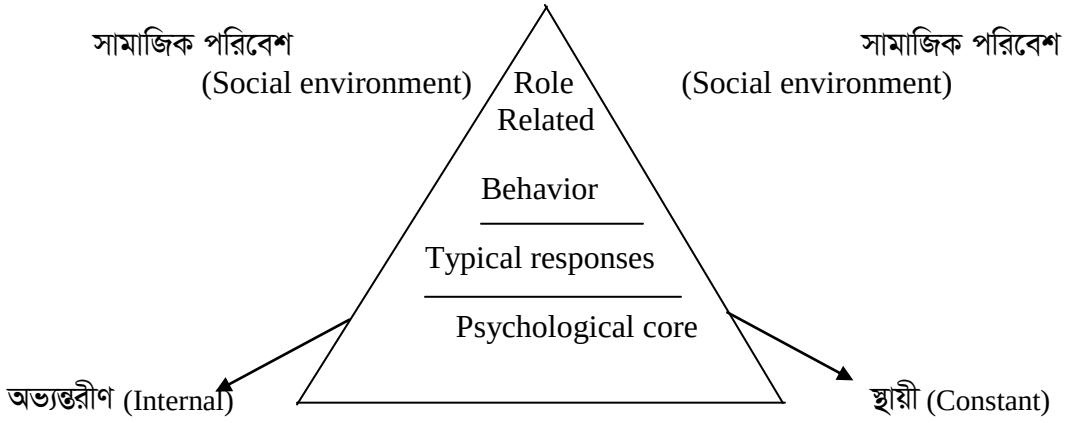

মনোবিজ্ঞানী Carl Jung (১৯২১) মানসিক সংলক্ষণ অনুসারে ব্যক্তিত্বকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

১. অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব (Intorvert)
২. বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব (Extrovert)

মনোবিজ্ঞানী Eysenk (১৯৪৭) মতে, ব্যক্তিত্বের একটি সংলক্ষণ বা দিক হলো অন্তর্মুখিতা- বহির্মুখিতা। দ্বিতীয়টি হলো দৃঢ়তা - অদৃঢ়তা যাকে অনেক সময় নিউরোটিসিজম (Neuroticism) প্রবণতাও বলা হয়।

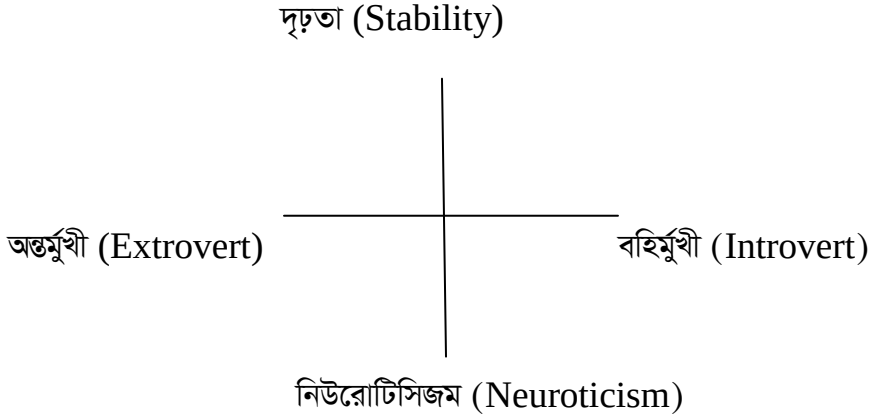

নিম্নে এদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব:

১. অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে।
২. বাইরের জগতের প্রতি এদের আকর্ষণ খুবই কম।
৩. আত্মকেন্দ্রিক, বাহ্যবস্তুর প্রতি উদাসীন, আত্মসচেতন এবং স্বার্থপর।
৪. অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল।
৫. নতুন পরিবেশে এরা সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।

বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব:

১. বাইরের জগতের প্রতি এদের রয়েছে দুর্বার আকর্ষণ।
২. এরা অন্যের সাথে মিশতে এবং প্রাণ খুলে আনন্দ প্রকাশে আগ্রহী।
৩. বাইরের জগতের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে এরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
৪. এরা খুবই সামাজিক এবং যে কোনো পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে এরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

দৃঢ়তা:

১. আবেগীয় প্রতিক্রিয়া কম। আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেরি হয়।
২. তারা জটিল প্রকৃতির নয় এবং দুশ্চিন্তাহীন জীবনযাপন করে।

অদৃঢ়তা ঃ

১. তারা উচ্চমাত্রায় সাধারণত উদ্বিগ্ন, ভাবপ্রবণ, বার বার হতাশাগ্রস্থ।
২. খুব সহজে তাদের অবস্থান থেকে ছিঁটকে পড়ে।
৩. তারা উদ্বিগ্নতাজনিত আবেগের শিকার হয়ে পড়ে।

উভয়মুখী: একই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কখনও অন্তর্মুখী আবার কখনও বর্হিমুখীও হতে পারে। যেমন- কেউ আত্মকেন্দ্রিক, আবার সামাজিকও বটে। এ ধরনের ব্যক্তিত্বকে বলা হয় উভয়মুখী।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়ার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা হলো:

১. সফল খেলোয়াড়দের ইতিবাচক মানসিক স্বাস্থ্য যেমন- আত্মবিশ্বাস, মনোযোগ, আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং অসফল খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্লান্তি, হীনম্মন্যতা, সংশয়, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি বিষয়গুলো বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।
২. একক খেলায় অংশগ্রহণকারী এবং দলীয় খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

অন্তর্মুখী কিন্তু দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন খেলোয়াড়রা হচ্ছে- টেনিস, ব্যাডমিন্টন, শুটিং, গলফার।
অন্তর্মুখী কিন্তু অদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ম্যারাথন দৌড়, দীর্ঘ দৌড়, সাঁতার দাবাড়ু।
বহির্মুখী ও স্থায়ী ব্যক্তিত্ব ফুটবল খেলোয়াড় (স্ট্রাইকার এবং ডিফেন্ডার) দৌড়বিদ, উচ্চলাফ খেলোয়াড়
বহির্মুখী ও অস্থায়ী ব্যক্তিত্ব বক্সিং কুস্তিবিদ/ মার্শাল আর্ট।

পঞ্চম অধ্যায়: প্রেষণা ও ক্রীড়া

প্রেষণা

Motivation শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ প্রেষণা। মূলত প্রেষণা শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Movere থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। Movere অর্থ To move বা চালনা করা অথবা গতিশীল করা কিংবা অগ্রবর্তী করা। সুতরাং যা কিছু মানুষ বা প্রাণীকে কোনো কাজে প্ররোচিত করে বা চালিত করে তাই প্রেষণা। প্রেষণার প্রতিশব্দ হিসেবে অনেকে কাম্যতা, কামনা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ইচ্ছা, অভিলাষ, প্রয়োজন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানে এ সব শব্দের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেষণা শব্দটি ব্যবহার করার বেশি পক্ষপাতি কারণ এটি নির্দিষ্ট অর্থে সর্বত্র ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া শব্দটি কোনো কিছুর কামনা ও কর্ম প্রেরণা এই দুটি অর্থই বহন করে।

প্রেষণা বা তাগিদ প্রশিক্ষণের একটি অতি প্রয়োজনীয় শর্ত। প্রশিক্ষণার্থীর যদি প্রশিক্ষণের তাগিদ না থাকে, তবে কোনো কিছু শেখা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রেষণা হলো একটি বিমূর্ত ধারণা। প্রেষণা বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যা কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ বা প্রবৃত্ত করে। এক কথায় প্রেষণা হলো ব্যক্তির আচরণের চালিকা শক্তি। প্রেষণা ব্যক্তির আচরণে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে এবং শিক্ষণীয় সঠিক প্রতিক্রিয়া করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানে প্রেষণাকে তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে দেখা হয়। যেমন –

১. তীব্রতা (Intensity)
২. লক্ষ্য সংক্রান্ত (Direction)
৩. স্থায়িত্ব (Persistence)

তীব্রতা: কারো যতটুকু পারদর্শিতা বা দক্ষতা আছে তাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়া।
লক্ষ্য সংক্রান্ত: কোন্ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি এগিয়ে যাবে আর কোন্ পরিস্থিতি সে বর্জন করবে।
স্থায়িত্ব: কতক্ষণ ধরে সে তার কার্যধারা চালিয়ে যেতে সক্ষম।
প্রেষণাকে সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। যেমন:
P = M (A+K)
P = ব্যক্তির কৃতি (Performance)
M = প্রেষণা (Motivation)
A = ক্ষমতা (Ability)K = জ্ঞান (Knowledge)

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে প্রেষণা উপস্থাপন করা হলো:

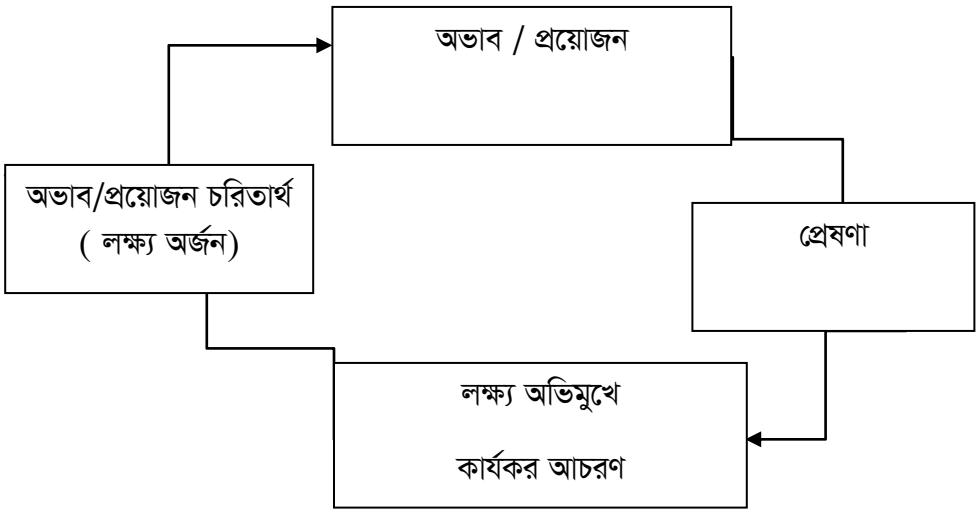

চিত্র: প্রেষণার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন

প্রেষণার প্রকারভেদ

প্রেষণা দুই ধরনের হয়ে থাকে।

১. অন্তর্নিহিত প্রেষণা (Intrinsic motivation)
২. বাহ্যিক প্রেষণা (Extrinsic motivation)

অন্তর্নিহিত প্রেষণা: অন্তর্নিহিত প্রেষণা হচ্ছে আত্মতৃপ্তি লাভ করার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার তাগিদ বা প্রেষণা। যখন কোনো ব্যক্তি বাইরের পুরস্কার প্রাপ্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে তার অনুশীলন বা কার্যধারা অব্যাহত রাখে তখন তাকে অন্তর্নিহিত প্রেষণা বলে।

বাহ্যিক প্রেষণা: বাহ্যিক প্রেষণা বলতে বোঝায় পুরস্কার বা পারিতোষক লাভ করার উদ্দেশ্যে কার্যসম্পাদনের যে তাগিদ বা প্রেষণা। যেমন- অর্থ, সম্মান, ট্রফি ইত্যাদি।

অন্তর্নিহিত প্রেষণার লক্ষণ হচ্ছে ক্রীড়াক্ষেত্রে নৈপুণ্য বা উৎকর্ষ লাভের জন্য বিরামহীন চেষ্টা এবং কার্যসম্পাদনে উচ্চমানের দক্ষতা অর্জন করে তৃপ্তি লাভ করা। অন্তর্নিহিত প্রেষণার ফলে ক্রীড়াবিদদের মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ ধরনের প্রেষণা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই বাহ্যিক প্রেষণাকে আভ্যন্তরীণ প্রেষণায় রূপান্তরিত করতে হবে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্ধারণ

একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো কাজের দক্ষতা অর্জনে সফল হওয়াকে লক্ষ্য অর্জন বলে। লক্ষ্য দুই ধরনের হতে পারে। যেমন –

১. বিষয়ভিত্তিক (Subjective)
২. উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objective)

বিষয়ভিত্তিক লক্ষ্য হলো এক প্রকার সাধারণ বিবৃতি বা বর্ণনা। (যেমন : আমি খেলায় ভালো করব)।

উদ্দেশ্যভিত্তিক লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কর্মসম্পাদনে সুনির্দিষ্ট মানসম্পন্ন ক্রীড়া নৈপুণ্য করার ইচ্ছাকে উদ্দেশ্যভিত্তিক লক্ষ্য বলে।

লক্ষ্যের প্রকারভেদ (Types of Goal):

লক্ষ্যের প্রকারভেদ তিনটি। যথা:

১. ফলাফল কেন্দ্রিক লক্ষ্য (Out come goal)
২. ক্রীড়া নৈপুণ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য (Performance goal)
৩. ক্রীড়া কৌশল বৃদ্ধির লক্ষ্য (Process goal)

ফলাফল কেন্দ্রিক লক্ষ্য: এটা হলো ফলাফল কেন্দ্রিক। যেমন ম্যাচ জয়, অনেক বেশি গোল করা, দৌড়ে প্রথম হওয়া ইত্যাদি। Out come Goal শুধু খেলোয়াড়ের নিজেদের পারফরমেন্সের উপর নির্ভর করে না প্রতিপক্ষের পারফরমেন্সের উপরও এটা নির্ভরশীল।

ক্রীড়া নৈপুণ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য: এটা হলো পারফরমেন্স উন্নত করা এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় স্বাধীনভাবে লক্ষ্য অর্জন কেন্দ্রিক একটি বিষয়। এটা নিজের সাথে নিজের প্রতিযোগিতা যাতে পারফরমেন্সকে আরো উন্নত করা যায় এবং এই বিষয়টি খেলোয়াড়ের নিজ নিয়ন্ত্রণে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বাস্কেটবলে ফ্রি শর্টের সফলতা আট সপ্তাহে ৫০% থেকে ৭০% এ উন্নীত করা, নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বের চেয়ে কম সময়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব দৌড়ানো ইত্যাদি; এতে তার লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে যদিও সে প্রতিযোগিতায় নাও জিততে পারে।

ক্রীড়া কৌশলগত বৃদ্ধির লক্ষ্য ঃ দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কৌশলগত উন্নয়নে যে যে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় সেগুলোর প্রতি মনোনিবেশ (Focus) করার নাম হলো ক্রীড়া কৌশলগত বৃদ্ধির লক্ষ্য। উদাহরণস্বরূপ, সাঁতারের সময় পেছনের পা পানিতে লাথি মারার কৌশল রপ্ত করা, টেনিস খেলায় ব্যাক হান্ড ঘুরিয়ে মারার (Follow) কৌশল উন্নত করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত তিনটি লক্ষ্যই প্রয়োজন। তবে ক্রীড়া নৈপূণ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য এবং ক্রীড়া কৌশলগত বৃদ্ধির লক্ষের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা out come goal স্থির (set) করে থাকে তাদের মধ্যে বেশি উদ্বিগ্নতা এবং কম আত্মবিশ্বাস থাকে। কেননা তাদের এ লক্ষ্য অর্জন তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না। অপরদিকে, যারা ক্রীড়া নৈপুণ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করে থাকে, তাদের উদ্বিগ্নতা কম থাকে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বেশি থাকে। কেননা তাদের লক্ষ্য প্রতিপক্ষের পারফরমেন্স নয় বরং তার নিজের পারফরমেন্স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

লক্ষ্য নির্ধারণের নীতিমালা

১. **সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ** (Set Specific Goal)**:** লক্ষ্য নির্ধারণের অবশ্যই সুনির্দিষ্টতা থাকতে হবে। আর এ লক্ষ্যটি পরিমাপযোগ্যতার ও আচরণযোগ্যতার ভিত্তিতে হতে হবে। এটা বিষয়ভিত্তিক হবে না বরং উদ্দেশ্যভিত্তিক হবে। যেমন – একজন বাস্কেটবল খেলোয়াড়– "আমি ভালো করব" এরূপ না ভেবে তার ভাবা উচিত "আমি ১০ টি থ্রো-র মধ্যে আমি ৮টি বাস্কেটে ফেলব"। কিংবা একজন স্প্রিন্টার "আমি ভালো দৌড়াবো"- এরূপ লক্ষ্য নির্ধারণ না করে বরং "আমার টাইমিং ১০:৫০ থেকে ১০:৪০ সেকেন্ডে নিয়ে আসবো" ইত্যাদি।
২. **পরিমিতভাবে কঠিন কিন্তু বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ** (Set moderately difficult but realistic Goals)**:** পরিমিতভাবে কঠিন কিন্তু সম্ভবপর লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এতে পারফরমেন্স উন্নত হয়। খুব কঠিন লক্ষ্য নির্ধারণ করলে হতাশার সৃষ্টি হয় আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং পারফরমেন্সও হয় খারাপ। অপরদিকে খুব সহজ লক্ষ্য নির্ধারণ করলে খেলোয়াড়ের আগ্রহ এবং অনুপ্রেরণা কমে যায়।
৩. **দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ** (Set long and short- term goals)**:** দীর্ঘ মেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ করে এদের মধ্যে যোগসুত্র সাধন করতে হবে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক, যেমন উপরে উঠার দীর্ঘ সিঁড়িপথটি হলো দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং ঐ সিঁড়ি পথটির প্রতিটি ধাপ হলো স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্যের উদাহরণ।
৪. **ক্রীড়া নৈপুণ্য, ক্রীড়াকৌশল বৃদ্ধির এবং ফলাফল কেন্দ্রিক লক্ষ্য নির্ধারণ** (Set performance goal process goal and outcome goal)**:** সঠিক ও সুচিন্তিতভাবে উপরোক্ত লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা।

৫. **অনুশীলন ও প্রতিযোগিতামূলক লক্ষ্য নির্ধারণ** (Set practice and competition Goal): অনুশীলনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা খেলোয়াড়রা অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করে থাকে। ট্রেনিং-এর মান ধরে রাখার জন্য অনুশীলন লক্ষ্য বজায় রাখা একটা ভাল পন্থা।

৬. **রেকর্ড রাখা** (Record Goal): **কথায় বলে** Out of sight out of mind**,** লক্ষ্য অর্জনের বিষয়গুলোর রেকর্ড থাকতে হবে এবং সহজেই চোখে পড়ে এমন জায়গায় সেগুলো স্থাপন করতে হবে। ডায়েরি লিখা রেকর্ড সংরক্ষণ করার একটা ভালো উপায়।

৭. **মূল্যায়ন ও প্রতিব্যবস্থা গ্রহণ** (Evaluate and provide feedback)**:** লক্ষ্য নির্ধারণ ও মূল্যায়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি এক সপ্তাহ বা ১৫ দিনের কোনো স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় তবে সে সময়ান্তে কতটুকু সাফল্য অর্জন হলো তা জানতে মূল্যায়ন পরীক্ষা নিতে হবে। তারপর ফলাফল দেখে যথাযথ প্রতিব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থাবলি

1. Dianel Gill, Psychological Dynamic of Sports Exercise.
2. Douglas And Holl. Foundation of Education Psychology.
3. Dr. Hardayal Singh. Science of Sports Training.
4. Gill D.L. “Competitive Anxiety. In Psychological Dynamics of Sport and Exercise” ed. Dianel. Gill, Human Kinetics Champaign, IL 2000.
5. Weinberg Roberts S, Gould D. “Foundations of Sport and Exercise Psychology”. Human Kinetics Champaign IL, 1994.

৬. মোহাম্মদ সোহেলো। ক্রীড়া শিক্ষায় মনোবিদ্যা

৭. জসিম উদ্দিন আহম্মেদ। শিক্ষা ও ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান

৮. মনোবিজ্ঞান ও জীবন। নীহার রঞ্জন সরকার

এক্সারসাইজ ফিজিওলজি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বি-স্পোর্টস/বিএ/বিএসসি ডিগ্রির সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত

মো. বখতিয়ার

ব্যাচেলর অব ফিজিওথেরাপি (চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইন নিউরোমেডিসিন (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়)
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন এক্সারসাইজ ফিজিওলজি (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা (এক্সারসাইজ ফিজিওলজি)
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাভার, ঢাকা

মুখবন্ধ

আধুনিক ক্রীড়া শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণকে করা হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্রীড়া বিজ্ঞান। ক্রীড়া বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের মধ্যে এক্সারসাইজ ফিজিওলজি অন্যতম কারণ মানব শরীরের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বাংলাদেশে ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর বি-স্পোর্টস কোর্সের সিলেবাসে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় এ বিষয়ে বই থাকলেও বাংলা ভাষায় রচিত কোনো বই নেই বললেই চলে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের এক্সারসাইজ ফিজিওলজি অধ্যয়নে প্রতি পদে পদে বাধার সন্মুখীন হতে হয়। সর্বোপরি মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা অত্যন্ত সহজ, প্রাণবন্ত ও বোধগম্য হয়। সময়ের প্রয়োজনে ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী ও কর্তৃপক্ষের তাগিদে বইটি প্রণয়নে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করি।

বি-স্পোর্টস কোর্সের সিলেবাস অনুযায়ী বইটি লেখা হলেও ক্রীড়াশিক্ষার অন্যান্য কোর্সের শিক্ষার্থীগণও এক্সারসাইজ ফিজিওলজি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে। বইটি আমার প্রথম প্রচেষ্টা ও প্রথম সংস্করণ হওয়ায় অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সেসব ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো। যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় বইটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি তাদের প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অবশেষে যেসব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বইটি লেখা তারা পড়ে সামান্যতম উপকৃত হলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক ও সুন্দর হবে।

মো. বখতিয়ার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়----------**৪৬**
ভূমিকা: এক্সারসাইজ ফিজিওলজির ইতিহাস
ক্রীড়াক্ষেত্রে এক্সারসাইজ ফিজিওলজির গুরুত্ব
দ্বিতীয় অধ্যায়----------**৪৮**
- কোষ
- কলা
- অঙ্গ
তৃতীয় অধ্যায়----------**৫৪**
মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্র
- কঙ্কালতন্ত্র
- পেশীতন্ত্র
- শ্বসনতন্ত্র
- হৃদসংবহনতন্ত্র
- স্নায়ুতন্ত্র
- অন্তঃক্ষরাতন্ত্র
- পরিপাকতন্ত্র
চতুর্থ অধ্যায়----------**৬২**
পেশী সংকোচন
পঞ্চম অধ্যায়----------**৬৬**
শ্বসনতন্ত্র

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ক্রীড়া একটি বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়, ক্রীড়া বিজ্ঞানের প্রথম ধাপই হলো মানব শরীরের গঠন ও শরীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা। এক্সারসাইজ বা ব্যায়ামের কারণে শরীরবৃত্তীয় কার্যাবলির যে পরিবর্তন হয় সে বিষয়গুলোকে এক্সারসাইজ ফিজিওলজি বলা হয়, এর ইতিহাস অনেক প্রাচীন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রিট্স (খৃস্টপূর্ব ৪৬০-৩৭০) প্রথম বর্ণনা করেন স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য এক্সারসাইজের প্রয়োজন। সুস্বাস্থ্যের সাথে নিয়মিত এক্সারসাইজের সম্পর্ক বিষয়ক হিপোক্রিটাস এর এ বক্তব্য প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৯-৩৪৭), এরিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব -৩৮৪-৩২২) ও অন্যান্যরা সমর্থন করেন, পরবর্তীতে গেলেন (১২৯-২০০ খ্রিস্টাব্দ) এই তথ্যকে চিকিৎসা তত্ত্ব হিসেবে সংযুক্ত করেন। গ্যালেনের ধারণা সর্বসাধারণের তুলনায় প্রশিক্ষিত ব্যক্তির স্বাস্থ্য মাংপেশীর টান ও শক্তি, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি, বিপাক ক্রিয়া ও বর্জ নিষ্কাশন ক্ষমতা উন্নত থাকে। পরবর্তিতে আবিসিনা (৯৮০-১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ) সহ অন্যান্যরা এ তথ্যকে সমর্থন করেন।

এক্সারসাইজ ফিজিওলজি ল্যাবরেটরির ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস থাকলেও বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হার্ভার্ড ফ্যটিগ ল্যাবরেটরি নামে একটি এক্সারসাইজ ফিজিওলজি ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অধিকাংশ কলেজে এক্সারসাইজ ফিজিওলজি শারীরিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্থান করে নেয় এবং নতুন শতাব্দীর শুরুতে এক্সারসাইজ ফিজিওলজি পাঠ্যসূচিতে আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে সংযুক্ত করা হয়।

ফিজিওলজি (Physiology)

যে বিদ্যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি মানবদেহের গঠন কিভাবে কাজ করে তাকে ফিজিওলজি বলে।

এক্সারসাইজ ফিজিওলজি (Exercise Physiology)

এক্সারসাইজ ফিজিওলজি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা এক্সারসাইজের কারণে মানবদেহের গঠন ও কার্যাবলির যে পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া হয় সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। এটি হৃদ ও শ্বাসযন্ত্রসহ শরীরের বিভিন্ন তন্ত্রের এক্সারসাইজজনিত প্রভাব সম্পর্কে বুঝতে এবং ফিজিক্যাল ফিটনেস এর উপাদানসমূহের (যেমন-শক্তি, গতি, দম নমনীয়তা ও সমন্বয়) উন্নয়নের শারীরিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া খেলোয়াড়দেরও দক্ষতা বৃদ্ধিতে পুষ্টির ভূমিকা, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন, অনুশীলনের সাথে অভিযোজন এবং পরিবেশজনিত প্রভাব সম্পর্কে শরীরবৃত্তীয় জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে।

এক্সারসাইজ ফিজিওলজির গুরুত্বঃ (Importance of Exercise Physiology)

এক্সারসাইজ ফিজিওলজি হলো ক্রীড়া বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর মাধ্যমে বোঝা যায় এক্সারসাইজের কারণে শারীরিক যে প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্তন হয় এবং এক্সারসাইজের সাথে শরীর কীভাবে মানিয়ে নেয়।

বর্তমান সময়ে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরিতে ও মূল্যায়নে এক্সারসাইজ ফিজিওলজি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরিতে সহায়তা করে। শারীরিক শিক্ষা, শারীরিক সুস্থতা ও খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি প্রদান এর মূল লক্ষ্য।

এক্সারসাইজ ফিজিওলজি মানবদেহের বিভিন্ন মাংসপেশীর গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

বায়োএনার্জেটিক সিস্টেম ও মাংসপেশীর নড়াচড়ায় স্নায়ুর প্রভাব সম্পর্কে জানতে এক্সারসাইজ ফিজিওলজির ভূমিকা অপরিসীম।

এটি হৃদ ও শ্বসনযন্ত্রের কার্যাবলির এবং এক্সারসাইজের কারণে এসব তন্ত্রের পরিবর্তন ও অভিযোজন সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করে।

এটি খেলোয়াড়দের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পুষ্টির ভূমিকা এবং ডুপিং ও অ্যালকোহল এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

ফিজিকেল ফিটনেসের উপাদানসমূহ (যেমন: শক্তি, গতি, দম, নমনীয়তা ও সমন্বয়) কিভাবে উন্নতি করা যায় এক্সারসাইজ ফিজিওলজি সে বিষয়ে জ্ঞান দান করে।

খেলাধুলার সময় পরিবেশজনিত প্রভাব (যেমন: গ্রীষ্ম, শীত, আর্দ্রতা ও উচ্চতা) এর প্রয়োজনীয় দিক গুলো নিয়ে বিস্তারিত তথ্যের মাধ্যমে এক্সারসাইজ ফিজিওলজি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।

শারীরিক প্রশিক্ষণের সাময়িক ও দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল জানতে এক্সারসাইজ ফিজিওলজি অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া খেলাধুলায় নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের কাজের ধরণ নির্দিষ্ট করতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কোষ, কোষের গঠন ও কার্যাবলি

কোষ (Cell)

দেহের গঠন ও কার্যাবলির ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে কোষ । মানব দেহ লক্ষ লক্ষ কোষের সমন্বয়ে গঠিত। দেহের কোষ বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন- শক্তি উৎপাদন, পেশীর সংকোচন, স্নায়ু অনুভূতি প্রেরণ, এনজাইম ও হরমোন নিঃসরণ ইত্যাদি।

কোষ তার কার্যাবলি অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। এর কোনো কোনোটা হয় বৃত্তাকার গোল, কোনো কোনোটা ডিম্বাকৃতি , আবার কোনো কোনোটা লম্বা ধরনের, কোনোটা রডের আকৃতির, তাছাড়াও কোষ আরও অনেক আকৃতির হয়ে থাকে।

কোষের গঠন (Structure of cell)

কোষ একটি অতিক্ষুদ্র সজীব বস্তু যার রয়েছে একটি কোষ আবরণ প্রাণকেন্দ্র এবং সাইটোপ্লাজম।

কোষ আবরণ: প্রতিটি কোষ একটি আবরণ বা ঝিল্লি দ্বারা বেষ্টিত। আবরণটি লিপিড এবং আমিষ সহযোগে গঠিত। এই আবরণ কোষ এবং এর পরিবেশের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এই আবরণের মধ্য দিয়ে খাদ্য (যেমন- অ্যামাইনো এসিড) এবং গ্যাস (যেমন- অক্সিজেন) কোষের ভিতর প্রবেশ করে। আবার অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নিঃসৃত বা বাহির হয় (যেমন- কার্বন-ডাইঅক্সাইড) এবং বিপাক ক্রিয়ায় উৎপাদিত পদার্থ এই পথেই নির্গত হয়। কোষ আবরণ কোষের আকৃতি ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং আন্তঃকোষীয় যোগাযোগ রক্ষা করে।

প্রাণকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস : প্রতিটি কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি আবরণী দিয়ে ঘেরা অংশকেই নিউক্লিয়াস বলা হয়। নিউক্লিয়াসের ভিতরে অবস্থিত বিশেষ অংশ ক্রোমোজমের মাধ্যমেই এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বিভিন্ন প্রকৃতি বা গুণাগুণ সঞ্চারিত হয়। কোষ বিভাজনে এটা অত্যাবশ্যকীয়। কোষের একটি মাত্র নিউক্লিয়াস থাকে।

সাইটোপ্লাজম: কোষ আবরণ ও নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী জেলীর মতো অংশের নাম সাইটোপ্লাজম। কোষের অবশিষ্ট নিম্নলিখিত সজীব বস্তুগুলো সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে:

* মাইটোকন্ড্রিয়া
* অ্যান্ডোপ্লাজমিক জালিকা
* কোষ গহ্বর
* সেন্ট্রিওল
* গলজি বস্তু
* লাইসোজোম
* ক্রোমাটিন জালিকা
* রাইবোজম।

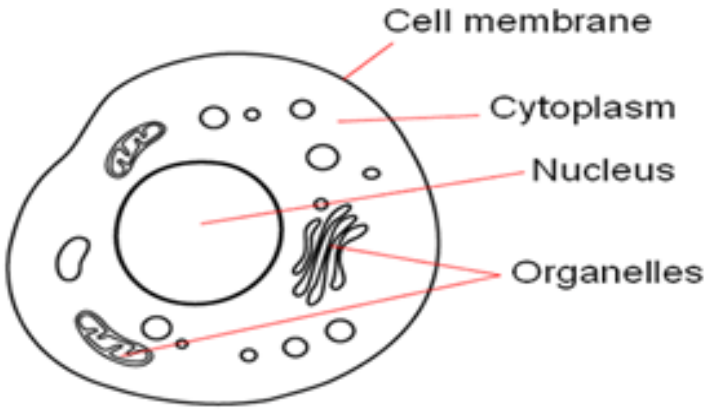

চিত্র

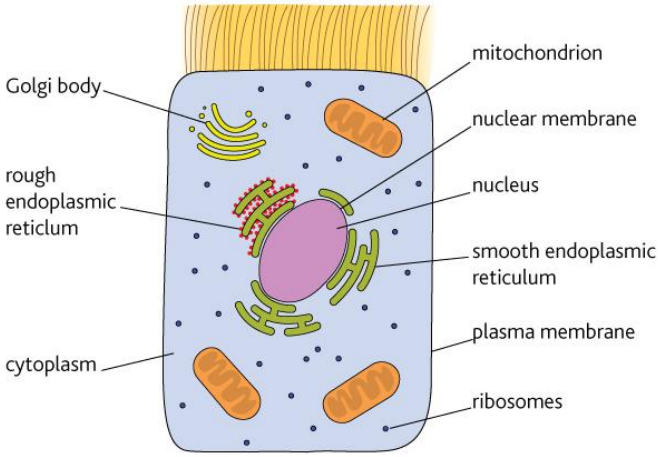

কোষের রাসায়নিক গঠন (**Camical composition of living cells**)

-পানি
-হাইড্রোজেন
-অক্সিজেন
-নাইট্রোজেন
-কার্বন
-সালফার
-ফসফরাস
-প্রোটিন
-লিপিড
-ক্যালসিয়াম
-পটাসিয়াম
-সোডিয়াম
-ম্যাগনেসিয়াম
-আয়রণ ইত্যাদি

কোষের কার্যাবলি: কোষের কয়েকটি বিশেষ কাজ রয়েছে। এগুলো হলো:

১) বিপাক
২) বৃদ্ধি
৩) সচেতনতা এবং অভিযোজনতা
৪) বংশ বৃদ্ধি

(১) বিপাক

কোষ রক্ত থেকে পুষ্টি ও অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং এদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। দেহের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও বিভিন্ন উপাদান উৎপাদন করা এবং কোষের জন্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নির্গত করার প্রক্রিয়াকে বিপাক বলা বলা হয়।

(২) বৃদ্ধি

বৃদ্ধি বলতে কোষের আকার আকৃতির বৃদ্ধিকে বুঝায়। কোষ প্রথমে অতি ক্ষুদ্র আকারে জন্মায়, পরে একটি জীবন চক্র অতিক্রম করে আকারে বৃদ্ধি পায় এবং একটি পরিপক্ক কোষে রূপান্তরিত হয়। কোষটি বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ তৈরি করে। আয়ুষ্কাল শেষে কোষটি অবশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং পরে মারা যায়।

(৩) সচেতনতা এবং অভিযোজনতা

কোষের সচেতনতা হচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুভব করে তার সাথে অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করার ক্ষমতা এবং অভিযোজনতা হচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য বহুবার বংশ বৃদ্ধি করে কোষের মধ্যে পরিবর্তন সাধন।

(৪) বংশ বৃদ্ধি

যে প্রক্রিয়ায় কোষ বিভক্তির পর একই ধরনের কোষ সৃষ্টি হয় তাকে বংশ বৃদ্ধি বলা হয়।

কলা, অঙ্গ এবং তন্ত্র

কলা (Tissue)

নির্দিষ্ট কোনো শরীর বৃত্তীয় কার্য সম্পাদনের জন্য একই ধরনের অনেকগুলো জীবকোষ নির্দিষ্ট স্থান হতে উৎপত্তি লাভ করে আকারে ও গঠনে সাদৃশ্য প্রদর্শন করে। একই ধরনের এই সকল কোষের সমষ্টিকে কলা বলে।

গঠন ও কাজের ভিত্তিতে কলার প্রকারভেদ:

ক) আবরণী কলা: যেমন- ত্বক, মিউকাস মেমব্রেন।
খ) যোজক কলা: যেমন- রক্ত, অস্থি ।
গ) পেশী কলা: যেমন- ডেলটয়েড, গ্লুটিয়াস পেশী ।
ঘ) স্নায়ু কলা: যেমন- মাথার মগজ, স্পাইনাল কর্ড।

১) আবরণী কলা (Epithelial tissue)

এই কলা দেহের উপরে বা ভেতরে আবরণ তৈরি করে। দেহের চর্ম, শিরা, ধমনী, ফুসফুস, যকৃত, শ্বাস-নালী, পাকস্থলী প্রভৃতির ভেতরের অংশ এই কলা দ্বারা গঠিত।

আবরণী কলার কার্যাবলি

আবরণ বা Covering: আবরণী কলা দেহ ও নানা অংশের উপরের আবরণ তৈরি করে ও তার ফলে ভেতরের বস্তুদের এটি রক্ষা করে।

নিঃসরণ বা Secretion: গ্রন্থিগুলো সাধারণত কলামনার এপিথেলিয়াম দিয়ে তৈরি। গ্রন্থিকোষ হতে সৃষ্টি রস দ্বারা এদের দেহ সর্বদা ভেজা থাকে।

শোষণ বা Absorbtion: কতগুলো এপিথেলিয়াম শোষণ করতে পারে। যেমন বৃহৎ অন্ত্রের ভেতরের স্তরের এপিথেলিয়াম শোষণ করে। শোষিত রস পরে রক্তের সাথে বা লিম্ফে মিশে যায়।

সহ-সংযোগ বা Co-relation: এদের একটি বিশেষ চরিত্র হলো এরা পরস্পরের সাথে পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট থাকে এবং এদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও নিবিড় পারস্পরিক সংযোগ থাকে।

নড়াচড়া বা Movement: সিলিয়েটেড এপিথেলিয়ামগুলোর Cilia গুলো নড়াচড়া করে। তার ফলে ধোঁয়া, ধুলা, বালি প্রভৃতিকে আটকানোর কাজে সহায়তা করে।

২) যোজক কলা (Connective tissue)

দেহের অঙ্গের সাথে কিংবা একই অঙ্গের বিভিন্ন অংশের সাথে এই কলা সংযোগ স্থাপন করে। সংযোজন কলা চর্মকে পেশীর সাথে, পেশীকে হাড়ের সাথে এবং হাড়কে অপর হাড়ের সাথে আবদ্ধ রাখে।

যোজক কলার কার্যাবলি

১। যে গঠনগুলো একটি যন্ত্রের সম্পূর্ণতা বা অখণ্ডতা নিশ্চিত করে তাদেরকে যোজক কলা এরিওলার কলার সাহায্যে একত্রে বন্ধন করে রাখে।

২। এই কলা অস্থি ও তরুনাস্থির দ্বারা দেহের গঠনগুলোকে অবলম্বন এবং দৃঢ়তা প্রদান করে।

৩। এই জাতীয় কলা দেহের বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রগুলোকে আবরণ, আস্তরণ এবং ক্যাপসুলের দ্বারা আবৃত করে রাখে।

৪। এই কলা দেহ যন্ত্রের অঞ্চলকে বিভিন্ন বেধ বিশিষ্ট এবং প্রতিরোধ শক্তিসম্পন্ন আস্তরন, ঝিল্লি বা ব্যবধায়ক কিংবা বিভাজন পর্দার দ্বারা পুনরায় বিভক্ত করে।

৫। এই জাতীয় কলা অসদৃশ কলাকে সংযুক্ত বা একত্রে বন্ধন করতে সক্ষম হয়।

৬। দেহের গঠনগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে ও এর চারপাশে বহু ক্ষুদ্র গর্ত বা ফাটলের ন্যায় অংশ দেখা যায়। এই অংশগুলো সংযোগ কলার দ্বারা পূর্ণ বা ভরাট হয়ে থাকে।

৭। এই জাতীয় কলা যে যে স্থানে প্রসারণ সাধ্য ক্ষমতার আবশ্যক হয় স্থানে কলা নির্মাণের এককগুলো প্রদান করে।

৮। এই কলা পরিস্ফুরণের সময় এর কোষগুলোকে রূপান্তরিত করে এবং চর্বি তরুনাস্থি ও অস্থি গঠনে সহায়তা করে।

৩) পেশী কলা (Muscular tissue)

পেশী কলা এক বিশেষ ধরনের কলা যার সংকোচন ও প্রসারণের ক্ষমতা আছে। অনেকগুলো সরু সরু কোষ একত্রিত হয়ে পেশী কলা তৈরি করে।

পেশী কলার কার্যাবলি

১। ঐচ্ছিক পেশী মানবদেহে ইচ্ছেমতো সংকুচিত প্রসারিত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে অংশগ্রহণ করে।

২। দেহের আকৃতি প্রদান ও উত্তেজনায় উদ্দীপিত হয়ে প্রতিবর্তন ক্রিয়ায় সাহায্য করে।
৩। অনৈচ্ছিক পেশী স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে স্বয়ং চলনে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে।
৪। হৃদপিণ্ডকে নির্দিষ্ট ছন্দে সংকোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে রক্ত প্রবাহের মধ্যে রক্তস্রোতের সৃষ্টি করে।

৪) স্নায়ুকলা (Nervous tissue)

মস্তিষ্ক, স্নায়ুরজ্জু ও সারা দেহের স্নায়ু দ্বারা স্নায়ুকলা গঠিত। এক ধরনের স্নায়ুকলা মস্তিষ্ক হতে সারা দেহে বার্তা পৌঁছে দেয়, আবার আরেক ধরনের স্নায়ুকলা মস্তিষ্কে বার্তা পৌঁছে দেয় । তাছাড়া অনৈচ্ছিক স্নায়ু আপনা থেকে প্রকৃতিগতভাবে কাজ করে। স্নায়ুকলা নিউরন নামক এক ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেকটি স্নায়ুকোষে তিনটি অংশ আছে। যেমন : কোষদেহ, অ্যাক্সণ ও ডেনড্রাইটস।

স্নায়ুকলার কার্যাবলি:
১। উদ্দীপনায় সাড়া দেয়
২। মানবদেহের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক উদ্দীপনা গ্রহণ ও প্রেরণ করে।
৩। পরিবেশের সহিত সংযোগ রক্ষা করে।
৪। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যন্ত্রের সমন্বয় সাধন করে।

পেশী

পেশী এক ধরনের কলা যা পেশী কোষ বা আঁশ দ্বারা গঠিত। পেশীর আঁশ গোছা আকারে সাজানো থাকে এবং যোজক কলা দ্বারা একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই পেশী কোনো অঙ্গ বা শরীরের কোনো অংশ চালনা করতে পারে।

পেশীর প্রকারভেদ: গঠনগতভাবে পেশী তিন ধরনের হতে পারে:

মসৃণ পেশী (Smooth muscle)

মসৃণ পেশী শরীরের অনেক অঙ্গের দেয়াল তৈরি করে। যেমন- পাকস্থলী এবং অন্ত্রনালী। মসৃণ পেশীকে অনৈচ্ছিক পেশী বলা হয়। কারণ এই সব মাংসপেশী ইচ্ছানুযায়ী চালনা করা যায় না। তারা আপনা আপনি কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাকস্থলী খাদ্যে পরিপূর্ণ হলে মসৃণ মাংসপেশীগুলো নড়াচড়া শুরু করে, খাদ্যকে পাচক রসের সঙ্গে মিশতে সহায়তা করে এবং খাদ্যকে নিচের দিকে চালনা করে। এই প্রক্রিয়াকে পেরিস্টালটিক চলন বলে। প্রসবের সময় হলে জরায়ুর পেশীও সক্রিয়ভাবে কাজ করে।

হৃৎপিণ্ডের পেশী (Cardiac muscle)

হৃদপিণ্ডের পেশী একমাত্র হৃৎপিণ্ডেই পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের পেশীসমূহও অনৈচ্ছিক পেশী যেহেতু এগুলো তাদের নিজস্ব নিয়মে চলে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী চালনা করা যায় না। হৃৎপিণ্ডের এই মাংসপেশীগুলো নিজেরা উদ্দীপনা তৈরি করতে সক্ষম। শরীরের অন্য ধরনের মাংশপেশী নিজেরা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে না।

অস্থির পেশী (Skeletal muscle)

অস্থির পেশী, পেশী কলার গোছার সমন্বয়ে গঠিত। এই পেশীর উভয় প্রান্তে গোছাগুলো মিলিত হয়ে শক্ত দড়ির মতো তৈরি করে তাকে পেশীবন্ধনী বলা হয়। অস্থির পেশী পেশী বন্ধনী দ্বারা অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। প্রতিটি পেশীর গোছার মধ্যে স্নায়ু থাকে এবং স্নায়ুর মাধ্যমে দেয়া বার্তা অনুযায়ী মাংসপেশী চালিত হয়।

অস্থি এবং সন্ধি নিজে নিজে সচল হয় না। এগুলো অস্থির পেশীর উপর নির্ভর করে। অস্থির পেশীকে ঐচ্ছিক পেশী বলা হয়। কারণ প্রাণী এগুলোর কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অস্থির পেশী হাত, পা, মেরুদণ্ড এবং মাথার নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

চিত্র: অস্থির পেশী

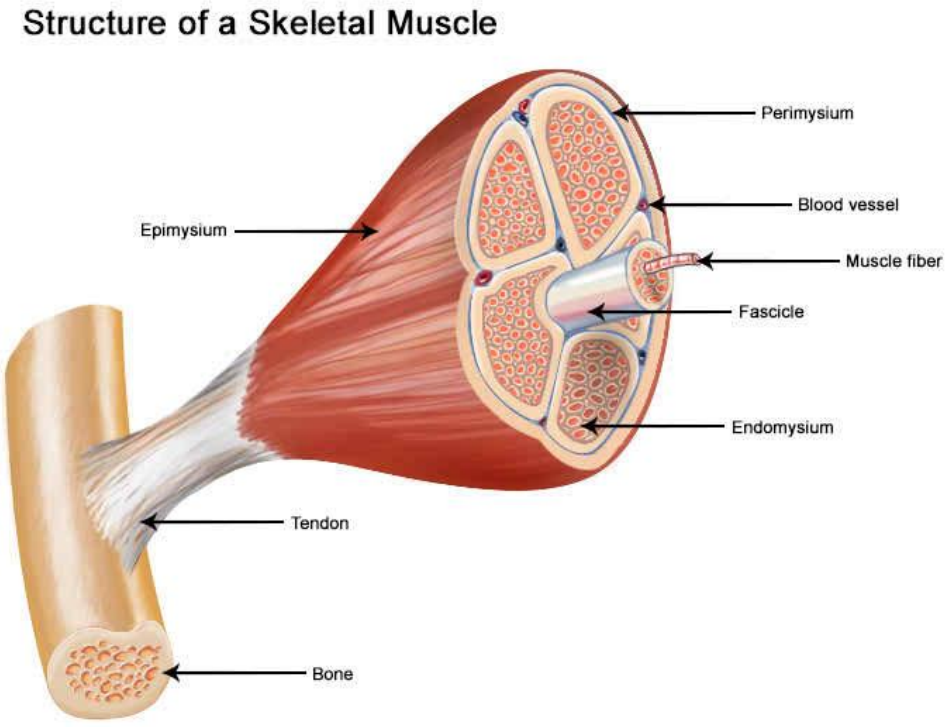

অঙ্গ:

অনেকগুলো কলা একত্রিত হয়ে একটি অঙ্গ তৈরি হয়। এগুলো কলা থেকে অধিকতর জটিল কাজ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ পাকস্থলী পরিপাকতন্ত্রের একটি অংগ। পাকস্থলী পরিপাকে জন্য বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

তন্ত্র (System)

কতগুলো বিশেষ অঙ্গের সমষ্টিকে তন্ত্র বলা হয়। এই সব অঙ্গগুলো সম্মিলিতভাবে একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন করে। যেমন- পরিপাকতন্ত্র। এটি খাদ্যনালী, পাকস্থলী (Stomach) ও আন্ত্রিক নালী (Intestine) ছাড়াও যকৃত (Liver) ও অগ্নাশয় (Pancreas) নামক সহযোগী অংগ নিয়ে গঠিত। মানবদেহ নিম্নলিখিত তন্ত্র নিয়ে গঠিত:

১) **ত্বক তন্ত্র** (Integumentary system)
এই তন্ত্র প্রধানত ত্বক দিয়ে গঠিত যা সম্পূর্ণ দেহকে ঢেকে রাখে এবং আঘাত ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

২) **কঙ্কাল ও পেশীতন্ত্র** (Skeletal and Muscular system)

কঙ্কাল ও পেশীতন্ত্র শরীরকে নির্দিষ্ট আকার প্রদান করে এবং ভার বহন করে। এই তন্ত্র মানুষকে চলাফেরা করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন আকৃতির অস্থি বা হাড় দ্বারা গঠিত শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে নিরাপত্তা বিধান করে, যেমন মাথার খুলি মস্তিষ্ককে রক্ষা করে, বুকের খাঁচা হৃৎপিণ্ডকে রক্ষা করে।

৩) **শ্বাসতন্ত্র** (Respiratory system)
শ্বাসতন্ত্র দেহে অক্সিজেন বয়ে নিয়ে আসে এবং দেহ থেকে কার্বনডাই-অক্সাইড নির্গত করে।

৪) **রক্ত সঞ্চালনতন্ত্র** (Blood circulatory system)
রক্ত সঞ্চালনতন্ত্র শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত পাঠায় এবং সেখান থেকে ফেরত আনে।

৫) **পরিপাকতন্ত্র** (Digestive system)

দেহের অভ্যন্তরে খাদ্য নিয়ে আসে পরিপাক তন্ত্র। এই খাদ্যকে ভেঙ্গে আরো ছোটো ছোটো কণায় পরিণত করে। অতঃপর এই তন্ত্র খাদ্যকে শরীরের মধ্যে শুষে নেয় এবং রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে প্রেরণ করে।

৬) **মূত্রতন্ত্র** (Urinary system)
মূত্রতন্ত্র শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে বের করে দেয়। এই তন্ত্র শরীরের পানি এবং খনিজ পদার্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৭) **প্রজননতন্ত্র** (Reproductive system)

প্রজননতন্ত্রের মাধ্যমে জীব তার বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

৮) **স্নায়ুতন্ত্র** (Nervous system)

স্নায়ুতন্ত্র শরীরের ভেতরে এবং বাহির থেকে বার্তা পায়। এই তন্ত্র বার্তাকে বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত করে এবং বার্তা অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৯) **অন্তঃক্ষরাতন্ত্র** (Endocrine system)

এই তন্ত্র শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত কতগুলো নালীহীন গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। এই গ্রন্থিগুলো কিছু হরমোন তৈরি করে যা শরীরের বিভিন্ন কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

১০) **লসিকাতন্ত্র** (Lymphatic system)
এই তন্ত্র কোষ থেকে লসিকা পরিবহনের জন্য নিয়োজিত এবং লসিকানালীর জালক ও ছোটো বড়ো অনেক লসিকাগ্রন্থি দ্বারা গঠিত রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় এটি একটি প্রধানতন্ত্র।

রক্ত সংবহনতন্ত্রের গঠন

রক্ত সংবহনতন্ত্রের গঠন (Blood Circulatory System)

রক্ত সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে কলার (Tissue) দিকে যায় এবং কলা থেকে আবার হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে। রক্ত সংবহন তন্ত্রের মধ্যে রয়েছে-

(১) হৃৎপিণ্ড
(২) ধমনী
(৩) শিরা এবং
(৪) কৈশিক নালী

হৃৎপিণ্ড (Heart) হৃৎপিণ্ড পেশী দিয়ে তৈরি একটি পাম্প যন্ত্র। হৃৎপিণ্ডের পেশী রক্তকে পাম্প করে শরীরের মধ্যে চালনা করে। হৃৎপিণ্ড বুকের মধ্যে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত এবং উরুফলকের (Sternum) পেছনে কিন্তু কিছুটা বাম দিকে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের নীচের অংশ বুকের বাম পার্শ্বে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম পাজরাস্থি (Ribs) পর্যন্ত বিস্তৃত। হৃৎপিণ্ডের শীর্ষকোণ (Apex) পঞ্চম ও ষষ্ঠ পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানে ও স্তনবৃন্তের সামান্য নিচে অবস্থিত।

সমগ্র হৃৎপিণ্ডটি একটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত্ত। হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশী দ্বারা গঠিত। হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের দুটি পাতলা প্রাচীর যুক্ত ডান এবং বাম অলিন্দ (Atria) এবং নীচের দুটি পুরু প্রাচীরযুক্ত ডান এবং বাম নিলয় (Ventricle)। দুটি অলিন্দ এবং দুটি নিলয় যথাক্রমে ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল এবং ইন্টারভেট্রিকলার সেপ্টাম নামক দেয়াল দ্বারা পরস্পর হতে পৃথক থাকে। অলিন্দ থেকে নিলয়ের প্রবেশদ্বারে কপাটিকাযুক্ত (Valve) থাকে। ডানের তিনটি কপাটিকা (ট্রাইকাসপিড) এবং বামের দুইটি কপাটিকা (বাইকাসপিড) থাকে। ডান নিলয় হতে উদ্ভূত পালমোনারী ধমনীর ছিদ্রপথে এবং বাম নিলয় হতে উদ্ভূত মহাধমনীর মুখের কপাটিকা দুটি অর্ধচন্দ্রকার (Semilunar) । এই কপাটিকা বা ভাল্ব রক্তকে শুধুমাত্র একদিকে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে এবং পেছন দিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর তিনটি পৃথক স্তরে গঠিত। যথা- বাহিরের পেরিকার্ডিয়াম

(Pericardium) মাঝখানে মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium) ভিতরে এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium)।

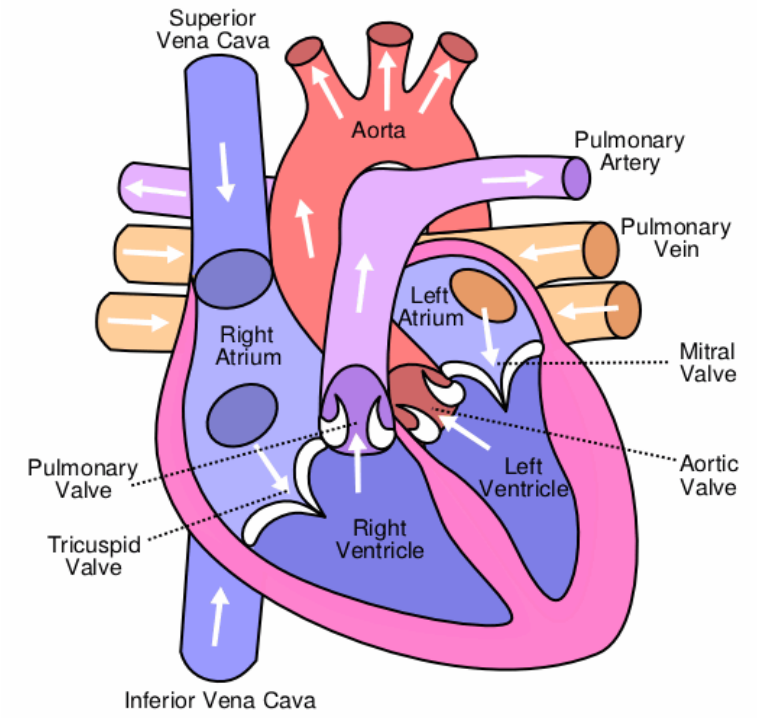

রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে রক্ত চলাচল করে। রক্তনালী তিন ধরনের। এগুলো হচ্ছে- ধমনী (Artery), শিরা (Vein) এবং কৈশিকনালী (Capillary) ।

ধমনী (Artery) ধমনী হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়। ধমনীর ভেতরের চাপ বেশি। ধমনীর দেয়ালগুলো পুরু এবং মাংসল যাতে উচ্চচাপ প্রতিরোধ করতে পারে। একটি ধমনী কেটে গেলে প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের সাথে সবেগে বা ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়। ধমনীর রক্তে অক্সিজেন অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। ধমনী বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে।

শিরা (Vein) শিরা শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। শিরাগুলি পাতলা দেয়াল বিশিষ্ট রক্তনালী। শিরার ভিতরে চাপ খুব কম। তাই শিরা কেটে গেলে আস্তে আস্তে রক্ত বের হয়। শিরার রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইড অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। শিরা দূষিত রক্ত বহন করে।

কৈশিকনালী (Capillary) কৈশিকনালী হচ্ছে খুব সরু রক্তনালী যেগুলো ধমনী ও শিরাকে সংযুক্ত করে। এগুলো খুব পাতলা দেয়ালবিশিষ্ট এবং ভিতরের চাপ খুব কম। কৈশিকনালীর দেয়ালগুলি রক্ত এবং শরীরের অন্যান্য অংশের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসাবে থাকে। লোহিত কণিকা (Red Blood Cell), রক্তের আমিষ (Plasma Protein), রক্তরস। (Serum) ইত্যাদি কৈশিকানালীতে অবস্থান করে। পনি, অক্সিজেন, কার্বনডাই-অক্সাইড এবং পুষ্টিকর পদার্থ এই দেয়ালের মধ্যে দিয়ে সহজেই যাতায়াত করতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের এই আমিষ পানিকে কৈশিকনালীর মধ্যে ধরে রাখে। যখন এই

কৈশিকনালী আঘাতপ্রাপ্ত হয় অথবা আমিষ কমে যায় তখন পানি কৈশিকনালী থেকে নির্গত হয়ে বাহিরে কলা বা টিস্যুতে চলে আসে। এভাবে কলাতে পানি জমে ওঠার ফলে শোথের (Oedema) সৃষ্টি হয়।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং মগজের স্বাভাবিক কার্যকারিতা থাকতে হবে। এ তিনটি অঙ্গের যে কোনো একটির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই (৪-১০ মিনিট) মানুষ মারা যাবে। সেজন্য এ তিনটি অঙ্গ (Organ) কে ভাইটাল অর্গান (Vital organ) বলা হয়। হৃৎপিণ্ড কাজ করে রক্ত সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে, ফুসফুস শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে এবং মগজ স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে।

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তের সংবহন: কৈশিকনালীর (Capillary) রক্ত কোষ এবং কলা (Tissue) থেকে অপ্রয়োজনীয় কার্বনডাই-অক্সাইড বয়ে নিয়ে আসে এবং শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে রক্ত ফেরত আসে। কার্বনডাই-অক্সাইড পরিপূর্ণ রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপরের ডান প্রকোষ্টে অর্থাৎ ডান অলিন্দে (Right Atrium) প্রবেশ করে। ডান অলিন্দ সংকোচিত হলে রক্ত নীচের ডান প্রকোষ্টে অর্থাৎ ডান নিলয়ে (Right Ventricle) প্রবেশ করে। ডান নিলয়ের সংকোচনের ফলে রক্ত পালমোনারী ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসের কৈশিকনালীগুলোতে প্রবেশ করে। রক্ত ফুসফুসে কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে।

ফুসফুসীয় শিরা (Pulmonary Vein) ফুসফুস থেকে অক্সিজেন পূর্ণ রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপরের বাম প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ বাম অলিন্দে (Left Atrium) নিয়ে আসে। বাম অলিন্দ সংকোচিত হয় এবং রক্ত বাম নিলয়ে (Left Ventricle) ধাবিত হয়। বাম নিলয় সংকোচিত হলে সেখান থেকে মহাধমনীর দিকে ধাবিত হয়। এই ধমনীর শাখা প্রশাখার মাধ্যমে রক্ত শরীরের সমস্ত কলার কৈশিক নালীতে পৌঁছে। এই রক্ত কলাগুলিতে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং সেখান থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড ফেরত নিয়ে আসে।

যে শরীরের সমস্ত কলা থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান পার্শ্বে ফেরত যায় এবং এই রক্তের সবটাই ফুসফুসে পাঠানো হয়। সেখানে সে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। তারপর হৃৎপিণ্ডের বাম অংশ থেকে পাম্প হয়ে শরীরের কলাগুলোতে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের পাশ থেকে ফুসফুস হয়ে বাম পাশে রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে ফুসফুসীয় সংবহন (Pulmonary Circulation) বলা হয়। হৃৎপিণ্ডের বাম পাশ থেকে শরীরের বিভিন্ন কলা হয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান পাশে রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে তন্ত্রীয় সংবহন (Systemic Circulaltion) বলা হয়।

হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে শরীরের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ছক আকারে বর্ণনা

হৃদপিণ্ড শরীরের বক্ষদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি পাম্প এই যন্ত্রটির সাহায্য শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত হৃদপিণ্ডের মধ্যে এসে পৌঁছায় এবং ধমনীর মধ্যে দিয়ে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। রক্ত হৃদপিণ্ড হতে বের হয়ে মানবদেহের সকল অংশে বিস্তৃত হয় এবং পুনরায় হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে। হৃদপিণ্ডের এই রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া নিম্নে ছক আকারে বর্ণনা করা হলো:

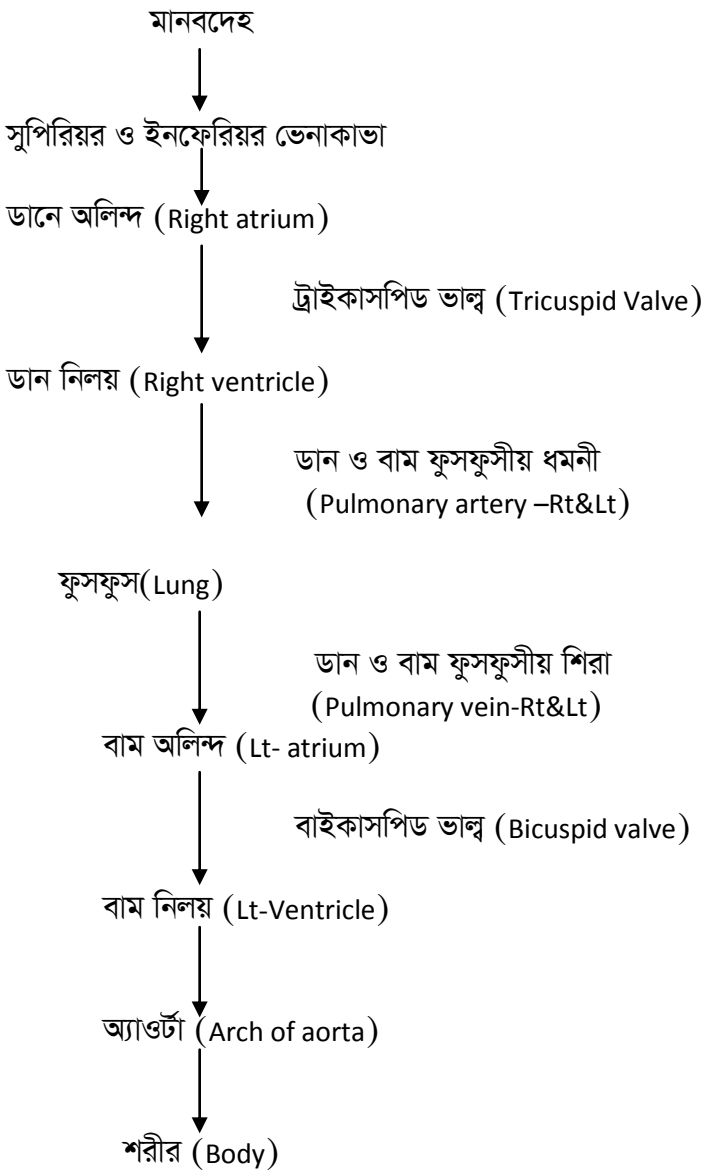

নাড়ি (Pulse) তন্ত্রীয় সংবহনের রক্ত যখন হৃৎপিণ্ড ত্যাগ করে তখন খুব চাপের সৃষ্টি করে। হৃৎপিণ্ড প্রতিবার সংকোচনের ফলে চাপের ঢেউ সব ধমনীতে (Artery) ছড়িয়ে পড়ে। ধমনীর মধ্যে চাপের এই ঢেউকে নাড়ি (Pulse) বলা হয়। নাড়ি নির্ভর করে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের হারের উপর এবং হৃৎপিণ্ডের প্রতি সংকোচনের সময় যে পরিমাণ রক্ত পাম্প করে তার পরিমাণের উপর। নিলয় যখন শিথিল (Relax) হয় তখন নাড়ির বিরতি ঘটে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে নাড়ি অনুভব করা যায়। যেমন- কব্জির সামনে (Radial pulse), কনুই-এর সামনে (Brachial pulse), ঘাড়ের সামনে (Carotid pulse) এবং কুচকির পাশে (Femoral pulse)। প্রাপ্ত বয়স্ক একজন মানুষের স্বাভাবিক নাড়ির গতি প্রতি মিনিটে ৬০-৯০ বার।

রক্তচাপ (Blood Pressure)

যেহেতু হৃৎপিণ্ড সংকোচিত হয়ে ধমনীতে রক্ত প্রেরণ করে। সে কারণে রক্ত চাপের মধ্যে থাকে। যখন হৃৎপিণ্ড শিথিল হয়, ধমনীর রক্ত তখন কম চাপের মধ্যে থাকে। সেজন্য প্রত্যেক বার হৃৎস্পন্দনের সময় ধমনীর রক্ত একটি চক্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে।

রক্ত ধমনী পথে প্রবাহের সময় ধমনীর দেয়ালে যে পরিমাণ পার্শ্বচাপ লম্বভাবে প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ (Blood Pressure) বলে। পারদ দেয়া একটি বিশেষ যন্ত্র দিয়ে রক্ত চাপ মাপা হয়ে থাকে। তাই রক্ত চাপ মাপার পর millimeter of mercury বা mm Hg লেখা হয়। পারদ বা mercury এর রাসায়নিক চিহ্ন Hg.

সিস্টোলিক রক্তচাপ (Systolic Blood Pressure) বাম নিলয়ের সংকোচনের (Contraction) ফলে সৃষ্টি হয়। ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ (Diastolic Blood Pressure) বাম নিলয়ের শিথিলতার (Relaxation) ফলে হয়ে থাকে। সিস্টোলিক রক্তচাপ ১০০-১৪০ মি.মি. মার্কারি এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৬০-৯০ মি.মি. মার্কারির মধ্যে থাকলে একে স্বাভাবিক রক্তচাপ বলে।

উচ্চ রক্তচাপের অর্থ হচ্ছে গড় স্বাভাবিক রক্তচাপের তুলনায় সব সময় সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বেশি থাকা। নিম্ন রক্তচাপের অর্থ হচ্ছে স্বাভাবিকের তুলনায় সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ কম থাকা। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রকে স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) বলে।

খুব উচ্চ রক্তচাপ এবং খুব নিম্ন উভয়ই অসুখের লক্ষণ। বিভিন্ন কারণে রক্তচাপ প্রভাবিত হয়। যদি রক্তনালী ফুলে যায় বা প্রসারিত হয় যেমন- অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় অথবা রক্তের তরল পদার্থ বা রক্তক্ষরণের ফলে রক্তের পরিমাণ কমে যায়, তখন সাধারণত রক্তচাপ কমে যায়। রক্তনালী কোনো কারণে সরু অথবা সংকোচিত হয়ে গেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। এই অবস্থাকে উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension) বলা হয়।

অ্যাথলেট হার্ট (Athlete heart)

অ্যাথলেট হার্ট বলতে ক্রীড়াবিদদের হৃদপিণ্ডকে বুঝায়। খেলোয়াড়দের বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রম বিশেষ করে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ কার্যক্রম এর ফলে হৃদপিন্ডের উপর বেশি চাপ পড়ে। নিয়মিতভাবে এই চাপের ফলে হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীর পুরুত্ব বেড়ে যায়। অর্থাৎ Muscle Hypertrophy হয়। এ ধরনের হার্ট অধিকতর শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হয়। সাধারণত যেসব অ্যাথলেট প্রতিদিন ১ঘণ্টার বেশি সময় ধরে নিয়মিত ব্যায়াম করে তাদের ক্ষেত্রে এ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে খেলোয়াড়দের হৃদপিণ্ডে যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ:

- হৃদপিণ্ডের অক্ষরেখা একটু বামে সরে যায়
- হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীর পূরত্ব বেড়ে যায়
- স্ট্রোক ভলিওম বেড়ে যায়
- কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যায়
- হৃদপিণ্ডের গতি (Heart rate) কমে যায়
- ক্যালসিয়াম নিঃসরণ বেড়ে যায়
- ইসিজিতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

রক্ত (Blood): রক্ত এক প্রকার লাল বর্ণের অস্বচ্ছ, আন্তঃকোষীয় তরল যোজক কলা। এটি রক্ত সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। এটি ঈষৎ ক্ষারীয় । রক্তের তাপমাত্রা ৩৬° সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৮° সেন্টিগ্রেড। অজৈব লবণের জন্য রক্ত লবণাক্ত। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১.০৬৫। একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষের শরীরে ৫ থেকে ৬ লিটার রক্ত থাকে। রক্ত প্রতিটি কোষে অক্সিজেন এবং খাদ্য নিয়ে যায় এবং কোষ থেকে কার্বনডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ ফেরত নিয়ে আসে।

রক্ত নিম্নলিখিত উপাদান দিয়ে গঠিত হয়েছে:

ক) লোহিত কণিকা (Red Blood Cell)
খ) শ্বেত কণিকা (White Blood Cell)
গ) অণুচক্রিকা (Platelet)
ঘ) রক্তরস (Plasma)

লোহিত কণিকা (Red Blood Cell)

লোহিত কণিকা গোলাকার দ্বি-অবতল নিউক্লিয়াসবিহীন চাকতির মতো লাল বর্ণের কোষ। এগুলো ক্ষুদ্রতম রক্তনালীর মধ্য দিয়ে সহজেই অতিক্রম করতে পারে। শরীরে লোহিত কণিকা অবিরাম তৈরী হচ্ছে। একটি লোহিত কণিকা গড়ে প্রায় চার মাস বাঁচে। আয়ু ফুরিয়ে গেলে কণিকা ধ্বংস হয়ে যায়। জন্মের পর থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত মানব দেহের লম্বা অস্থির অস্থিমজ্জা (Bone Marrow) থেকে লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয়। পরবর্তী সময় স্টার্নাম, ভার্টিব্রা, রিবস্ ইত্যাদি অস্থির অস্থিমজ্জা থেকে এ কণিকা উৎপন্ন হয়।

হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin)

হিমোগ্লোবিন একজাতীয় প্রোটিন যৌগ। এটি লোহিত কণিকার ৯৫% গঠন করে এবং কোষকে লাল বর্ণ প্রদান করে। এর ২টি অংশ আছে। যথা- হিম এবং গ্লোবিন। হিম এর ভেতর লোহা বা আয়রন থাকে। আর গ্লোবিন হলো এক প্রকার প্রোটিন। হিমোগ্লোবিন রক্তের অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজ হলো ফুসফুস হতে কলায় বহন করা এবং কলা হতে CO_2 কার্বন ডাইঅক্সাইড বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যাওয়া। রক্তে লোহিত কণিকা অথবা হিমোগ্লোবিন কমে গেলে যে রোগের সৃষ্টি তাকে রক্তস্বল্পতা (Anaemia) বলে। ঘন ঘন বাচ্চা প্রসব করলে মায়েদের রক্তস্বল্পতা বা অ্যানেমিয়া দেখা দেয়। পূর্ণ বয়স্ক একজন পুরুষের দেহে প্রতি ঘন মি.লি. রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ এবং একজন মহিলোার দেহে প্রায় ৪৫ লক্ষ।

লোহিত কণিকার কাজ

১। এটির অভ্যন্তস্থ হিমোগ্লোবিন দেহের সর্বত্র অক্সিজেন বহন করে।
২। নিষ্কাশনের (Excretion) জন্য কার্বনডাই-অক্সাইড কলা হতে ফুসফুসে বহন করে।
৩। ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে পিত্তের (Bile) প্রধান রঞ্জক বিলিরুবিন (Bilirubin) উৎপন্ন করে।
৪। আয়নিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

শ্বেতকণিকা (White Blood Cell)

শ্বেতকণিকা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনবিহীন নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ। রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং পরজীবী (Parasite) ইত্যাদির বিরুদ্ধে শ্বেতকণিকা শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। কিছু কিছু শ্বেতকণিকা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে চর্তুদিকে ঘিরে ভক্ষণ করে রোগ প্রতিরোধ করে। অন্যান্য শ্বেতকণিকা অ্যান্টিবডি (Antibody) নামক এক প্রকার পদার্থ তৈরি করে যা জীবাণুকে ধ্বংস করে। শ্বেতকণিকার কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই। প্রয়োজনে এরা আকার পরিবর্তনে সক্ষম। মানব দেহে প্রতি ঘন মি.লি. রক্তে সাধারণত ৪-১১ হাজার শ্বেতকণিকা থাকে। দানাদার শ্বেতকণিকা লাল অস্থিমজ্জা এবং অন্যান্য শ্বেতকণিকা প্লীহা (Spleen), লসিকা গ্রন্থি (Lymph Node) এবং আংশিকভাবে অস্থিমজ্জা (Bone Marrow) থেকে উৎপন্ন হয়। শ্বেতকণিকার গড় আয়ু ২০ দিন।

আকৃতি ও গঠনগতভাবে শ্বেতকণিকাকে প্রধান দুভাগে ভাগ করা যায়:

১। দানাদার শ্বেতকণিকা:

ক) নিউট্রোফিল (Neutrophil)
খ) ইওসিনোফিল (Eosinophil) ও
গ) বেসোফিল (Basophil)
২। দানাহীন শ্বেতকণিকা:
ক) লিম্পোসাইট (Lymphocyte)
খ) মনোসাইট (Monocyte)

(ক) অনুচক্রিকা (Platelet)

অনুচক্রিকা ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা। এগুলো ডিম্বাকার, দানাদার কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন। মানব দেহে প্রতি ঘন মি.লি. রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা প্রায় দেড় থেকে পাঁচ লক্ষ। অনুচক্রিকার গড় আয়ু ৫-১০ দিন। অনুচক্রিকা রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। রক্তনালী কেটে গেলে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

(খ) রক্তরস (Plasma)

রক্তরস (Plasma) হচ্ছে রক্তের তরল অংশ। পানি, খাদ্য উপাদান এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নিয়ে এই রস গঠিত। সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এই রস সাহায্য করে এবং রক্তকে জমাট বাঁধায়। এই রসের আমিষগুলো পানিকে রক্তনালী থেকে বের হতে দেয় না। আমিষের পরিমাণ কমে গেলে পানি রক্তনালী থেকে বের হয়ে দেহের কলায় প্রবেশ করে। ফলে কলাগুলো ফুলে যায়। এই ফুলে যাওয়াকেই শোথ (Oedema) বলা হয়।

রক্তরসের উপাদানসমূহ

১। জৈব পদার্থ- প্লাজমা প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, কার্বহাইড্রেট, ইউরিয়া, হরমোন ইত্যাদি।
২। অজৈব পদার্থ- সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রণ, ক্যালসিয়াম ও সালফেট ইত্যাদি।

রক্তরসের কাজ

(১) পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন কলা বা অঙ্গে ধাবিত হয়।
(২) কলা হতে বর্জ্যদ্রব্য বাহির হয়ে নিঃসরণের জন্য রক্তরসের মাধ্যমে কিডনিতে ধাবিত হয়।
(৩) হরমোনসমূহকে বিভিন্ন অঙ্গে নিয়ে যায়।
(৪) রক্তের অম্লক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

চতুর্থ অধ্যায়: পেশীর সংকোচন

পেশীর কাজ হচ্ছে শরীরের কোনো অঙ্গ বা অংশ চালনা করা। কোনো অঙ্গ তখনই সচল হয় যখন পেশী সমূহ সংকুচিত হয়ে ছোটো হয়। এই ছোটো হওয়াকে সংকোচন বলা হয়। সংকোচনের বিপরীত হচ্ছে শিথিল হওয়া। হাঁটা, খাওয়া, কোনো কিছু উঠানো বা বসা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য পেশীর বিভিন্ন রকম ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। কিছু পেশী যখন সংকোচিত হতে থাকে তখন অন্য কিছু পেশী আবার শিথিল হতে থাকে। অন্যান্য পেশী শরীরের কিছু অংশকে শক্তভাবে ধরে রাখে যাতে শরীর স্থানচ্যুত না হয়।

শরীরকে নড়াচড়া করাতে হলে, পেশী অবশ্যই অস্থির দুই প্রান্তে যুক্ত থাকতে হবে। পেশী যে অস্থিতে সংযুক্ত থাকবে তা অবশ্যই শক্তিশালী এবং নিরোগ হতে হবে। পেশীর স্নায়ুগুলো অবশ্যই স্বাভাবিক অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় থাকতে হবে, যাতে সেগুলি সঠিক বার্তা গ্রহণ করতে পারে। যখন স্নায়ুগুলো ভালোভাবে কাজ করে এবং পেশীগুলো সুস্থ থাকে তখন পেশীগুলো খুব শক্তিশালী এবং দৃঢ় হয়। যখন স্নায়ুগুলো ভালোভাবে কাজ করে না এবং পেশীগুলো সুস্থ থাকে না, তখন পেশীর শক্তি বা দৃঢ়তা কমে যায়। যখন স্নায়ুগুলো কোনো কাজ করে না, তখন পেশী অবশ হয়ে যায়, পেশীর কোনো শক্তি বা দৃঢ়তা থাকে না। অবশ পেশী বৃদ্ধি লাভ করতে পারে না অর্থাৎ বাড়ে না এবং ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে।

► Organization of a Muscle Fiber

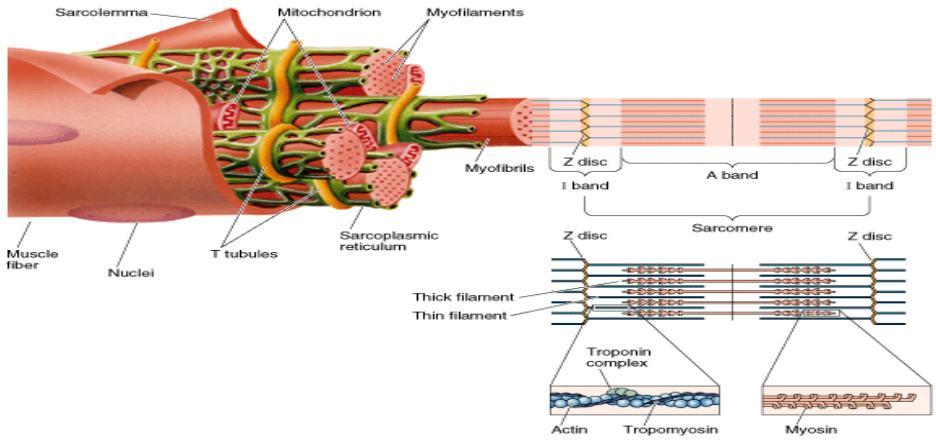

পেশীর সংকোচন (Muscular Contraction)

পেশীর সংকোচন হলো পেশী কোষে যান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পাদন, যার ফলে পেশী তন্তু ছোটো হয়ে আসে। যখন কোনো চল সংঘটিত হয় তার পূর্বে CNS (Central Nrvous System)-এর মাধ্যমে পেশী কোষে তথ্য সরবরাহ হয়। তারপর কোষে একটি বিশেষ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে পেশীতন্তুর মধ্যে অবস্থিত 'Z' line সরে আসে এবং পেশী সংকোচিত হয়। সাধারণত তিনটি পর্বে এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যথা -

১. CNS -এর মাধ্যমে পেশীকোষ তথ্য সরবরাহ
২. শক্তি উৎপাদন ও
৩. যান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পাদন

পেশী সংকোচনের ধাপ (Sliding Filament Theory):

পেশীর সংকোচন সাধারণত চারটি ধাপে সংঘটিত হয়। নিম্নে এই ধাপগুলো দেখানো হলো ।

১. Rest : প্রথমে পেশী শিথিল (Relax) অবস্থায় থাকে। অ্যাকটিন (Actin) ও মায়োসিন (Myosin) ফিলামেন্ট বিচ্ছিন্ন থাকে। ক্যালসিয়াম আয়োন (C++) সারকোপ্লাজমিক রেটিকোলামে সঞ্চিত থাকে। A অপরিবর্তিত থাকে।
২. Excitation / Coupling : এই পর্বে পেশী কোষে তথ্য সরবরাহ হয়, মায়োসিন (Myosin) মাথায় ক্যালসিয়াম আয়ন (C++) নিঃসৃত হয়। এরপর ATP ভেঙ্গে শক্তি (Energy) সঞ্চারণ ঘটে এবং মায়োসিন এর মাথা খাড়া হয়ে যায়। সাথে সাথে অ্যাকটিনের (Actin) সাথে মায়োসিনের (Myosin) মধ্যে (Head) যুক্ত হয়। অ্যাকটিন-মায়োসিন যুক্ত হওয়াকে বলা হয় Coupling।
৩. Contraction : অ্যাকটিন (Actin)-এর ওপর মায়োসিনের (Myosin) মাথা যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে একটিন ফিলামেন্ট মায়োসিন ফিলামেন্টের ওপর সরে আসে ফলে 'Z' line সরে আসে এবং পেশী সংকোচিত হয়ে।
৪. Recharging : পুনরায় শক্তি সঞ্চারিত হয়ে অ্যাকটিন(Actin) ও মায়োসিন (Myosin) আলাদা হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।

পেশী সংকোচনের প্রকারভেদ (Types of Muscle contraction)

আইসোটনিক

শক্তি উৎপাদনের ফলে মাংসপেশীর সংকোচন বা প্রসারণকে আইসোটনিক কনট্রাকসন বলে।

আইসোটনিক কনট্রাকসন আবার ২ ধরনের
১। কনসেন্ট্রিক
২। ইসেন্ট্রিক

কনসেন্ট্রিক: শক্তি উৎপাদনের ফলে মাংসপেশীর দৈর্ঘ্য কমে গেলে বা সংকোচন হলে কনসেন্ট্রিক কনট্রাকসন বলে।

ইসেন্ট্রিক: শক্তি উৎপাদনের ফলে মাংসপেশীর দৈর্ঘ্য বেশি হলে বা প্রসারণ হলে ইসেন্ট্রিক কনট্রাকসন বলে।

আইসোমেট্রিক

শক্তি উৎপাদনের ফলে মাংসপেশীর দৈর্ঘ্যের কোনো পরিবর্তন না হলে অর্থাৎ সংকোচন বা প্রসারণ না হলে তাকে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকসন বলে।

আইসোকাইনেটিক এক্সারসাইজ

নির্দিষ্ট গতি ঠিক রেখে মাংপেশীর সংকোচন ও প্রসারণ করাকে আইসোকাইনেটিক এক্সারসাইজ বলে।

স্লো-টুইচ ও ফাস্ট-টুইচ তন্তুর (Slow Twitch and Fast Twitch Muscle Fibre) **পার্থক্য**

বৈশিষ্টসমূহ	স্লো-টুইচ টাইপ	ফাস্ট-টুইচ/টাইপ-	
		IIa	IIa
▪ রং	লাল	সাদা/লাল	সাদা
▪ জালিকা	বেশি	মাঝামাঝি	কম
▪ তন্তুর ব্যাসরেখা	ছোটো	মধ্যম	উড়ো
▪ প্রাণ রসায়ন	স্লো অক্সিডেটিভ	ফাস্ট অক্সিডেটিভ গ্লাইকোলাইটিক	ফাস্ট গ্লাইকোলাইটিক
▪ মায়োসিন এনজাইম এর কার্যক্রম	কম	বেশি	বেশি
▪ ক্যালসিয়াম ক্ষমতা	কম	মাঝামাঝি	বেশি
▪ অক্সিডেটিভ ক্ষমতা	বেশি	মাঝামাঝি/বেশি	কম
▪ গ্লাইকোলাইটিক ক্ষমতা	কম	বেশি	বেশি
▪ কাজের গতি	ধীর	দ্রুত	দ্রুত
▪ বল প্রয়োগের ক্ষমতা	কম	মাঝামাঝি	বেশি
▪ অবসাদ গ্রস্ততা	কম	মাঝামাঝি	বেশি

পেশীতন্ত্রের ওপর ব্যায়ামের প্রভাব (Effect of exercises on muscular system)

পেশীর কার্যক্ষমতার ওপর দেহের বল প্রয়োগ নির্ভর করে। মানুষের চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, খেলাধুলা সবকিছুই নির্ভর করে পেশীর শক্তি ও সামর্থের ওপর। পেশীতন্ত্রের ওপর ব্যায়ামের প্রভাব কী রকম হবে তা নির্ভর করে ব্যায়ামের ধরণ, স্থায়িত্বকাল, পদ্ধতি ও সরঞ্জামাদির ওপর। শরীরচর্চার ফলে পেশীর উপর যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় তা হলো :

১. ট্রেনিং বা ব্যায়ামের ফলে পেশীতে Myoglobin -এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
২. ব্যায়ামের ফলে ঐচ্ছিক পেশীর গ্লাইকোজেন জারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৩. শারীরিক পরিশ্রমের ফলে পেশী তন্তুতে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি পায়।
৪. গ্লাইকোজেনের মতো স্নেহ পদার্থ ভেঙ্গে CO_2, H_2O এবং ATP উৎপন্ন করে।
৫. অবাত (Anaerobic) ব্যায়ামের ফলে ল্যাকটিক এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং পেশীর অবসাদ ঘটে।

৬. সবাত (Aerobic) ব্যায়ামের ফলে ATP-PC সিস্টেমের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। (ATP-PC সিস্টেম হলো পেশী কোষের Energy- সরবরাহের সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া)।
৭. পেশীর শক্তি ও নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়।
৮. পেশীতে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

মাসল হাইপার ট্রফি (Muscle Hypertrophy)

মাংসপেশীর তন্তুসমূহের পূরুত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে মাংসপেশীর আকার বৃদ্ধি পাওয়াকে মাসল হাইপার ট্রফি বলে। বার বার শক্তি পূর্ণ ব্যায়াম করার কারণে মায়োফিব্রিল, সারকোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও মাইটোকন্ড্রিয়া বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে পেশীতন্তুর ব্যাস বৃদ্ধি পেয়ে সম্পূর্ণ মাংসপেশীর আকার বৃদ্ধি পায়।

নিয়মিত ভার প্রশিক্ষণ (Weight Training) এর ফলে সম্পূর্ণ মাংসপেশীর আকার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। পেশী তন্তুর বৃদ্ধি
২। প্রোটিন বৃদ্ধি পাওয়া বিশেষ করে মায়োসিন
৩। পেশীতন্তুর জালিকা সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া
৪। আকার ও সংখ্যায় এটিপি, সিপি, গ্লাইকোজেন ও মাইটোকণ্ড্রিয়া বেড়ে যায়।
৫। বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় এনজাইম

পঞ্চম অধ্যায়: শ্বাসতন্ত্র

শ্বাসতন্ত্রের বেশিরভাগ অঙ্গই কয়েকটি অস্থি দ্বারা গঠিত একটি খাঁচা দ্বারা আবদ্ধ যাকে বক্ষ বা বুক (Chest) বলা হয়। বক্ষ গলার নিচ থেকে পাঁজরের নিম্নপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বুকের সামনের দিকের মাঝখানে রয়েছে উরুফলক (Sternum)। বুকের সামনের বেশির ভাগ অংশ, পার্শ্ব এবং পেছন দিক ১২ জোড়া পাঁজরাস্থি দ্বারা গঠিত হয়েছে। দুই পাঁজরাস্থির মধ্যবর্তী স্থানকে Intercostal space বলে। এই স্থানের মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ড ও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বক্ষের ভিতরে শ্বাসতন্ত্রের বেশির ভাগ অঙ্গ যেমন- ফুসফুস, প্রধান বায়ুনালী ইত্যাদি এবং রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হৃৎপিণ্ড থাকে।

স্কন্ধাস্থি (Scapula) বুকের পেছনের ওপরের অংশে উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা বুকের পেছনের এবং কিছুটা পার্শ্বে উপরের দিকের পাঁজরাস্থিগুলো (Ribs) ঢেকে রাখে। কণ্ঠাস্থি (Clavicle) বুকের খাঁচার উপর পার্শ্বে উরুফলক (Sternum) থেকে স্কন্ধাস্থি পর্যন্ত প্রসারিত। কণ্ঠাস্থি উভয় দিকে প্রথম পাঁজরাস্থির উপর অবস্থিত।

বুকের কিছু কিছু চিহ্ন বুকের ভেতর অবস্থিত বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থান নির্ণয়ে সাহায্য করে।

মধ্য কণ্ঠাস্থি রেখা (**Mid-clavicular Line**)

এটি হচ্ছে প্রতিটি কণ্ঠাস্থির মাঝখান থেকে নিচ বরাবর বুকের দুই পার্শ্বে দুইটি কল্পিত রেখা। হৃৎপিণ্ড বাম মধ্য কণ্ঠাস্থি রেখার একটু ভেতরে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের আগা (Apex) পঞ্চম ও ষষ্ঠ পাঁজরাস্থির মধ্যস্থিত স্থানে অবস্থিত।

উরুফলক কোণ (**Sternal Angle**)

উরুফলক উপরের প্রান্তে একটি গর্তের মতো স্থান আছে যাকে গ্রীবা খাঁজ (Suprasternal notch) বলা হয়। এই খাঁজের প্রায় এক ইঞ্চি নীচে একটি উঁচু অস্থির স্থান আছে তাকে উরুফলক কোণ (Sternal Angle) বলা হয়।

এই উরুফলক কোণ দ্বিতীয় পাঁজরাস্থির সমতল নির্দেশ করে। **দ্বিতীয় পাঁজরাস্থির নিচেই দ্বিতীয় পাঁজরাস্থির মধ্যস্থিত স্থান।**

আপনি অন্যান্য পাঁজরাস্থির স্থান বের করার জন্য এই স্থান থেকে গণনা শুরু করতে পারেন। বায়ুনালী (Bronchus) এই উরুফলক কোণের ঠিক নীচ থেকেই দুই শাখায় ভাগ হয়ে যায়। উরুফলক বা স্টার্ণামের তিনটি অংশ। উপরের চতুস্কোণ পুরু অংশ মেনুব্রিয়াম স্টারনি (Manubrium sternae) মাঝে সরু লম্ব অংশ দেহ (Body) এবং নিচের ছোটো অংশ জিফয়েড প্রসেস (Xiphoid process)। মেনুব্রিয়াম স্টারনি এবং দেহের সংযোগ স্থলকেই স্টার্নাল কোণ বা Sternal angle বলে।

জিফয়েড প্রসেসের উভয় পার্শ্বে এবং পাঁজরের প্রান্ত দিয়ে নেমে যাওয়া অংশকে পাঁজরের কিনারা (Rib Margin) বলা হয়। ফুসফুসের নীচের প্রান্ত সামনের দিকে পাঁজরাস্থি পর্যন্ত প্রসারিত এবং বাঁকা হয়ে পেছনের দিকে পাঁজরাস্থির সমতলে শেষ হয়েছে।

শ্বাসতন্ত্রের (Respiratory System) বিভিন্ন অংশ

শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে বাতাস বাহির থেকে ভেতরে অর্থাৎ ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং ফুসফুস থেকে বাইরে বের হয়ে যায়। আমরা যখন শ্বাস নেই তখন অক্সিজেন পূর্ণ বাতাস ফুসফুস থেকে বাইরে বের হয়ে যায়। শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) নাসিকা গহবর (Nasal cavity) বা নাক (Nose)
২) গলবিল (Pharynx)
৩) স্বরযন্ত্র (Larynx)
৪) শ্বাসনালী (Trachea)
৫) প্রধান বায়ুনালী (Bronchus)
-ডান (Right)
-বাম (Left)
৬) ফুসফুস (Lungs)
- ডান (Right)
- বাম (Left)
- বায়ুনালীর প্রধান অনুশাখা (Bronchioles)
- বায়ুকোষ (Alveoli)

৭) ফুসফুসের পর্দা (Pleura)
৮) মধ্যচ্ছেদা (Diaphragm)

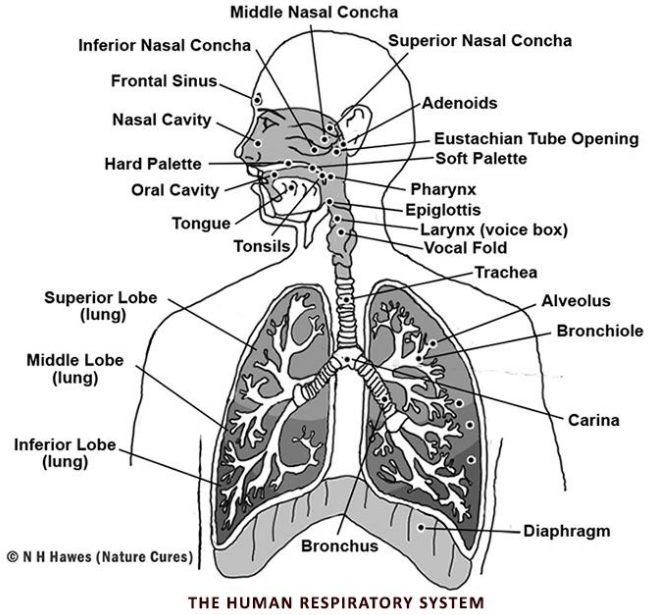

চিত্রঃ শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

নাসিকা গহবর/নাক (Nasal Cavity/Nose)

নাসিকা ভেদক (Nasal septum) দ্বারা নাসাপথ ডান ও বাম নাসারন্ধ্রে বা নাকের ছিদ্রে বিভক্ত। এই ভেদকটি অস্থি এবং তরুনাস্থি দিয়ে তৈরি। শ্লেষ্মা ঝিল্লি আবরণ দ্বারা নাসিকা ভেদক এবং নাকের ভেতরের অংশ আচ্ছদিত। শ্বাস নেয়ার সময় শ্লেষ্মা ঝিল্লি বাতাসকে পরিষ্কার, উষ্ণ এবং আদ্র করে। নাসিকা ভেদকের শ্লেষ্মা ঝিল্লিতে প্রচুর রক্ত সরবরাহ থাকে। এই অংশ আঘাত প্রাপ্ত হলে প্রচুর রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে। মুখের অস্থি দ্বারা গঠিত মুখ গহবরের ছাদ (Roof) নাকের ভেতরের অংশকে মুখ থেকে পৃথক করে রাখে। নাকের ভেতরের অংশ গলার উপরের অংশের সাথে মিশেছে।

গলবিল (Pharynx)

এটি নাসিকা গহবর এবং শ্বাসনালীর ঊর্ধভাগের মধ্যে অবস্থিত। এটি পেশী দিয়ে তৈরি একটি পথ এই একই পথের মধ্য দিয়ে বাতাস শ্বাসতন্ত্রে এবং খাদ্য পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে।

স্বরযন্ত্র (Larynx)

গলাকোষ ও শ্বাসনালী (Trachea) মাঝখানে স্বরযন্ত্র অবস্থিত। আপনি গলার সন্মুখভাগে স্বরযন্ত্রের প্রলম্বিত (Laryngeal Prominence) স্থান অনুভব করতে পারেন। স্বরযন্ত্রের উপরে একটি ঢাকনা বা উপজিহবা (Epglottis) আছে। খাবার গেলার সময় এই ঢাকনা বন্ধ হয়ে যায়। যাতে খাবার শ্বাসনালীতে ঢুকতে না পারে।

শ্বাসনালী (Trachea)

শ্বাসনালী হচ্ছে একটি বায়ুর নল বা টিউব। এটি স্বরযন্ত্র থেকে বুকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে দুই প্রধান বায়ুনালিতে (Principal Bronchus) ভাগ হয়েছে। বাতাস এই নলের মাধ্যমে ফুসফসে প্রবেশ করে।

প্রধান বায়ুনালী (Principal Bronchus)

প্রতিটি ফুসফুসে একটি প্রধান বায়ুনালী প্রবেশ করেছে। ডান প্রধান বায়ুনালী বাম প্রধান বায়ুনালী অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত এবং সোজাসুজি ফুসফুসে প্রবেশ করেছে। যে কারণে বাহিরের কোনো পদার্থ ডান ফুসফুসে প্রবেশ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বায়ুনালী ফুসফসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখায় (Bronchioles) বিভক্ত হয়।

ফুসফুস (Lungs)

বুকের ভেতর দুই পার্শ্বে দুইটি ফুসফুস অবস্থিত। ডান ফুসফুসে ৩টি লোব (Lobe) এবং বাম ফুসফুসে ২টি লোব (Lobe) আছে। ফুসফুস অসংখ্য বায়ুকোষ (Alveoli) নিয়ে গঠিত। এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠবিশেষ এবং অনেকটা বেলুনের মতো। শ্বাস গ্রহণের সময় এগুলো ফুলে যায় এবং ত্যাগের সময় চুপসে যায়। এর চর্তুদিকে অসংখ্য কৈশিকনালী থাকে। এই কৈশিকনালীর স্তরের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয় এবং কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে।

ফুসফুসের পর্দা (Pleura)

দুই পাশের দুই ফুসফুসকে এটি আবৃত করে রাখে। এটি ২টি স্তরে বিভক্ত। ভিতরের স্তর ফুসফুসকে আবৃত করে রাখে এবং বাহিরের স্তর বক্ষের ভিতরে দেয়ালকে ঘিরে রাখে। ফলে দুই স্তরের মাঝে একটি ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়ে থাকে। একে Pleural cavity বলে। বিভিন্ন অসুখে এই জায়গায় তরল পদার্থ (Fluid), রক্ত বা পুঁজ জমতে পারে।

মধ্যচ্ছেদা (Diaphragm) এটি একটি মাংশপেশীর পর্দা যা বক্ষকে উদর থেকে পৃথক করে। মধ্যচ্ছেদা ফুসফুসের ঠিক নিচেই অবস্থিত। এই পর্দাটি শ্বাস-প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

প্রশ্বাস ও নিশ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত পেশী:

১। ডায়াফ্রাম (Diaphram)

২। বহিঃস্থ অন্তর পঞ্জরাস্থি পেশী (External intercostal)

৩। অন্তঃস্থ অন্তর পঞ্জরাস্থি পেশী (Internal intercostals muscle)

৪। রেকটাস এবডুমিনিস (Rectus Abdominis)

মানবদেহের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া:

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রমণ্ডলী গলকক্ষের দিকেই উন্মুক্ত, অন্য সবদিকে বন্ধ। নাসাপথ হতে ফুসফুসের কোষ পর্যন্ত অবাধ পথ রয়েছে। আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি তখন আমাদের মস্তিষ্কের শ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী সেন্টার উত্তেজিত হয়। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মধ্যচ্ছেদা (ডায়াফ্রাম) ও শ্বাস প্রশ্বাস সহযোগী মাংসপেশীগুলোকে সংকোচিত করে। এ সংকোচনের ফলে ডায়াফ্রাম নিচে নেমে আসে এবং ফুসফুসের সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে অক্সিজেন যুক্ত বাতাস নাসিকা, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী এবং বায়ুনালী (ব্রংকাই) দিয়ে ফুসফুসের অ্যালভিওলিতে পৌঁছায়। অ্যালভিওলি তার আশেপাশে রক্তনালীর সাথে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন (O_2) রক্তে যায় এবং রক্ত হতে কার্বনডাই-অক্সাইড (CO_2) অ্যালভিওলিতে আসে। আবার আমরা যখন শ্বাস ত্যাগ করি তখন ফুসফুস সংকোচিত হয় এবং ডায়াফ্রাম ওপরে উঠে আসে ফলে ফুসফুসে বায়ুর চাপ বাড়ে। এ উচ্চচাপের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) সমৃদ্ধ বাতাস শ্বাসনালীর মাধ্যমে ওপরে উঠে আসে এবং নাসারন্ধ্র দিয়ে দেহের বাইরে বের হয়। এভাবেই মানবদেহের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস তন্ত্রের ওপর ব্যায়ামের প্রভাব:

১। আমরা যখন ব্যায়াম করি তখন আমাদের দেহে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরী হয়। এ (CO_2) মস্তিষ্কে শ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী সেন্টারের ওপর কাজ করে।

২। ব্যায়াম করলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়।
৩। রক্তে অক্সিজেন কমে যায়।
৪। ব্যায়াম করলে রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যায়।

রক্তের গ্যাস পরিবহণ

রক্ত ফুসফুস হতে অনবরত দেহের সমস্ত কলায় অক্সিজেন পরিবহন করে এবং কলা হতে কার্বনিক অম্ল গ্যাস ফুসফুসে বহন করে। ধমনীর রক্ত যা ফুসফুস হতে প্রবাহিত হয় তাতে অক্সিজেন থাকে পদার্থ বিজ্ঞানের তরল গ্যাস মিশার নিয়ম অনুযায়ী যতটা থাকা উচিত তার চাইতে অনেক বেশী। ফুসফুসের এলভিওলাস হতে যে অক্সিজেন রক্তে প্লাজমায় আসে তা সক্রিয়ভাবে রক্তের লাল কণিকায় প্রবেশ করে এবং হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরী করে। প্রকৃতির বায়ু হতে শ্বাস প্রশ্বাস নিলে সাধারণ অবস্থায় ৯৬% হিমোগ্লোবিন অক্সিহিমোগ্লোবিনে পরিণত হয়। এতে রক্তের লাল কণিকায় অক্সিজেনের যে পরিমাণ দাঁড়ায় রক্তের প্লাজমায় তার পরিমাণের চাইতে প্রায় ৬০ গুণ বেশি। ফলে বিনিময় প্রক্রিয়ায় কলাগুলোতে যতো পরিমাণে অক্সিজেনের প্রয়োজন ততো পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ এতে সুনিশ্চিত হয়। রক্ত যখন রক্তবাহী কৈশিক শিরার ভিতর দিয়ে বিভিন্ন দেহাঙ্গে প্রবাহিত হয় তখন গ্যাস উচ্চতর আংশিক চাপযুক্ত স্থান অর্থাৎ রক্তের প্লাজমা হতে সেখানে চলে যায় (কলারসে) যেখানে তার আংশিক চাপ কম থাকে। কলারস হতে অক্সিজেন কোষের ভেতর চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা রাসায়নিক জারণ প্রক্রিয়ায় নিবদ্ধ হয়। যে পরিমাণ অক্সিজেন এইভাবে প্লাজমা হতে চলে যায় ঠিক সেই পরিমাণে অক্সিহিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিনে পরিণত হয় যাতে প্লাজমায় অক্সিজেনের ঘনত্ব যথেষ্ট উচ্চমাণে সংরক্ষিত হয়।

বিপাক প্রক্রিয়ায় কোষগুলিতে তৈরী হওয়া কার্বনিক অম্লগ্যাস কোষ হতে বাহির হয়ে কলারসে চলে যায় এবং সেখানে ঐ গ্যাসের উচ্চমানের আংশিক চাপ সৃষ্টি করে। রক্তবাহী কৈশিক শিরার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন দেহাঙ্গে প্রবাহিত রক্তে কার্বনিক অম্লগ্যাসের আংশিক চাপ অনেক কম, তাই কার্বনিক অম্লগ্যাস কলারস হতে রক্তে চলে যায়। সাধারণ জলীয় পদার্থে দ্রব অবস্থায় যে পরিমাণ কার্বনিক অম্ল গ্যাস থাকে, রক্তে তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। বিশেষ ফার্মেন্টের অংশ গ্রহণে কার্বনিক অম্লগ্যাস তুলনামূলকভাবে রক্তের প্লাজমার পানির সাথে যুক্ত হয়, যাতে সৃষ্টি হয় কার্বনিক অম্ল। এই অম্ল ফুসফুসের মধ্যে এসে ভেঙ্গে যায় এবং কার্বনিক অম্লগ্যাস ও পানি তৈরী হয়। দেহের ভিতর এইসব প্রক্রিয়ার ফলেই কলাতে তৈরী সমস্ত কার্বনিক অম্লগ্যাস বের করা সম্ভব হয়। রক্ত যা তার নিজস্ব সমস্ত অক্সিজেন দিয়ে দিয়েছে এবং যা কার্বনিক অম্ল গ্যাসের দ্বারা সম্পৃক্ত তাকে বলা হয় শিরার রক্ত। শিরার রক্ত ফুসফুসে চলে যায় যেখানে ফুসফুসের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চলে।

ভাইটাল ক্যাপাসিটি বা বায়ু ধারকত্ব (Vital Capacity):

গভীরতম নিশ্বাস প্রক্রিয়ার পর অর্থাৎ সবচেয়ে জোরে জোরে চাপ দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করে তারপর ধীরে ধীরে বেশি চাপ দিয়ে যে পরিমাণ বায়ুকে বলপূর্বক ফুসফুস হতে বের করা সম্ভব তাকে ফুসফুসের বায়ু ধারকত্ব বা ভাইটাল ক্যাপাসিটি বলে।

ভাইটাল ক্যাপাসিটি=নিশ্বাস বায়ুর ধারণ ক্ষমতা+প্রশ্বাস কার্যের অতিরিক্ত বায়ুর পরিমাণ।

খেলোয়াড়দের ভাইটাল ক্যাপাসিটি বেশি হয়ে থাকে। এর স্বাভাবিক পরিমাণ পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায় ৪.৮ লিটার এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ৩.১ লিটার।

টাইডাল এয়ার (Tidal Air)

স্বাভাবিক শ্বাস নিয়ে স্বাভাবিক শ্বাস ত্যাগ করলে যে পরিমাণ বাতাস আমরা ত্যাগ করি তাকে বলে টাইডাল এয়ার। এর পরিমাণ প্রায় ৫০০ সি.সি।

ডেড স্পেস এয়ার (Dead Space Air)

নাসিকা, ফ্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাই প্রভৃতি অংশে যে বায়ু শ্বাস ত্যাগের পরও থেকে যায় তাকে ডেড স্পেস এয়ার বলে। এর পরিমাণ প্রায় ১০০০ সি.সি।

কমপ্লিমেন্টারি এয়ার (Complementary Air)

স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণের পরও যে অতিরিক্ত পরিমাণ বায়ু সব চেয়ে চাপ দিয়ে নিশ্বাস নিলে গ্রহণ করা যায় তাকে কমপ্লিমেন্টারি এয়ার বলে। এর পরিমাণ ১৫০০ সি.সি।

সাপ্লিমেন্টারি এয়ার (Supplimentary Air)

স্বাভাবিক শ্বাস ত্যাগের পরও জোরে জোরে শ্বাস ত্যাগ করলে যতটা অতিরিক্ত বাতাস ফুসফুস হতে বাহির করে দেয়া যায় তাকে সাপ্লিমেন্টারি এয়ার বলে। এর পরিমাণ প্রায় ১৫০০ সি.সি।

রেসিড্যুয়াল এয়ার (Residual Air)

সবচেয়ে জোরে শ্বাসত্যাগ করার পরও ফুসফুসে যে বায়ু থাকে তাকে রেসিড্যুয়াল এয়ার বলে। ফুসফুসের ভিতরে ছোটো ছোটো বায়ু কক্ষ বা (Alveoli) তে যে বায়ু সর্বদা অবস্থান করে তাই (Alveoli) বা Alveolar Air। এর পরিমাণ প্রায় ১৫০০ সি.সি।

রিজার্ভড এয়ার (Reserved Air)

স্বাভাবিক শ্বাসত্যাগ করার পর ফুসফুসে যে বায়ু থাকে তাকে রিজার্ভড এয়ার বা স্থায়ী বায়ু বলে। এর পরিমাণ প্রায় ২৫০০ সি.সি।

তথ্যসূত্র

Alter M. J. Sports stretch. Human kinetics USA 1997
Alter M. J. Science of flexibility. Champaign. IL: Human kinetics 1996
Brukner P. and Khan K. Clinical sports medicine 2nd edition, McGraw – Hill bood company Australia Pvt limited Australia 2009; 6: 84 -85
Clafs C. (Carl) E. and Arnheim D. D. Principles of athletic training USA 1973.
Gardinar M. D. (Dena) The principles of exercise therapy, 4th edition, UK 74 – 90
Kisner C. and Colby L. A. Therapeutic exercises foundation and techniques, 3rd edition, Jaypee brothers, India, 1996. 5; 143 – 180
Kumar V. L. et.al., Modern principles of athletic training. India 2002.
Safrit J. M. (Margaret) Introduction to measurement in physical education and exercise science, 2nd edition, the times mirror/Mosby college publishing USA 1990. 16; 372 – 375
Simpson D. G. et al. Role of mechanical stimulation in the establishment and maintenance of muscle cell differentiation. International review of cytology. 150. 1994: 69 – 94

Uppal A. K. Principle of sports training. Friends publication (India), Delhi – 2001. 7: 109 - 120
Williams P. E. and Gold Spink G. Longitudinal growth of striated muscle fibers. Journal of cell 9 (3). 1971: 751 – 767.
ডা. আবু হোসেন সরকার, হিউম্যান ফিজিওলজি, দি ন্যাশনাল এইচ. আর.ল্যাবরেটরি লিঃ, ২০০৬
জসিম উদ্দিন আহাম্মদ, অ্যানাটমি ও স্পোর্টস ফিজিওলজির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ২০০৩
জসিম উদ্দিন আহাম্মদ, ফিজিওলজি স্পোর্টস মেডিসিনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ২০০৩
মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, ফিজিওলজি ও স্পোর্টস মেডিসিন, ২০১৫

স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বি-স্পোর্টস/বিএ/বিএসসি ডিগ্রির সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত

সাদেকা ইয়াসমিন

বিএসসি (অনার্স) এমএসসি (জা.বি)
পিজিডি ইন স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স
রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট (স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স)
ক্রীড়াবিজ্ঞান শাখা, বিকেএসপি.

ড. আবু তারেক

পিএইচডি ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড স্পোর্টস সায়েন্স
পিজিডি ইন স্পোর্টস সায়েন্স (স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স)
বিএসসি(অনার্স) এমএসসি (পদার্থ)
সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান
স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স বিভাগ
ক্রীড়া বিজ্ঞান শাখা, বিকেএসপি

মুখবন্ধ

বর্তমানে বিকেএসপিতে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ যথেষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক। এই বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণে ক্রীড়া বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স। এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক পর্যায়ে স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে। এতদিন ইংরেজি ভাষায় এ বিষয়টি শিক্ষার্থীবৃন্দ অধ্যায়ন করতো। ইংরেজি ভাষায় অধ্যয়ন করার ফলে অনেক জটিল বিষয় বুঝতে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হতো। বাংলা ভাষায় স্পোর্টস বায়োমেকানিক্সের কোনো বই নেই। এ কথা আমরা সকলে জানি যে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করলে বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত জটিল বিষয়গুলো শিক্ষার্থীবৃন্দ সহজে বোঝতে পারবে। বিষয়টি উপলব্ধি করে আমরা বাংলা ভাষার স্পোর্টস বায়োমেকানিক্সের ওপর বই লেখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী বইটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। বইটি লেখার জন্য বিকেএসপির মহাপরিচালক, পরিচালকবৃন্দ, উপ-পরিচালক ক্রীড়াবিজ্ঞান আমাদের উৎসাহ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। বইটির রচনা ও প্রকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা সাহায্যে হাত বাড়িয়েছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অবশেষে যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য এ বইটি লেখা সেই সমস্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ বইটি পড়ে যদি উপকৃত হয় তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

সাদেকা ইয়াসমিন
ড. আবু তারেক

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়/৭৬

ভূমিকা (Introduction)
মৌলিক ধারণা (Basic Concept)
প্রাক্‌কালীন ইতিহাস (Historical back ground)
ক্রীড়া ক্ষেত্রে স্পোর্টস বায়োমেকানিক্সের গুরুত্ব (Improtance in games and sports)

দ্বিতীয় অধ্যায়/৭৯

কিনসিওলজি (kinesiology) কিনসিওলজির অর্থ ও স্পোর্টস বায়োমেকানিক্সের সাথে এর সম্পর্ক (Meaning and relation with sports Biomechanics)

মানবগতির তল ও অক্ষের বিস্তারিত বর্ণনা (Planes and Axes for human motion)
অস্থিসন্ধির চারদিকে মৌলিক অবস্থান পরিবর্তনগুলো (Fundamental movement around the joints)

তৃতীয় অধ্যায়/৮২

গতিবিজ্ঞান বা গতির ধরন (Kinematics)
গতি: গতির সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ (Motion: Definition and types)
রৈখিক ও কৌণিক গতির ধরনের রাশিসমূহ: (সরণ, দ্রুতি, বেগ, ত্বরণ) (Kinematics parameters of linear and angular motion: Displacement, Speed, Velocity, Acceleration)
রৈখিক ও কৌণিক গতির রাশিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between linear and angular motion parameters)

চতুর্থ অধ্যায়/৮৬

গতিবিদ্যা (Kinetics)
নিউটনের গতিসূত্রগুলো এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে গতিসূত্রগুলোর ব্যবহার (Newton's laws of motion and their application in sports)

পঞ্চম অধ্যায়/৮৮

মানব শরীরের যান্ত্রিক সুবিধা (Machine function of human body)
লিভার (Lever)
সংজ্ঞা, উপাদানগুলো, প্রকারভেদ, যান্ত্রিক সুবিধা, কঙ্কালতন্ত্রীয় লিভার (Definition, Components, Types, Mechanical functions, Skeletal levers)
চাকা ও অক্ষদণ্ড : (সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, যান্ত্রিক সুবিধা, মানবদেহে চাকা ও অক্ষদণ্ডের কার্যক্রম) Wheel and Axle: (Definition, Types, Mechanical function, Wheel and Axle arrangement in human body)

ষষ্ঠ অধ্যায়/৯১

ভারসাম্য (Equilibrium)
সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, ভারসাম্যের উপাদান (Definition, Types, and Condition of equilibrium)
ভারসাম্যের প্রভাবিত উৎপাদক (Factors affecting degree of stability)

প্রথম অধ্যায়: স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স

Sports Bio-mechanics

ভূমিকা (Introduction):

স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স (Sports biomechanics) এর মৌলিক ধারণা (Basic concept):

বায়োমেকানিক্স : Bio-mechanics কথাটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। এর পূর্বের শব্দটি হচ্ছে Bio অর্থাৎ জীবন এবং মূল শব্দটি হচ্ছে mechanics অর্থাৎ গতিবিদ্যা। অতএব এক কথায় বলা যায় বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবনের গতি প্রকৃতি বা গতিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে (Bio-mechanics) বায়োমেকানিক্স বলে। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, বায়োমেকানিক্স হচ্ছে বিজ্ঞানের এমন এক বিষয় যা বলবিজ্ঞানের নিয়মনীতির ভিত্তিতে মানব শরীরের ভেতরের ও বাইরের প্রয়োগকৃত বল এবং সে বলের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করে।

স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স (Sports Bio-mechanics): এটি হচ্ছে ক্রীড়াবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা ক্রীড়ার মান উন্নয়নের লক্ষে খেলোয়াড়ের ক্রীড়া কৌশলকে বলবিজ্ঞানের নিয়মনীতির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে।

স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স এর প্রাক্কালীন ইতিহাস (Historical background of Sports Biomechanics) :

স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স ক্রীড়াবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়ানুক্রমিক এই বিষয়ের যে বিকাশ লাভ করেছে নিম্নে এর প্রাক ইতিহাস বর্ণনা করা হলো।

(ক) ১৯১২ সালে এরিস্টেটল মেকানিক্স অব হিউম্যান অ্যাণ্ড এনিমেল মোশন সম্পর্কে এ ধারনা দেন।

(খ) ১৯৩১ সালে সর্বপ্রথম প্রাক্তন রাশিয়ায় লেনিনগ্রাড শারীরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স এর উপর একটি বক্তৃতার আয়োজন করেছিল।

(গ) ১৯৩৫ সালে আর্থোর স্টেইনডলার(Arther Steindler) বায়োমেকানিক্স-এর উপর প্রথম টেক্সট বুক লেখেন।

(ঘ) ১৯৬০ সালে জার্মানের লিপজিগে স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স এর উপর একটি আন্তর্জাতিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

(ঙ) ১৯৬৭ সালে সুইজারল্যান্ডের জুরিকে বায়োমেকানিক্স এর উপর প্রথম আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(চ) ১৯৬৮ সালে সর্বপ্রথম বায়োমেকানিক্স এর উপর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

(ছ) ১৯৭৩ সালে স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স এর আন্তর্জাতিক সমিতি/সংগঠন গঠিত হয়েছিল।

(জ) ১৯৮৫ সাল হতে নিয়মিত স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স এর উপর আন্তর্জাতিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

(ঝ) ১৯৯২ সালে পত্রিকাটির নাম পরিবর্তন করে জার্নাল অব বায়োমেকানিক্স রাখা হয়।

ক্রীড়াক্ষেত্রে Sports Bio-mechanics এর গুরুত্ব (Importance in games and sports): ক্রীড়াক্ষেত্রে Sports Bio-mechanics এর গুরুত্ব অপরিসীম। Sports Performance বৃদ্ধিতে Sports Bio-mechanics এর ব্যাপক ভূমিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিম্নে দেয়া হলো ।

১. ক্রীড়া কৌশল এর উন্নয়ন ঘটানো:

(ক) ক্রীড়াকৌশল নির্ভুলভাবে শিখানো।

(খ) ভুল ভ্রান্তির কারণ নির্ণয় করা।

(গ) ভুলভ্রান্তি সংশোধনের উপায় নির্ণয় করা।

(ঘ) নতুন নতুন কৌশল তৈরি করা।

২. ক্রীড়া প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন করা:

(ক) প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(খ) প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি ঘটানো।

(গ) প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ব্যায়ামের সঠিক নির্বাচন ও প্রয়োগ।

৩. খেলাধুলায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাদির উন্নতি ঘটানো:

(ক) খেলোয়াড়ের ব্যাক্তিগত যন্ত্রপাতির (খেলার পোশাক, জুতা, গ্লাবস, গার্ডস ইত্যাদি) উন্নয়ন।

(খ) কারিগরি যন্ত্রপাতির (স্ট্যাটিং ব্লক, বল, ব্যাট, তীর,স্টিক ইত্যাদি) উন্নয়ন ।

(গ) খেলাধুলার ব্যবস্থাদির (সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম, কৃত্রিম ট্র্যাক, পিচ, ম্যাট ইত্যাদি) উন্নয়ন।

(ঘ) খেলাধুলার ফলাফল পরিমাপক যন্ত্রের (স্টপওয়াচ, ফটোফিনিস যন্ত্র, স্পিডোমিটার ইত্যাদি) উন্নয়ন।

৪. খেলোয়াড়ের আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা কমানো:

(ক) উপযুক্ত কৌশলের সাহায্যে (ল্যান্ডিং, গিভিং)।

(খ) প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামাদি ব্যবহার (হেলোমেট, গ্লাবস, গার্ডস ইত্যাদি)।

স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স এর বৈশিষ্ট্য:

(ক) স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স হচ্ছে ক্রীড়াবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(খ) স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স খেলোয়াড়ের ক্রীড়া কৌশল বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বলবিজ্ঞানের নিয়মনীতির ভিত্তিতে।

(গ) স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স এর লক্ষ্য ক্রীড়ামানের উন্নয়ন।

(ঘ) স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স মানবদেহে যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (উৎকর্ষতা ও সীমাবদ্ধতা) অনুযায়ী কাজ করে।

(ঙ) বিভিন্ন মোটর সক্ষমতা নির্ণয়ে এটি সাহায্য করে (দম, ক্ষিপ্রতা, গতি ইত্যাদি)

(চ) স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স এর তাত্ত্বিক (Academic) ও প্রয়োগমূলক (Applied) দিক আছে।

বায়োমেকানিক্যাল নীতিসমূহ (Biomechanical Principles) খেলাধুলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারিত মূল বায়োমেকানিক্যাল নীতিগুলো নিম্নরূপ

১. প্রাথমিক বলের জন্য বায়োমেকানিক্যাল নীতি (Biomechanical Principles for Initial force)

২. সর্বোচ্চ ত্বরনের জন্য বায়োমেকানিক্যাল নীতি (Biomechanical Principles of optimum path of acceleretion)

৩. সর্বোচ্চ প্রবণতার ত্বরণের জন্য বায়োমেকানিক্যাল নীতি (ক্রম ও বিপরীত ক্রমানুসারে) (Biomechanical Principles of optimum tendency of course of acceleration(Assending & ecending)

৪. কৌনিক ভরবেগের সংরক্ষণের জন্য বায়োমেকানিক্যাল নীতি (Biomechanical Principles of conservation of angular momention

প্রতিক্রিয়ার জন্য বায়োমেকানিক্যাল নীতি (Biomechanical Principles of reaction)

১, ২ এবং ৩ হচ্ছে মেকানিক্যাল

৪ এবং ৫ হচ্ছে বায়োমেকানিক্যাল এবং মেকানিক্যাল

দ্বিতীয় অধ্যায়: কিনসিওলজি

কিনসিওলজি (Kinesiology):

কিনসিওলজির অর্থ ও স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স এর সাথে এর সম্পর্ক (Meaning of Kinesiology and relation with Sports Biomechanics)

Kinesiology এমন একটি বিদ্যা যা মানুষের গতি নিয়ে আলোচনা করে। kinesiology is known us "Science of human motion" এটি ৩টি মূল ভিত্তির উপর নির্ভরশীল।
যেমন, Anatomy, Physiology and Mechanics.

Kine means motion, Ology means Science. Kinesiology may also be difined as "Science which deals with musculo-skeletal system of human body"

পরিশেষে বলা যায় যে, যে বিদ্যা মানবদেহের হাড়, মাংসপেশী, জয়েন্ট এর Movement বা গতি নিয়ে আলোচনা করে তাই Kinesiology .

গতি/ চলনে অক্ষ ও তলের ভূমিকা (Planes and Axes for motion) :

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন সাধারণত প্রাকৃতিক ভাবে হয়ে থাকে। এই সকল অঙ্গসমূহের সঞ্চালন বিভিন্ন কাল্পনিক তল বরাবর এবং অক্ষের চতুর্দিকে সংঘটিত হয়।

তল: তল হচ্ছে একটি দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠ।

অক্ষ: অক্ষ হচ্ছে একটি কাল্পনিক রেখা যা কোনো অস্থিসন্ধির ভেতর দিয়ে পরিচালিত হয় বলে কল্পনা করা হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলো সেই কাল্পনিক রেখার চারিদিকে সঞ্চালন করে।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন সাধারণত ৩টি তলে এবং ৩টি অক্ষে সংঘটিত হয়ে থাকে।
নিম্নে তলসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো: সাধারণত ৩ ধরনের তল রয়েছে, যথা

১. সেজিটাল তল (Sagittal plane)
২. ফ্রন্টাল তল (Frontal Plane)
৩. ট্রান্সভার্স তল (Transverse Plane)

১. সেজিটাল তল: (Sagittal plane)

এই তল দেহকে বাম ও ডান এ দু' অংশে বিভক্ত করে।
এ তল বরাবর ফ্লেকশন (Flexion) ও এক্সটেনশন (Intention) সংঘটিত হয়।

২. ফ্রন্টাল তল (Frontal Plane):

এই তল দেহকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ এ দু' অংশে বিভক্ত করে ।
এ তল বরাবর অ্যাবডাকশন (Abduction) ও অ্যাডাকশন (Adduction) সংঘটিত হয়।

৩. ট্রান্সভার্স তল (Transverse Plane):

এই তল দেহকে উপর ও নিচ এ দু' অংশে বিভক্ত করে।
এ তল বরাবর ঘূর্ণন (Rotation) সংঘটিত হয় । (ভিতরের দিকে ও বাইরের দিকে)

অক্ষসমূহ (Axes):
অক্ষ মূলত ৩ ধরনের হয়ে থাকে । যথা-
১. সেজিটাল অক্ষ (Sagittal axis)
২. ফ্রন্টাল অক্ষ (Frontal axis)
৩. লনগিটিউডিনাল অক্ষ (Longitudinal axis)

১. সেজিটাল অক্ষ (Sagittal axis): এই অক্ষ দেহের ভেতর দিয়ে সম্মুখ দিক থেকে পশ্চাৎ দিকে চলাচল করে বলে কম্পনা করা হয়।
এ অক্ষটি ফ্রন্টাল তলের সাথে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত।
সেজিটাল অক্ষের চতুর্দিকে অ্যাবডাকশন ও অ্যাডাকশন সংঘটিত হয়।

২. ফ্রন্টাল অক্ষ (Frontal axis): এই অক্ষ দেহের ভেতর দিয়ে বাম পাশ থেকে ডান পাশে অথবা ডান পাশ থেকে বাম পাশে চলাচল করে বলে কল্পনা করা হয়।
এ অক্ষ সেজিটাল তলের সাথে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত।
এ অক্ষের চতুর্দিকে ফ্লেকশন ও এক্সটেনশন সংঘটিত হয়।

৩. লনজিটিউডিনাল অক্ষ (Longitudinal axis): এই অক্ষ দেহের ভিতর দিয়ে মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত চলাচল করে বলে কল্পনা করা হয়।
এ অক্ষ ট্রান্সভার্স তলের সাথে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত।
এই অক্ষের চতুর্দিকে ঘূর্ণন সংঘটিত হয়ে থাকে। (ভেতরের দিকে ও বাইরের দিকে)

অস্থি সন্ধির চারদিকে পেশীর মৌলিক অবস্থান এর পরিবর্তন (Fundamental Movements around the joints):

১. ফ্লেকশন (Flexion): যখন শরীরের কোনো অঙ্গে পরপর অবস্থিত দুটি অংশ এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে, এদের সন্ধিস্থলে এরা পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে এবং মধ্যবর্তী কোণের মান কমে যায় তখন তাকে ফ্লেকশন (Flexion) বলে।
২. এক্সটেনশন (Extension): এক্সটেনশন হলো ফ্লেকশন বিপরীত অর্থাৎ যখন শরীরের কোনো অঙ্গে পরপর অবস্থিত দুটি অংশ এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে, এদের অস্থি সন্ধিস্থলে এরা একে অপর থেকে দূরে সরে যায় এবং এদের মধ্যবর্তী কোণের মান বৃদ্ধি পায় তখন তাকে এক্সটেনশন (Extension) বলে।
৩. অ্যাবডাকশন (Abduction): যখন শরীরের কোনো একটি অঙ্গ এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে, যা ঐ শরীরের মধ্যবর্তী রেখা থেকে দূরে সরে যায় তখন তাকে অ্যাবডাকশন (Abduction) বলে।
৪. অ্যাডাকশন (Adduction): অ্যাডাকশন হলো অ্যাবডাকশনের বিপরীত। অর্থাৎ যখন শরীরের কোনো একটি অঙ্গ এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে, তা দূর হতে ঐ শরীরের মধ্যবর্তী রেখার কাছে চলে আসে তখন তাকে অ্যাডাকশন (Adduction) বলে।

৫. সারকামডাকশন (Circumduction): সারকামডাকশন হলো ফ্লেক্সন,এক্সটেনশন, অ্যাবডাকশন, অ্যাডাকশন এই ৪টি সঞ্চালনের একত্রিত ফল। যখন শরীরের কোনো অঙ্গ এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে, এটির প্রান্ত ভাগ একটি বৃত্তাকার পথ অনুসরণ করে তখন তাকে সারকামডাকশন (Circumduction) বলে।

৬. রোটেশন (Rotation): যখন শরীরের কোনো একটি অঙ্গ তার লনজিটিউডিনাল অক্ষের চারিদিকে সঞ্চালিত হয় তখন তাকে রোটেশন (Rotation) বা ঘূর্ণন বলে।

(ক) ইনওয়ার্ড রোটেশন (Inward rotation): যখন শরীরের কোনো একটি অঙ্গ তার লনজিটিউডিনাল অক্ষের চারিদিকে এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে, ঐ অঙ্গের সম্মুখভাগ শরীরের ভেতরের দিকে চলে আসে তখন তাকে ইনওয়ার্ড রোটেশন (Inward rotation) বলে।

(খ) আউটওয়ার্ড রোটেশন (Outward rotation): আউটওয়ার্ড রোটেশন হলো ইনওয়ার্ড রোটেশন এর বিপরীত। যখন শরীরের কোনো একটি অঙ্গ তার লনজিটিউডিনাল অক্ষের চারিদিকে এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে, ঐ অঙ্গের সম্মুখভাগ শরীরের বাইরের দিকে চলে যায় তখন তাকে আউটওয়ার্ড রোটেশন (Outward rotation) বলে।

৭. প্রোনেশন (Pronation) : প্রোনেশন হলো কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত অংশের সঞ্চালন। যখন হাতের কনুই হতে কবজি পর্যন্ত অংশ এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে হাতের তালু উপরের দিক হতে ভূমির দিকে চলে আসে তখন তাকে প্রোনেশন (Pronation) বলে।

৮. সুপিনেশন (Supination): সুপিনেশন হলো প্রোনেশনের বিপরীত ধরনের সঞ্চালন। অর্থাৎ যখন হাতের কনুই হতে কবজি পর্যন্ত অংশ এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে হাতের তালু ভূমির দিক হতে ওপরের দিকে চলে আসে তখন তাকে সুপিনেশন (Supination) বলে।

৯. ডর্সি ফ্লেকশন (Dorsi flexion): ডর্সি ফ্লেকশন হলো অ্যাংকেল জয়েন্টের সঞ্চালন। যখন পাদমূল এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে পায়ের পাতার ওপরের পৃষ্ঠ পায়ের নিম্নাংশের সম্মুখপৃষ্ঠের দিকে চলে আসে তখন তাকে ডর্সি ফ্লেকশন (Dorsi flexion) বলে।

১০. প্ল্যানটার ফ্লেকশন (Planter flexion): প্ল্যানটার ফ্লেকশন হলো ডর্সি ফ্লেক্সন এর বিপরীত। যখন পাদমূল এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে পায়ের পাতার উপরের পৃষ্ঠ নিম্নস্থ পায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যায় অর্থাৎ নিচের দিকে চলে যায় প্ল্যানটার ফ্লেকশন (Planter flexion) বলে।

১১. ইনভার্সন (Inversion): ইনভার্সন হলো পাদমূলের সঞ্চালন। যখন পাদমূল এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে পায়ের তলা শরীরের ভেতরের দিকে গমন করে তখন তাকে ইনভার্সন (Inversion) বলে।

১২. এভার্সন (Eversion): এভার্সন হলো ইনভার্সনের বিপরীত। অর্থাৎ যখন পাদমূল এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যে পায়ের তলা শরীরের বাইরের দিকে গমন করে তখন তাকে এভার্সন (Eversion) বলে।

তৃতীয় অধ্যায়: গতিবিদ্যা/গতির ধরন

গতিবিজ্ঞান/গতির ধরন (Kinematics): কিনেমেটিক্স হচ্ছে গতিবিদ্যার একটি শাখা যা গতি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ করে

গতি: সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Motion: Definition and Types)

গতি (Motion): সময়ের সাথে যখন কোনো বস্তু পারিপার্শ্বিক সাপেক্ষে স্বীয় অবস্থানের পরিবর্তন করে অর্থাৎ স্বীয় স্থান ত্যাগ করে তখন তাকে গতি বলে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গতি দেখা যায়- চলার পথের ধরন এবং সময়ের উপর ভিত্তি করে প্রধানত গতি ২ প্রকার যথা ১. জিওমেট্রিক্যাল শ্রেণিবিন্যাস ২. ক্রনোলজিক্যাল শ্রেণিবিন্যাস। খেলাধুলার ক্ষেত্রে সাধারণত জিওমেট্রিক্যাল শ্রেণিবিন্যাস বেশি দেখা যায়। জিওমেট্রিক্যাল শ্রেণিবিন্যাসকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

জিওমেট্রিক্যাল শ্রেণিবিন্যাস (Greometrical classification) ৩ প্রকার।

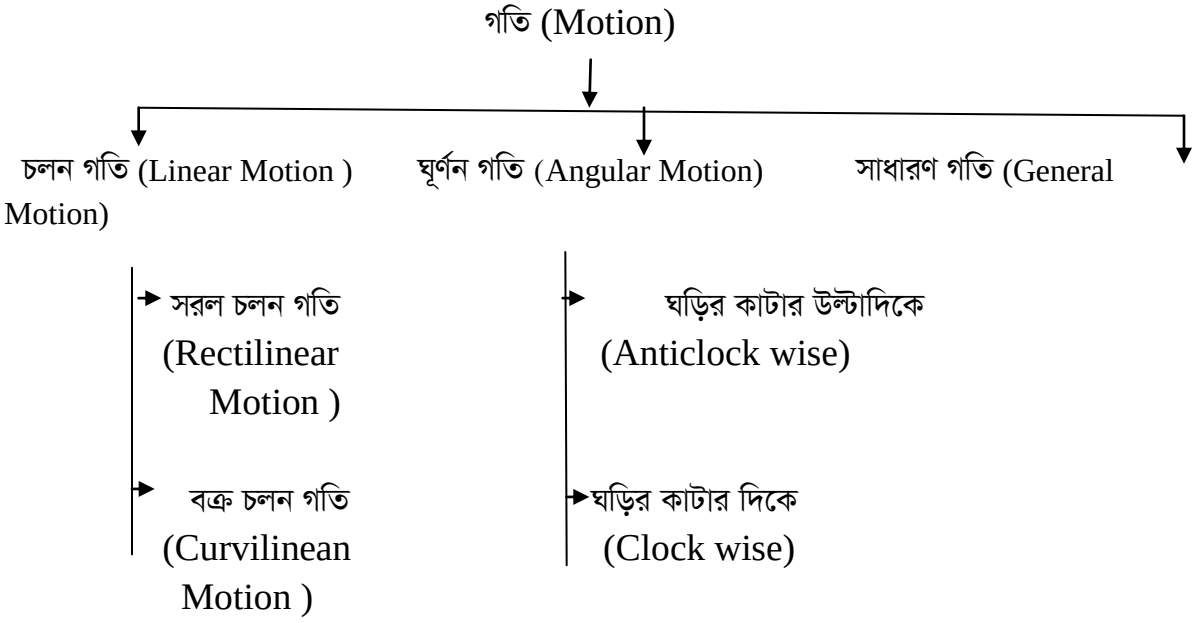

বিভিন্ন প্রকার গতির সংজ্ঞা দাও।

১. চলন গতি (Linear / Translatory motion): যদি কোনো বস্তু এমনভাবে চলতে শুরু করে যে তার প্রতিটি কণা একই দিকে সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তখন তাকে চলন গতি বলে। যেমন ওপর থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো খেলোয়াড়, টোবোগানিং।

চলন গতি দুই প্রকার । যথা (ক) সরল চলন গতি (Rectilinear motion)

(খ) বক্রচলন গতি (Curvilinear motion)

(ক) সরল চলন গতি (Rectilinear motion): যখন কোনো বস্তু সরল পথে এমনভাবে চলতে থাকে যে তার প্রতিটি কণা একই দিকে সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তখন তাকে সরল চলন গতি বলে। যেমন হাঁটার সময় কোনো খেলোয়াড়ের C.g গতি, টোবোগানিং।

(খ) বক্রচলন গতি (Curvilinear motion): যখন কোনো বস্তু বক্রপথে এমনভাবে চলতে থাকে যে তার প্রতিটি কণা একই দিকে সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তখন তার গতিকে বক্র চলন গতি বলে। যেমন বক্রপথে চলন্ত কোনো খেলোয়াড় । যেমন: Long jumper এর take off এর পর total movement path. (in air bone position).

২. ঘূর্ণন গতি (Angular motion): যখন কোনো বস্তু একটি নির্দিষ্ট অক্ষের চারিদিকে এমনভাবে পরিভ্রমণ করে যে, তার প্রতিটি কণা একই দিকে একই সময়ে একই কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করে তখন তার গতিকে ঘূর্ণন গতি বলে। যেমন: জিমন্যাস্টিকস খেলোয়াড়ের Giant circle এর গতি।

৩. সাধারণ গতি/চলন- ঘূর্ণনগতি (General motion/ Transla - Rotatory motion): যখন কোনো বস্তু এমনভাবে চলতে থাকে যে তার চলনগতি ও ঘূর্ণন গতি দুটোই থাকে তখন সেই গতিকে চলন ঘূর্ণন গতি বা সাধারণ গতি বলে। যেমন দৌড়ান, হাঁটা, খেলাধূলা করা ইত্যাদি।

রৈখিক ও কৌণিক গতি সংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় রাশিসমূহ (Kinematic parameters of linear and angular motion): গতির প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য যে রাশিগুলো ব্যবহৃত হয় তারা কিনেমেটিক প্যারামিটার নামে পরিচিত। যে রাশিগুলো রৈখিক গতি ব্যাখ্যা করে তাদের রৈখিক রাশি (Linear Kinematic parameter) এবং যে রাশিগুলো কৌণিক গতি ব্যাখ্যা করে তাদের কৌণিক রাশি (Anguler Kienematic parameter)বলে।

রৈখিক গতি সংক্রান্ত রাশিসমূহ (linear kinematic parameters):

১. দূরত্ব (Distance): যে কোনো দিকে কোনো গতিশীল বস্তু যে পথ অতিক্রম করে তাকে দূরত্ব বলে। দূরত্বের আন্তর্জাতিক একক মিটার বা কিলোমিটার। দূরত্ব একটি অদিক রাশি (যার শুধু মান আছে)।

২. সরণ (Displacement): নির্দিষ্ট দিকে কোনো গতিশীল বস্তুর আদি ও শেষ অবস্থানের মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব হলো সরণ। এর একক মিটার বা কিলোমিটার। সরণ একটি সদিক রাশি (যার মান ও নির্দিষ্ট দিক আছে) ।

৩. দ্রুতি (Speed): কোনো গতিশীল বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে দ্রুতি বলে। দ্রুতির একক মিটার/সেকেন্ড (ms-1) অথবা কিলোমিটার/সেকেন্ড। দ্রুতি একটি অদিক রাশি (যার শুধু মান আছে)।

অতএব ,

$$\text{দ্রুতি} = \frac{\text{দূরত্ব (d)}}{\text{সময় (t)}}$$

উদাহরণ: একজন খেলোয়াড় 50m দূরত্ব 5 sec সময়ে অতিক্রম করে তাহলে,

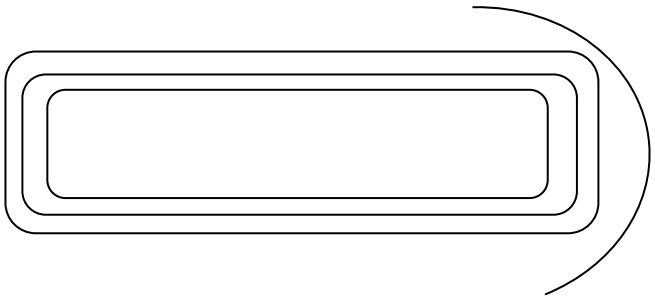

$$\text{দ্রুতি} = \frac{50\text{m}}{5\text{ sec}}$$
$$= 10\text{m / sec}$$

২. বেগ (Velocity): কোনো গতিশীল বস্তু একটি নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ঐ বস্তুর বেগ (Velocity) বলে। বেগের একক মিটার/সেকেন্ড (ms^{-1}) বেগ একটি সদিক রাশি (যার মান ও নির্দিষ্ট দিক আছে) ।

অতএব, বেগ $V = \frac{\text{নির্দিষ্ট দিকে অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{সময়}}$

$$V = \frac{S}{t}\ \text{m / sec (নির্দিষ্ট দিকে)}$$

উদাহরণ: কোনো রানার উত্তর দিকে ২০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ৪ সেকেণ্ড সময়ে অতএব বেগ $V = \frac{20\text{m}}{4\text{ sec}}$ উত্তর দিকে

$$= 5\text{m / sec}\ \text{উত্তর দিকে}$$

৩. ত্বরণ (Acceleration): সময়ের সাথে কোনো গতিশীল বস্তুর বেগ পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে। অর্থাৎ প্রতি একক সময়ে কোনো বস্তু বেগের যে পরিবর্তন হয় তাই ত্বরণ। ত্বরণের একক মিটার/সেকেন্ড 2 (ms^2)

অতএব, ত্বরণ $a = \frac{\text{বেগের পরিবর্তনের হার}}{\text{সময়}}$

$$= \frac{\text{শেষ বেগ - আদিবেগ}}{\text{সময়}}$$

$$a = \frac{v-u}{t}\ (ms\text{-}^2)$$

যেখানে, a = ত্বরণ, v = শেষ বেগ, u = আদিবেগ, t = সময়

কৌণিক গতি সংক্রান্ত রাশিসমূহ (Angular kinematic parameters)

১. কৌণিক দূরত্ব (Angular distance): কোনো ঘূর্ণনশীল বস্তুর আদি ও শেষ অবস্থানের মধ্যবর্তী কোণের মানকেই ঐ বস্তুর কৌণিক দূরত্ব বলে। কৌণিক দূরত্বের একক হলো ডিগ্রি অথবা রেডিয়ান। উদাহরণ: একজন খেলোয়াড় তার পা সামনের দিকে ৬০ ডিগ্রি ওপরে ওঠালে ঐ খেলোয়াড়ের পায়ের কৌণিক দূরত্ব হবে ৬০ ডিগ্রি (ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে)।

২. কৌণিক সরণ (Angular displacement): নির্দিষ্ট দিকে কোনো ঘূর্ণনশীল বস্তুর আদি ও শেষ অবস্থানের মধ্যবর্তী নূন্যতম কৌণিক দূরত্বই হলো কৌণিক সরণ। এটা ঘড়ির কাটার দিকে বা বিপরীত দিকে হতে পারে। কৌণিক সরনের একক ডিগ্রি অথবা রেডিয়ান। কোনো জিমন্যাস্ট ২০০ ডিগ্রি ঘড়ির কাটার দিকে তার হাত সুইং করলে তবে তার কৌণিক সরণ হবে ১৬০ ডিগ্রি অথবা ১৬০ ডিগি এন্টি ক্লক ওয়াইজ।

৩. কৌণিক দ্রুতি (Angular Speed): কোনো ঘূর্ণনশীল বস্তু একক সময়ে যে কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে কৌণিক দ্রুতি বলে। কৌণিক দ্রুতির একক ডিগ্রি/সে. অথবা রেডিয়ান সে.। একজন জিমন্যাস্ট ২ সেকেণ্ড সময়ে ২০০ কৌনিক দূরত্ব অতিক্রম করে।

অতএব,

গড় কৌণিক দ্রুতি $= \frac{200 \text{ ডিগ্রি}}{2 \text{ সেকেণ্ড}}$

$=100$ ডিগ্রি /সেকেণ্ড

৪. কৌণিক বেগ (Angular Velocity): কোনো ঘূর্ণনশীল বস্তু একক সময়ে যে কৌণিক সরণ অতিক্রম করে তাকে কৌণিক বেগ বলে। কৌণিক বেগের একক ডিগ্রি/সে. অথবা রেডিয়ান সে.।

অতএব গড় কৌণিক বেগ $= \frac{\text{কৌণিক সরণ}}{\text{সময়}}$

$$W = \frac{q}{t} \text{ ডিগ্রি / সে:}$$

যেখানে, w= কৌণিক বেগ, q = কৌণিক সরন, t = সময় ।

উদাহরণ: কোনো জিমন্যাষ্ট ২ সেকেণ্ড সময়ে তার displacement হলো160 ডিগ্রি (ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে)

অতএব গড় কৌণিক বেগ, $= \frac{\text{কৌণিক সরণ}}{\text{সময়}}$

$= \frac{160 \text{ ডিগ্রি}}{2 \text{ সেকেণ্ড}}$

$= 80$ ডিগ্রি/সেকেণ্ড (ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে)

৫. কৌণিক ত্বরণ (Angular Acceleration): কোনো ঘূর্ণনশীল বস্তুর কৌণিক বেগের পরিবর্তনের হারকে ঐ বস্তুর কৌণিক ত্বরণ বলে। কৌণিক ত্বরণের একক ডিগি/সে.- 2 অথবা রেডিয়ান / সে.^{2}।

অতএব গড় কৌণিক ত্বরণ $= \frac{\text{কৌণিক বেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}$

$$= \frac{w_f - w_i}{t} \text{ ডিগ্রি / সে.}^2$$

যেখানে, w_f= কৌণিক শেষবেগ, w_i = কৌণিক আদিবেগ, t = সময় ।

রৈখিক ও কৌণিক গতির রাশিসমূহের সম্পর্ক: রৈখিক ও কৌণিক গতির রাশিসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এগুলোকে কয়েকটি সমীকরণের সাহায্যে নিম্নে প্রকাশ করা হলো। এগুলো গতির সমীকরণ নামে পরিচিত।

১. সমবেগে গতিশীল বস্তুর দূরত্বের সমীকরণ ($S=vt/x=x_o+v_xt$)
২. সমত্বরণে গতিশীল বস্তুর শেষবেগের সমীকরণ ($v=v_o+at/v_x=v_{xo}+a_xt$)
৩. সমত্বরণে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বের সমীকরণ ($S=V_ot+^1/_2\,at^2/x=x_ov_xt+\,^1/_2\,a_xt^2$
৪. সমত্বরণে বস্তুর আদিবেগ শেষবেগ ও দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক ($V^2=v^2_o+2as$ বা $V^2_x=V^2_{xo}+2a(x-x_o)$
5. সমত্বরণে বস্তুর tতম সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব ($S_t=V_o+^1/_2\,a(2t-1)$

চতুর্থ অধ্যায়: গতির কারণ (Kinetics)

গতিবিদ্যা (Kinetics)

নিউটনের গতিসূত্রগুলো এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিউটনের গতিসূত্রগুলোর ব্যবহার। (Newton's laws of motion and their application in sports)

১ম সূত্র: বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরলরেখায় চলতে থাকবে। উদাহরণ: একজন দৌড়বিদ তার ব্লকে অবস্থান কালে অর্থাৎ দৌড়ানোর মূহুর্তে যতক্ষণ পযর্ন্ত তার পায়ে কোনো বল প্রয়োগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেখান থেকে সে নড়তে পারবে না। দৌড়ের জন্য তাকে অবশ্যই বল প্রয়োগ করতে হবে।

২য় সূত্র: বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে। উদাহরণ: কোনো বস্তুর উপর যত বেশি বল প্রয়োগ করা যায় বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও ততো বেশি হয়। যেমন, বল্লম নিক্ষেপ খেলায় একজন খেলোয়াড় যত বেশি বল প্রয়োগ করবে ঐ বল্লমটি তত দূর যাবে এবং যে দিকে বল প্রয়োগ করা হবে বল্লমটি ঠিক সেদিকে যাবে।

৩য় সূত্র: প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। উদাহরণ: একজন বাস্কেটবল খেলোয়াড় বলটি বাস্কেটে ফেলার জন্য যখন লাফ দেয় তখন সে মাটিতে তার পায়ের সাহায্যে বল প্রয়োগ করে। ফলে সে মাটির বিপরীত প্রতিক্রিয়ার ফলে ওপরের দিকে ওঠে।

কৌণিক গতির জন্য নিউটনের সূত্রসমূহ:

প্রথম সূত্র: কোনো বস্তুর ওপর টর্ক ক্রিয়াশীল না হলে স্থির বস্তু স্থির অবস্থানে এবং ঘুর্ণনরত বস্তু সমকৌণিক বেগে ঘুরতে থাকবে।

দ্বিতীয় সূত্র: ঘুর্ণনরত কোনো বস্তুর কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তনের হার ঐ বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল টর্কের সমানুপাতিক এবং টর্ক যে দিকে ক্রিয়া করবে ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটবে।

তৃতীয় সূত্র: প্রত্যেক কিয়ামূলক টর্কের একটা সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া মুলক টর্ক আছে

ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিউটনের গতিসূত্রগুলোর ব্যবহার (Application of Newtons laws of motion in sports):

নিউটনের **১ম** সূত্রের ব্যবহার

১। একটি ফুটবল যখন ভূমিতে অবস্থান করবে তখন ফুটবলটি স্থির থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত একজন খেলোয়াড় বলের উপর বল প্রয়োগ না করবে।

২। একটি ঘূর্ণনমান বল যদি ঘুরতে থাকে ঘর্ষণজনিত কারণ এবং বাতাসের বাধাকে বাদ দিলে (পরীক্ষারে পরীক্ষিত অনুসারে) বলটি ঘুরতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত বলের উপর কোনো বল প্রয়োগ না করা হবে।
নিউটনের ২য় সূত্রের ব্যবহার

১। যখন কোনো গলফ বলকে আঘাত করা হয় তখন বলটিকে যেদিকে আঘাত করা হবে সেদিকে বলটি গমন করবে অর্থাৎ বল প্রয়োগের এবং গমনের দিক একই হবে।
২। যখন একই পরিমাণ বল মেডিসিন বল এবং ফুটবলে প্রয়োগ করা হবে তখন ফুটবলে ত্বরণ বেশি সৃষ্টি হবে কারণ ফুটবলের ভর মেডিসিন ভরের চেয়ে কম (ত্বরণের সাথে ভরের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক)।

নিউটনের ৩য় সূত্রের ব্যাবহার
১। যখন একজন অ্যাথলেট দৌড়ায় সে ভূমিতে নিচের দিকে এবং পেছনের দিকে ধাক্কা দেয় এবং সে কারণেই এ্যাথলেট সামনে এবং উপরের দিকে যেতে বাধ্য হয় (ভূমির প্রতিক্রিয়ার কারণে)।
২। একজন সাঁতারু যখন তার স্ট্রোক সম্পন্ন করে তখন পানিতে পিছনের দিকে ধাক্কা দেয় প্রতিক্রিয়া বলের জন্য সাঁতারু সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

বলের ধারণা (Concept of force): নিউটনের প্রথম সূত্র হতে বলের ধারণা পাওয়া যায়। এই বল হচ্ছে টানা বা ধাক্কা। এর কারণে গতি বা স্থিতিতে আসে। বলকে অভ্যন্তরীন(Internal) এবং বাহ্যিক(External) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।
বস্তুর ওপর বল প্রয়োগের প্রভাব(Effect of application of force): বল প্রয়োগে বস্তুর নিম্নলিখিত প্রভাব হতে পারে।
১. স্থির বস্তু গতি প্রাপ্ত হবে।
২. গতিশীল বস্তু স্থির হবে।
৩. বস্তুর দিক পরিবর্তন হবে।
৪. বস্তুর আকার পরিবর্তণ হবে।

পঞ্চম অধ্যায়: মানব শরীরের যান্ত্রিক সুবিধা

মানব শরীরের যান্ত্রিক সুবিধা (Machine function of human body):

লিভার (Lever) সংজ্ঞা, উপাদানগুলো, প্রকারভেদ, যান্ত্রিক সুবিধা, কঙ্কালতন্ত্রীয় লিভার (Definition, components, types, Mechanical functions, Skeletal levers)

লিভার (Lever): লিভার হচ্ছে একটি সরল যন্ত্র এর সাহায্যে কোনো ভারী কাজ খুব সহজেই করা যায়। যা একটি অক্ষের চারিদিকে সঞ্চালিত হয় এবং কোনো বাধাকে অতিক্রম করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা হয়। এটি ভারি কোনো বস্তুকে সহজে তুলতে সাহায্যে করে। যেমন, একটি শাবলকে কাঠের তক্তার সাহায্যে ঠেকা দিয়ে কোনো ভারী বস্তুকে সহজেই তোলা যায়।

লিভারের উপাদানসমূহ (Components of lever): একটি লিভারে তিনটি জিনিস/উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। যথা-

(ক) শক্তি বা প্রয়োগকৃত বল।

(খ) ফালক্রম যার চারিদিকে লিভারটি সঞ্চালিত হয়।

(গ) বাধা যাকে অতিক্রম করা হয়।

লিভারের মূলণীতি (Principle of lever): বলবাহু (Force arm) ভারবাহু (Resistance arm) থেকে যতগুণ বড়ো প্রযুক্ত বলের ততগুণ বেশি ভার লিভার দিয়ে তোলা যাবে। অর্থাৎ প্রযুক্ত বল ততগুণ বৃদ্ধি পাবে। অতএব বল x বলবাহু = ভার x ভারবাহু

বা, $\frac{\text{বলবাহু}}{\text{ভারবাহু}} = \frac{\text{ভার}}{\text{বল}}$

লিভারের সুবিধা: (Benefits of lever)

লিভারের মূলত দুটি সুবিধা

১. বলের সুবিধা (বাধা অতিক্রম করতে কম বলের প্রয়োজন)। বল বাহুর দৈর্ঘ বৃদ্ধি করে এই সুবিধা পাওয়া যায়।

২. গতির সুবিধা: ভার বাহুর দৈর্ঘ বৃদ্ধি করে এই সুবিধা পাওয়া যায়।

লিভারের প্রকারভেদ (Types of lever): ফালক্রাম, বল এবং ভারের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে লিভারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

(ক) প্রথম শ্রেণি (খ) দ্বিতীয় শ্রেণি (গ) তৃতীয় শ্রেণি

(ক) প্রথম শ্রেণির লিভার: যে লিভারে ফালক্রাম, বল ও ভারের মাঝে থাকে তাকে প্রথম শ্রেণির লিভার বলে । যেমন কাচি, নিক্তি।

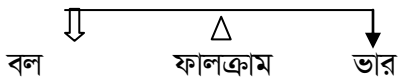

চিত্র নং ০১: প্রথম শ্রেণির লিভার

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার: যে লিভারে ভার, ফালক্রাম ও বলের মাঝে থাকে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার বলে। যেমন যাতি, যাতির দুটি অংশ যে প্রান্তে যুক্ত থাকে সেটিই ফালক্রাম, অন্য প্রান্তে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে বল প্রয়োগ করা হয়। আর ভার পড়ে মাঝে রাখা সুপারির উপর।

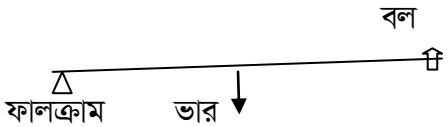

চিত্র নং ০২: দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার

(গ) তৃতীয় শ্রেণির লিভার: যে লিভারে বল থাকে ভার ও ফালক্রাম এর মাঝে তাকে তৃতীয় শ্রেণির লিভার বলে। যেমন চিমটা, চিমটার দুটি বাহু যে প্রান্তে যুক্ত থাকে সেটি ফালক্রাম, মাঝখানে হাত দিয়ে বল প্রয়োগ করা হয় এবং অন্য পাশে থাকে ভারবস্তু কাজেই এটি একটি তৃতীয় শ্রেণির লিভার।

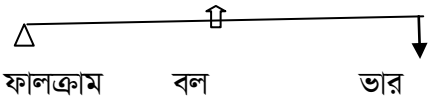

চিত্র নং ০৩ : তৃতীয় শ্রেণির লিভার

যান্ত্রিক সুবিধা (Mechanical Function): কোনো যন্ত্র প্রযুক্ত বলকে যতগুণ পরিবর্তন করে তাকে ঐ যন্ত্রের যান্ত্রিক সুবিধা বলে।

অর্থাৎ যান্ত্রিক সুবিধা $= \frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{বল বাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ভার বাহুর দৈর্ঘ্য}}$

যেমন: যদি কোনো লিভার দিয়ে ৯০০ নিউটন ভার ১০০ নিউটন বল প্রয়োগ করে তোলা যায়, তার যান্ত্রিক সুবিধা হলো ৯। যে যন্ত্রের যান্ত্রিক সুবিধা যত বেশি সে যন্ত্র দিয়ে কাজ করা তত সহজ।

কঙ্কালতন্ত্রীয় লিভার (Skeletal lever): লিভার দ্বারা কাজ করার পদ্ধতি আমাদের মানব শরীরের মধ্যেও দেখা যায়। মানব শরীরে যে সমস্ত লিভার পদ্ধতি দেখা যায় তাকে (Anatomical/ Skeletal lever) কঙ্কালতন্ত্রীয় লিভার বলে। মানব শরীরের হাড়গুলো লিভারের কাজ করে তাই এগুলো skeletal lever নামে পরিচিত।

চাকা ও অক্ষদণ্ড: (সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, যান্ত্রিক সুবিধা, মানবদেহে চাকা ও অক্ষদণ্ডের কার্যক্রম) Wheel and Axle: (Definition, Types, Mechanical function, Wheel and Axle arrangement in human body)

Wheel: Wheel বা চাকা হলো বৃত্তাকৃতির একটি যন্ত্র যা একটি অক্ষের চারিদিকে চলাচল করে।

Axle: Axle হলো দণ্ডাকৃতির যন্ত্র যা চাকার কেন্দ্রে সংযুক্ত থাকে। একে কেন্দ্র করে চাকা ঘোরে।

শ্রেণিবিভাগ : বলের অবস্থা ও প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে Wheel এবং Axle কে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

(ক) ১ম শ্রেণি
(খ) ২য় শ্রেণি

(ক) ১ম শ্রেণি: চাকা ও অক্ষদণ্ডের বলটা মূলত চাকার উপর প্রয়োগ করা হয়।

(খ) ২য় শ্রেণি: চাকা ও অক্ষদণ্ডের বলটা মূলত দণ্ডের উপর প্রয়োগ করা হয়।

মানবদেহে Wheel ও Axle এর যান্ত্রিক কার্যক্রম (Mechanical function of wheel and Axle): চাকা এবং অক্ষদণ্ড সাধারণত যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। ইহা লিভারের সাধারণ মূলনীতি অনুসারে কাজ করে এবং কাজকে সহজ করে।

উদাহরণ: চাকাকে ব্যবহার করে কোনো কঠিন কাজকে সহজ করা যায়। অর্থাৎ কুয়া থেকে পানি তোলার জন্য যেমন কপিকল ব্যবহার করা হয়।

মানবদেহে Wheel ও Axle এর ব্যবস্থাপনা (Wheel and Axle arrangement in human body):

আমাদের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ Wheel এবং Axle এর সাথে জড়িত যার বেশির ভাগই ঘূর্ণায়মান অবস্থায় চলাচল করে। যেমন: মাথা ঝুকানো হাতের বাহিরে এবং ভেতরে ঘুরানো খুব ভালো উদাহরণ হিসাবে কাজ করে। যা আমাদের শরীরের চাকা এবং অক্ষ হিসেবে বিন্যাস করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ভারসাম্য

ভারসাম্য (Equilibrium)

সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, ভারসাম্যের উপাদান (Definition, Types, and Condition of equilibrium)

ভারসাম্য (Equilibrium): কোনো বস্তু পড়ে না গিয়ে স্বীয় অবস্থানে স্থির থাকলে বা স্বীয় অবস্থান ধরে রাখাকে ভারসাম্য বলে।

ভারসাম্যের অবস্থা (Condition of equilibrium)

ভারসাম্যকে সমতা বা সাম্যবস্থাও বলা যেতে পারে। আর ভারসাম্যের পরিমাণই হলো স্থায়িত্ব বা স্থিরতা। কোনো বস্তুর স্থায়িত্ব যত বেশি সে বস্তু তত স্থির বা দৃঢ়বদ্ধ থাকে খুব সহজে স্থানচ্যুত করা যাবে না। ভারসাম্য সাম্যতা বা স্থায়িত্বের বিষয়টি যান্ত্রিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রত্যেক খেলাতেই এককভাবে বা বিভিন্ন ভারসাম্যের প্রয়োজন।

Moment M = Fd

এখানে, F=Force

d= Distance

M= Moment

Moment = বল x বল হতে বস্তুর লম্ব দূরত্ব

সাম্যাবস্থায় বস্তুর যান্ত্রিক অবস্থা: সাম্যাবস্থায় কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগকৃত বলের লব্ধি শূন্য হবে।

$\Sigma Fi = o$ এবং $\Sigma Mi = o$ / $\Sigma F_i=0$ এবং $\Sigma M_i=0$

এখানে, Σ = sum

F=Force

M = Moment

$i = 1,2,3$..... প্রয়োগকৃত ভর।

প্রকারভেদ (Types of equilibrium): ভারসাম্যের অবস্থান ৩ প্রকার।

১। অপরিবর্তনশীল ভারসাম্য (Stable equilibrium)

২। পরিবর্তনশীল ভারসাম্য (Unstable equilibrium)

৩। নিরপেক্ষ ভারসাম্য (Neutral equilibrium)

১। অপরিবর্তনশীল ভারসাম্য: বস্তুর ওপর হতে Imbalance force সরিয়ে নিলে বস্তু যখন আগের অবস্থানে ফিরে আসবে তখন সে বস্তুর ভারসাম্যকে অপরিবর্তনশীল ভারসাম্য বলে। উদাহরণ- মানব দেহের শায়িত অবস্থা।

১. ২। পরিবর্তনশীল ভারসাম: বস্তুর ওপর হতে Imbalance force সরিয়ে নিলেও বস্তু যখন আগের অবস্থানে ফিরে আসে না তখন সে বস্তুর ভারসাম্যকে পরিবর্তনশীল ভারসাম্য বলে। উদাহরণ: দৌড় শুরু জন্য সেট অবস্থা।

৩। নিরপেক্ষ ভারসাম্য: বস্তুর ওপর হতে বাহিক্য বল সরিয়ে নিলে বস্তু একটি নতুন অবস্থানে পৌঁছে যাবে তখন তাকে বস্তুর নিরপেক্ষ ভারসাম্য বলে। উদাহরণ: মানব দেহের গড়াগড়ি/ রোলিং অবস্থা

ভারসাম্যের প্রভাবিত উৎপাদক (Factors affecting Equilibrium / degree of stability):

(ক) বস্তুর দখলকৃত স্থান তার ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে।

(খ) ভূমি হতে বস্তুর C.G এর উচ্চতার উপর নির্ভর করে।

(গ) বস্তুর ভরের ওপর নির্ভর করে।

(ঘ) বস্তুর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত Vertical line এর অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।

ক) বস্তুর দখলকৃত স্থান বেশি হলে অর্থাৎ বেশি জায়গা দখল করলে ভারসাম্যও বেশি হবে

খ) ভূমি হতে বস্তুর CG এর উচ্চতা বেশি হলে ভারসাম্য কম হবে। CG এর উচ্চতা কম হলে তার ভারসাম্য বেশি হবে

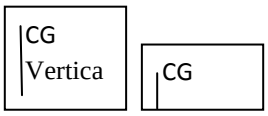

p_1 p_2 এখানে অধিক ভারসাম্য অবস্থা।

গ) বস্তুর ভরের সাথে সাম্যবস্থা বা ভারসাম্য সমানুপাতিক। ভর বেশি হলে ভারসাম্য বেশি হবে।

ঘ) বস্তুর মধ্যদিয়ে অতিক্রান্ত Vertical line এর ওপর ভারসাম্য নির্ভর করে Vertical line টি যদি বস্তুর উপর দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে তা অধিক ভারসাম্যমান হবে। C.G থেকে যতোদূর দিয়ে Vertical line অতিক্রম করবে ভারসাম্য ততো কমতে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

1. Alberto, A. 1978. Biomechanics of Sports Games and Sports Activities. Proceedings of an International Seminar. Wingate Institute fir Physical Education and Sports.
2. Dyson, J. 1977. The Mechanics of Athleties, University of London Press Ltd, London.
3. Hay. J.G. 1973. Biomechanics of Sports Techniques, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
4. Miller D.I. and Nelson R.C.1973. Biomechanics of Sports: Lee and Febiger, Philadelphia.
5. Susan, J.H. 1991. Basic Biomechanics, Mosby Year Book. Inc. St. Louis.
6. Winter, D.A. 1979. Biomechanics of Human Movement. John Wiley & Sons. Inc. Canada.
7. Zatsioresky, V. and Seluyanov. 1986. The Mass and Inertia Charecterstics of the Main Segments of Human Body. Biomechanics VI- B Human Kinetics. Champaign, Il.
8. Zatsioresky, V. 1998. Kinetics of Human Motion. Human Kinetics, champaign, Il.

সাইন্স অব স্পোর্টস ট্রেনিং

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত স্নাতক (বি-স্পোর্টস) শ্রেণির সিলেবাস অনুযায়ী প্রণিত।

মোহাঃ শফিকুল ইসলাম

বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (মনোবিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস সাইকোলজি (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ও
স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট (ক্রীড়ামনোবিজ্ঞান বিভাগ)
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)
জিরানী, সাভার, ঢাকা ।

মুখবন্ধ

শারীরিক শিক্ষাও ক্রীড়া বিজ্ঞানের জন্য সাইন্স অব স্পোর্টস ট্রেনিং বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত স্নাতক (বি-স্পোর্টস) শ্রেণির সিলেবাস অনুযায়ী বইটি প্রণিত হলেও ক্রীড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য ছাত্র/ছাত্রীরা বইটি পড়ে উপকৃত হবে। কারণ এই বিষয়ে এর আগে অন্য কেউ বাংলা বই প্রণয়ন করেননি। ছাত্র/ছাত্রীদের বিশেষ সুবিধার কথা বিবেচনা করে এবং তাদের কাছে বিষয়টি আকর্ষণীয় ও সহজতর করার জন্য বইটির বিষয়বস্তুসমূহ সহজভাবে উপস্থাপন করেছি। ক্রীড়া বিজ্ঞানের এই বিষয়ে বাংলাভাষার কোন বই না থাকায় ইংরেজি ভাষার বই থেকে অনুবাদ করে বইটি সহজভাবে লেখার চেষ্টা করেছি। সেক্ষেত্রে অনুবাদের ক্ষেত্রে সামান্য ভূলত্রুটি থাকতে পারে। আশা করি পাঠকবৃন্দ এ ব্যাপারে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বিকেএসপির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যারা আমাকে বইটি লেখার জন্য নির্বাচিত করেছেন তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার সহকর্মী নুসরাৎ শারমীন (সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা) বইটি লেখার ব্যাপারে সর্বোত্তম সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করায় তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বইটি লেখার জন্য উৎসাহ প্রদান করায় আমার সহকর্মীবৃন্দ বিকেএসপির মোঃ বখতিয়ার (সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা), আবু তারেক (সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা) ও সাদেকা ইয়াসমীনকে (গবেষণা সহযোগি) অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাছাড়া বইটি লেখার সহযোগিতা করার জন্য আমার পত্নী তাছলিমা খাতুন ও প্রাণপ্রিয় একমাত্র পুত্র মুহতাসিম ফুয়াদ সৌখিনের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বইটি রচনার জন্য লেখকদের যে সব লেখা বইয়ের সাহায্য নিয়েছি তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে যারা সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সর্বপরি যাদের উদ্দেশ্যে বইটি লেখা হয়েছে তারা উপকৃত হলে আমার লেখা সার্থক হবে বলে মনে করি। বইটি প্রথম লেখার কিছু ভূলত্রুটি থাকতে পারে এজন্য সংশোধনের জন্য সকলের সুচিন্তিত পরামর্শ ও আন্তরিকতা কামনা করছি।

মোহাঃ শফিকুল ইসলাম
২২/০৯/২০১৫

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়----------৯৬
ভূমিকা
দ্বিতীয় অধ্যায়----------১০২
প্রশিক্ষণ লোড
তৃতীয় অধ্যায়----------১০৯
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

চতুর্থ অধ্যায়----------১১৪
ফিটনেস বা সক্ষমতা
পঞ্চম অধ্যায়----------১২১
কৌশল প্রশিক্ষণ
ষষ্ট অধ্যায়----------১২৩
প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা
সহায়ক গ্রন্থাবলি

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা
(Introduction)

গত কয়েক দশক থেকে সারা বিশ্বে ক্রীড়া অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রীড়ার জনপ্রিয়তা দিন দিন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক অলিম্পিক গেমসের প্রথম দিকে গুটি কয়েকটি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করত, কিন্তু বর্তমান অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতা প্রতিটি দেশে,খেলাধূলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। প্রত্যহ নতুন নতুন খেলা যোগ হচ্ছে। বলা যায় অলিম্পিক গেমস সারা বিশ্বে খেলার জোয়ার এনে দিয়েছে। টেলিভিশন ও বিভিন্ন প্রেস মিড়িয়া খেলাধুলার নিউজকে সারাবিশ্বে মানুষের কাছে পৌছে দিচ্ছে, ফলে জনপ্রিয়তা আরও প্রকোপ হচ্ছে।

ক্রীড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ মানব সমাজে যেসব কল্যাণমূলক কাজে জড়িত সেগুলো নিম্নরূপ-

* মানুষের ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ব্যাপক ভূমিকা রাখে।
* মানুষকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ রাখতে এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
* আঘাত প্রাপ্ত, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধিদের পুনঃবাসন ও সামাজিক অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
* বিভিন্ন জনগণ, প্রথা, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।
* মানব দেহের বিভিন্ন রোগব্যাধি প্রতিকার ও প্রতিরোধ ক্রীড়া প্রশিক্ষণের অবদান অনিস্বীকার্য।
* বিভিন্ন জনগণ ও জাতির একে অপরের মধ্যে স্বাস্থ্য ভাল রাখার মনোভাব তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সৃষ্টি করছে।

ক্রীড়া প্রশিক্ষণ
(Sports Traning)

ক্রীড়া প্রশিক্ষণ হল এমন একটি বিষয় যেখানে একজন খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ পারফরমেন্স অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংযুক্ত থাকে। ক্রীড়া পারফরমেন্স বিভিন্ন ধরনের অনুশীলন ও নিয়মিত কার্য সম্পাদনের উপর নির্ভর করে। শুধু মাত্র অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স অর্জন করা সম্ভব নয়। অনুশীলনের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় ক্রীড়া পারফরমেন্সের উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- প্রশিক্ষণের লোড।
- রিকভারি।
- কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা ও লোড গ্রহণের মাত্রা।
- ক্রীড়া সামগ্রী।
- পুষ্টি।
- মানসিক বৈশিষ্ট্যবলি ও কিছু তত্ত্বীয় নির্দেশনাবলি।

নিম্নে ক্রীড়া প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা প্রদান করা হল

ক্রীড়াক্ষেত্রে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যাতে নির্দিষ্ট খেলায় বা ইভেন্টে একজন খেলোয়াড় পরিকল্পিত ও পদ্ধতিগত ভাবে তার সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স দেখাতে পারে কিংবা দেখানোর জন্য প্রস্তুত থাকে।

Matuisew (1981) এর মতে "Sports training is the basic form of preparation of sportsmen".

Martin (1979) এর মতে "Sports training is a planed and controlled process in which for achieving a goal, change in complex sports motor performance ability to act end".

ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য অন্য শব্দ দুটি অর্থাৎ কনডিসনিং ও কোচিং এই সম্পর্কে ধারনা থাকার প্রয়োজন রয়েছে।

কনডিসনিং **(Conditioning)**

ইহা হল এমন এক প্রক্রিয়া যা দৈহিক কর্ম সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তোলা। অর্থাৎ শারীরিক ও মটর ফিটনেস এর উপাদান সমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে (শক্তি, গতি, দম, নমনীয়তা ও সমন্বয় ক্ষমতা)।

কোচিং(Coaching)

Coaching বলতে নির্দিষ্ট খেলায় সর্বোচ্চ নৈপূণ্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শারীরিক ও মানসিক কলা-কৌশল রপ্ত করাকে বুঝায়।

ক্রীড়া প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
(Aims and Tasks of Sports Training)

ক্রীড়া প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হলো হল একজন খেলোয়াড়কে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশেষ করে কোন প্রতিযোগিতার সময় সর্বোচ্চ পারফরমেন্স অর্জনের জন্য তৈরি করা। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য।

ক) ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন (Development of Personality).
খ) শারীরিক প্রস্তুতি (Physical Preparation).
গ) টেকনিক্যাল প্রস্তুতি (Technical Preparation).
ঘ) কৌশলগত প্রস্তুতি (Tactical Preparation).
ঙ) বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি (Intellectual Preparation).

ক) ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন
(Development of Personality)

উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খেলোয়াড়ের মাঝে ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে যা সাফল্যের জন্য একান্ত আবশ্যক। সেজন্য খেলোয়াড়কে উন্নত প্রশিক্ষণ ও বড় মাপের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে যেন সে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং বুদ্ধিগত ভাবে উন্নতি লাভ করে। পদ্ধতিগত ও পরিকল্পনা মাফিক পারফরম্যান্স যত ভাল হয় কৌশলী প্রশিক্ষণের মাত্রা তত বৃদ্ধি পায়।

খ) শারীরিক প্রস্তুতি
(Physical Preparation)

সম্পূর্ণ দৈহিক প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন গুণাবলীর উন্নয়ন যেমন- শক্তি, দম, গতি, নমনীয়তা ও সমন্বিয়ত দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচিত হয় । প্রশিক্ষণের মাধ্যসেই এসব দৈহিক গুণাবলী পৃথক পৃথকভাবে এবং একটির সাথে অপরটির সমন্বয় ঘটিয়ে সার্বিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয় । এসব গুণাবলী ভাল পারফর্মেন্সের জন্য অবশ্যক । সুতারাং এসব গুণাবলী অর্জন করতে এবং আশা ব্যঞ্জক পর্যায়ে উন্নীত করতে বেশি পরিমান সময় ব্যয় করতে বিভিন্ন খেলায় বিভিন্ন দৈহিক গুণাবলীর প্রয়োজন হয়। খেলার ধরন অনুযায়ী যখন যে গুণটির উন্নতি সাধন প্রয়োজন প্রক্ষিণের মাধ্যমে সে গুণটি রপ্ত করা যায়।

গ) টেকনিক্যাল প্রস্তুতি
(Technical Preparation)

দক্ষতা অর্জনের সাথে ভাল পারফর্মেন্সের সরাসরি সংযোগ রয়েছে । যত বেশি দক্ষতা তত ভাল পারফর্মেন্স। দক্ষতা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে হলে একজন অবশ্য টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। পরিপুর্ণ কৌশল আয়ত্ত করতে পারলে শক্তির অপচয়ও কম হয়।

ঘ) কৌশলগত প্রস্তুতি
(Tactical Preparation)

কৌশল বলতে অর্জিত দক্ষতাকে বুদ্ধিমত্তা বা সৃজনশীলতার মাধ্যমে যথাযথা প্রয়োগ করাকেই বুঝায়। প্রতিযোগিতার নিয়ম-নীতির জ্ঞান, কৌশলী ধারণা ও দক্ষতা পরিপূর্ণ জ্ঞান কৌশল প্রশিক্ষণের পূর্বশর্ত। কৌশলী জ্ঞান একেক খেলায় একেক রকম। দলীয় খেলায় কৌশলী জ্ঞান বেশি প্রয়োজন একক খেলার তুলনায়।

ঙ) বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি
(Intellectual Preparation)

একজন খেলোয়াড়ের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি হল ক্রীড়া প্রশিক্ষণের তত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণের আধুনিক উপায়, পদ্ধতি এবং কৌশল খুঁজতে হবে। খেলোয়াড়কে বিরামহীন ভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগ্রহ ধরে রাখতে হবে এবং কঠিন প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখতে হবে।

ক্রীড়া প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of sports training)

১। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বলতে নির্দিষ্ট খেলায় ব্যক্তির সর্বোচ্চ পারফরমেন্স প্রদর্শনের প্রবণতাকে বুঝায়।
২। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া।
৩। ক্রীড়া প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতামূলক খেলায় চাহিদা অনুযায়ী খেলোয়াড়ের জীবনধারা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন পড়ে।
৪। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগত ও পরিকল্পিত হয়ে থাকে।
৫। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান ভিত্তিক।

৬। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ খেলোয়াড়দের অধিক আত্ন নির্ভরশীল (Self-reliance) হিসেবে গড়ে তোলে।
৭। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ একটি শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া।

ক্রীড়া প্রশিক্ষণের গুরুত্ব
(Important of Sports Training)

- ক্রীড়া প্রশিক্ষণের একটি সেতুর ন্যায়, যা ক্রীড়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, স্পোর্টস ও গেমসের সাথে সংশ্লিষ্ট।
- ইহা ক্রীড়া বিজ্ঞান, স্পোর্টস ও গেমসের ভিতরে জ্ঞান বিতরণের জন্য ফিল্টারের ন্যায় করে।
- ইহা ক্রীড়া প্রশিক্ষণের তত্ত্ব এবং পদ্ধতি উন্নতিতে সহায়তা করে যাতে প্রশিক্ষণার্থীদের পারফরম্যান্স নিশ্চিত হয়।
- ক্রীড়া প্রশিক্ষণ একটি শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ যা প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে সহায়তা করে।
- ইহা স্বল্প মেয়াদি ও দীঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করতে সহায়তা করে।
- ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীদের পারফরম্যান্স উন্নতির জন্য মটর ফিটনেসের উপাদানগুলো উন্নতির সহায়তা করে যাতে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যায়।
- ক্রীড়া প্রশিক্ষণের বয়স এবং নারী পুরুষভেদে ফিজিক্যাল ফিটনেসের উপাদানগুলো উন্নতির ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি নির্বাচনের জন্য সহায়তা করে।
- ইহা নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র এবং অভিযোজননের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
- ইহা লোড এবং রিকভারির অনুপাত নির্ণয়ে সহায়তা করে।
- ইহা প্রশিক্ষণ সময়কে বিভিন্ন পিরিয়ডে ভাগ করতে এবং বিভিন্ন পিরিয়ড প্রতিযোগিতার মাত্রা অনুযায়ী সঠিক ভাবে নির্বাচন করতে সহায়তা করে।
- ক্রীড়া প্রশিক্ষণ দক্ষতা অর্জন এবং দক্ষ প্রশিক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে।
- ইহা কৌশলগত ধারনা এবং সেগুলো প্রতিযোগীতার সময় ব্যবহার করতে সাহায্য করে।
- ইহা মেধাবী খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
- ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রতিযোগীতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করতে এবং সেগুলো পারফরম্যান্স বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
- ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের সেশন প্রস্তুতিতে সাহায্য করে।
- প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মূল্যায়ণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ সাহায্য করে।

ক্রীড়া প্রশিক্ষণের মূলনীতি
(Principles of Sports Training)

ক্রীড়া প্রশিক্ষণের মূলনীতিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল

১। বিরতিহীন প্রশিক্ষণের নীতি
(The Principle of Uninterrupted Training)

ক্রীড়া প্রশিক্ষণ সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস বিরতিহীন ভাবে চলতে থাকে। বিরতিহীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পারফরমেন্স অর্জিত হবে এমন কোন গ্যারান্টি নেই। তবে প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি পাবে। তবে সঠিক ভাবে পরিমাপ করে বিরতি দেওয়া যেতে পারে। আবার বেশি বিরতি দিলে প্রশিক্ষণার্থীর পারফরমেন্স বাধাগ্রস্থ হতে পারে।

২। ধারাবাহিক লোড বৃদ্ধির নীতি
(The Principle of Steadily Increasing Load)
প্রশিক্ষণার্থীর পারফরমেন্স বৃদ্ধির জন্য পর্যায়ক্রমে লোড বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীর পারফরমেন্স বৃদ্ধির জন্য লোডের সাথে সাথে অভিযোজন বৃদ্ধি পায়। একই পরিমান লোড না দিয়ে ধারাবাহিকভাবে লোডের পরিবর্তন করা যেতে পারে। কারণ দীর্ঘ দিন একই পরিমান লোড দিলে প্রশিক্ষণার্থীর পারফরমেন্স কমে যেতে পারে। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থী একঘেয়েমি বোধ করতে পারে।

৩। ব্যক্তিগত লোডের নীতি
(The Principle of Individual Load)
প্রশিক্ষণার্থীকে লোড দেওয়ার পূর্বে ব্যক্তিগত লোডের নীতি অনুসরণ করতে হবে। কারণ একজন ব্যক্তি লোড গ্রহণের ক্ষমতা অন্য ব্যক্তি হতে আলাদা। লোড প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীর বয়স, মেধা, মানসিক কিছু বৈশিষ্ট্যবলী যেমন: ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, মেজাজ, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা, লোড গ্রহণের ক্ষমতা, রিকভারির সক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।

৪। প্রশিক্ষণের বিরতির নীতি
(The Interval Principle)
বেশির ভাগ অভিযোজন তখনই ঘটে যখনই লোড এবং রিকভারির মধ্যে সঠিক সমন্বয় করা হয়। রিকভারির সময় দীর্ঘ হবে না সংক্ষিপ্ত হবে তা লোড প্রদানের সমান অনুপাতের উপর নির্ভর করে। তবে বেশি বিরতি দিলে প্রশিক্ষণার্থীর পারফরমেন্স বাধাগ্রস্থ হতে পারে।

৫। প্রশিক্ষণার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের নীতি
(The Principle of Active Participation)
প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাথে প্রশিক্ষণার্থীর যদি সংযোগ বা অংশগ্রহণ থাকে তা হলে উক্ত প্রশিক্ষণের প্রতি তাদের অধিক আন্তরিকতা বৃদ্ধিপায়। ফলে তারা অধিক পরিশ্রমী হয়ে কাজ সম্পুর্ন করার চেষ্টা করে।

৬। ক্রিটিক্যাল লোড ব্যবহারের নীতি
(The Principle of Use of Critical Loads)
প্রশিক্ষণার্থীর প্রতিযোগীতার চাহিদার উপর নির্ভর করে অনেক সময় বেশি মাত্রায় লোড প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণত বছরে ৪ থেকে ৫ বার এ ধরনের লোড প্রয়োগ করতে হয়। তবে এ ধরনের লোড প্রয়োগের ক্ষেত্রে লোড প্রয়োগ এবং রিকভারির যেন সঠিক সমন্বয় হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৭। সাধারণ এবং বিশেষ প্রস্তুতির নীতি
(The Principle of General and Special Preparation)
প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ ও বিশেষ নীতি অনুসরণ করতে হয়। সাধারণ নীতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের ভিত্তি তৈরি হয় আর বিশেষ নীতির মাধ্যমে পারফরমেন্স উন্নতি হয়।

৮। স্বচ্ছতার নীতি
(The Principle of Clarity)

প্রশিক্ষণার্থীর সর্বোচ্চ পারফমেন্সের জন্য যে সকল কর্মসূচি ও তথ্য প্রদান করা হয় সেগুলো অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা সহজে বুঝতে পারে।

৯। প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার চক্রের নীতি
(The Principle of Cyclic Process of Training)

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে দীর্ঘতম ও স্বল্পতম হিসেবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।
চক্রগুলো হল নিম্নরুপ:
ক) ক্ষুদ্রতম চক্র: এই চক্রের সমকাল তিন থেকে বার মাস।
খ) মাঝারি চক্র: এই চক্রের সময়কাল তিন থেকে ছয় সপ্তাহ।
গ) অতি ক্ষুদ্র চক্র: এই চক্রের সময়কাল তিন থেকে দশ দিন।

১০। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার নীতি
(The Principle of Processing Sports of Training)

ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এমনভাবে করতে হবে যেন আসল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। কষ্টের প্রচেষ্টা ও সময় ব্যয় করার পরও যদি প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স অর্জিত না হয় তাহলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রতি প্রশিক্ষণার্থীর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ফলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশিক্ষণ লোড

(Training Load)

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে শারীরিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে কিছু লোড প্রদান করা হয়। যার ফলে ক্লান্তি আসে। এ ক্লান্তি মূলত শারীরিক অনুশীলনের মাধ্যমে আসে। এ ক্লান্তি খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স বৃদ্ধির জন্য খুব প্রয়োজন।

শারীরিক ও মানসিক চাহিদার ক্ষেত্রে যে লোড প্রদান করা হয়, যার ফলে খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও বৃদ্ধি পায় তাকেই প্রশিক্ষণের লোড বলা হয়।

প্রশিক্ষণের লোডের প্রকারভেদ(Types of Training Load)

প্রশিক্ষণ লোড দুই প্রকার যথা:

১। বাহ্যিক লোড (Outer Load)

২। অভ্যন্তরীণ লোড (Inner Load)

প্রশিক্ষণ লোডের উপাদান বা ফীচার

(Factors or Features of Training Load)

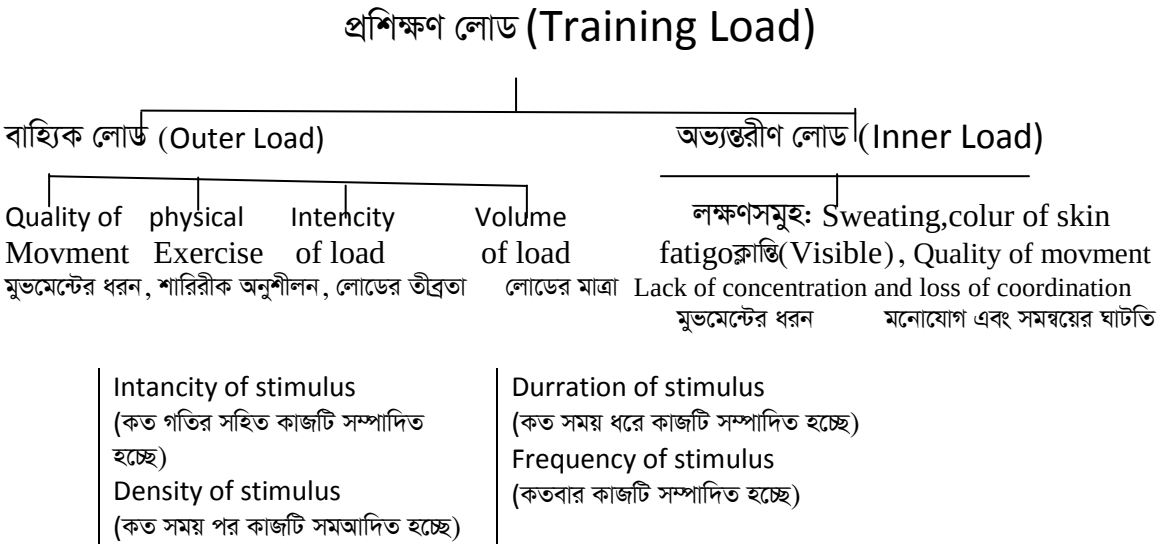

Intancity of stimulus (কত গতির সহিত কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে) Density of stimulus (কত সময় পর কাজটি সমআদিত হচ্ছে)	Durration of stimulus (কত সময় ধরে কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে) Frequency of stimulus (কতবার কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে)

অভিযোজন প্রক্রিয়া

(Adaptation process)

আক্ষরিক অর্থে Adaptation বা অভিযোজন বলতে খাপ-খাইয়ে নেওয়াকে বুঝায়। মানুষের শরীরের এক অদ্ভূত ক্ষমতা রয়েছে যা তাকে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। কথায় বলে শরীরের নাম মহাশয় যাহা সহায় তাহাই সয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে সময় পরিক্রমায় মানুষের দেহ ও ক্রমশ খাপ খাইয়ে নিতে পারে। অভিযোজনের এই বিষয়টা ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। কোন প্রশিক্ষণার্থীকে যখন বাহ্যিক ভাবে লোড দেয়া হয় তখন মানব শরীর সেদিকে অভিযোজন করে নিতে সক্ষম হয়। বাহ্যিক লোড় প্রয়োগের ফলে একজন খেলোয়াড়ের পারফরমেন্সের উন্নয়ন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে লোড এর অভিযোজন ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং পাশাপাশি অবস্থান করে।

অভিযোজন একটি জৈব রাসয়নিক প্রক্রিয়া (Bio-Chemical Process) এবং এটি কিছু শর্তযুক্ত ক্ষমতা যেমন- শক্তি (Strength), গতি (Speed) ও দম (Endurance) প্রভৃতি উন্নতির জন্য প্রয়োগযোগ্য । একজন খেলোয়াড়কে অবশ্য প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শারীরিক শক্তি প্রদর্শন কতে হয়। কেননা এটাই তাদের প্রধান কাজ। কঠিন শারীরিক কসরত করতে গেলে শরীরের ভিতর Homeostasis বা শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের (Internul body balance) এক ধরণের বাধা (Disturbance) দেখা দেয়। কিন্তু খেলোয়াড়টি যদি বার বার এই বাধাটি তৈরি হয় তবে শরীর সেটি সয়ে নিতে কিংবা খাপ-খাইয়া নিতে নতুন করে তার Homeostasis তৈরি করে এবং সে তার কাঠামো ও Metabolic ক্ষেত্রে ও পরিবর্তন আনে। ফলে অতিরিক্ত লোড সহ্য করতে পারে। উদাহরণস্বররূপ- বৃষ্টিতে ভিজলে সাধারণত মানুষের সর্দি জ্বর হয়। একজন ব্যক্তি এমন একটি পেশা বেছে নিল যেখানে তাকে বৃষ্টিতে ভিজতে হচ্ছে, পানিতে নেমে কাজ করতে হবে। তখন কিন্তু তার সর্দি জ্বর তেমন হবে না। তেমনি রৌদ্র সহ্য করতে পারে না এমন কেউ যখন ক্রিকেট খেলবে তখন একসময় রৌদ্র তার কাছে সহনীয় হয়ে যাবে।

প্রতিটি প্রশিক্ষণ ইউনিটে খেলোয়াড়রা ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ব্যায়াম করে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন খেলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যায়ামের প্রয়োজন হয়। অভিযোজনের এই প্রক্রিয়াটি মানব শরীরের সমগ্র তন্ত্রের পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

শরীরের মাংসপেশীতে যে পরিমান শক্তি সঞ্চিত থাকে, মাংসপেশীর সংকোচন প্রসারণের তার ক্ষয়িত হতে থাকে। এ সময় শরীরের এনজাইম ও হরমোনগুলো ক্রিয়াশীল হয় এবং একসময় শক্তি নিঃশেষিত হয়। ক্রমাগত ক্ষয়ে শরীর এক পর্যায়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। এরপর যখন রিকভারি পর্ব শুরু হয় তখন শরীরে শক্তি আবার সঞ্চিত হয়। কিন্তু বিরতির পর আবার ক্রমাগত পেশি চালনা করলে সেটিও একসময় নিঃশেষিত হয়ে যায়। আবার রিকভারি এবং আবার পূর্ণ সঞ্চিত হয় এটা অনেকটা ঢেউয়ের মত চলতে থাকে।

১০ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের নির্ধারিত ব্যায়ামগুলো করে যেতে হবে। একসময় পারফরমেন্সের লেভেলটি Supercompensation পর্যায়ে উন্নতি হবে। যে লোডটির মাধ্যমে পারফরমেন্সের লেভেল Supercompensation পর্যায় পৌছে চেষ্টা হলো Standard । তবে লোড এই পর্যন্ত ধরে রাখলে হবে না। পরবর্তীতে ধাপে লোড এর পরিমাণ বাড়াতে হবে। আবার Supercompensation একটি ধাপে আসবে। সেটি হবে সে সময়ের Standard অভিযোজনের প্রক্রিয়া সবসময় একই রকম শারীরিক পন্থায় রাখলে উন্নতি হবে না। ভারসাম্য ও দক্ষতার সাথে সাথে শারীরবৃত্তিয় পন্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

পারফরমেন্সের উপর অনিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রভাব

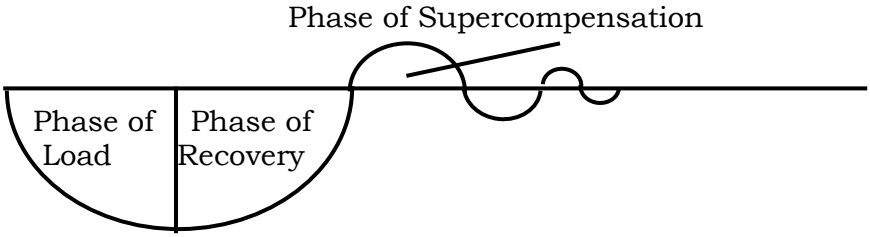

চিত্র .১. প্রশিক্ষণ লোডের অভিযোজন

পারফরমেন্সের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রভাব

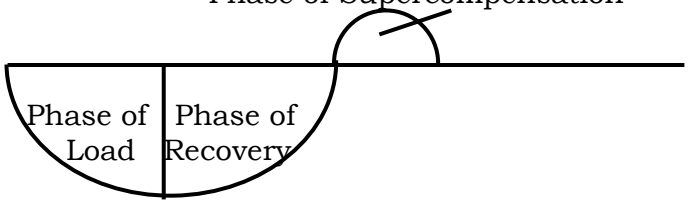

চিত্র .২. প্রশিক্ষণ লোডের অভিযোজন

সরলরেখায় মত করে লোড বৃদ্ধি
(Linear increase in load)

সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে লোড বৃদ্ধি
(Increasing load in the form of staircas)

চিত্র .৩. প্রশিক্ষণ লোড বৃদ্ধির পক্রিয়া

অভিযোজনের শর্তসমূহ (Condition of Adaptation)

প্রশিক্ষণের লোড কে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ফলপ্রসু করতে হলে অভিযোজনের নিম্নলিখিত শর্তসমূহ বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে।

১। প্রশিক্ষণার্থীর ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের লোড প্রদান করলে সবচেয়ে বেশি কার্যকারী ফলাফল পাওয়া যাবে অর্থাৎ অভিযোজন ভাল হবে। অতএব লোড প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীর লোড গ্রহণের ক্ষমতা কেমন তার উপর নির্ভর করে লোড প্রদান করলে সবচেয়ে বেশি কার্যকারী হবে।

২। লোড প্রদানের সময় লোডের মাত্রা ও পরিমানের মধ্যে সঠিক সমন্বয় হতে হবে তাহলে অভিযোজন বেশি হবে। অর্থাৎ লোড বেশি হলে তিব্রতা (গভীরতা) কম হবে এবং তিব্রতা বেশি হলে লোডের পরিমাণ কম থাকে।

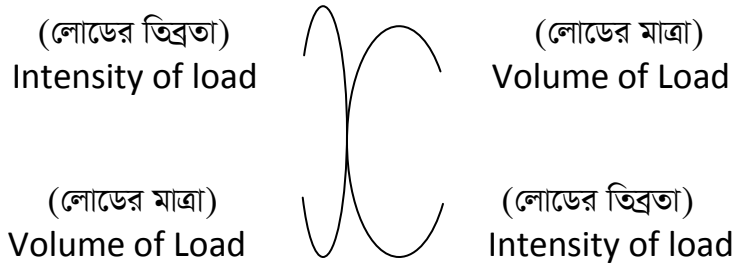

চিত্র .৪. লোডের তীব্রতা ও মাত্রার মধ্যকার সম্পর্ক

৩। লোড রিকভারীর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় হলে অভিযোজন ভাল হবে।

লোড রিকভারীর মধ্যে সম্পর্ক

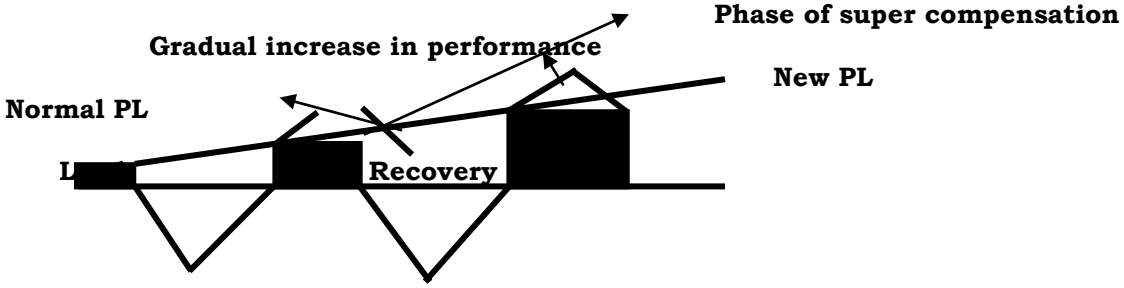

চিত্র .৫.লোড ও রিকভারীর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় হলে পারফর্মেন্স বৃদ্ধি পায় ।

৪। সর্বোচ্চ অভিযোজনের জন্য সর্বোচ্চ লোড প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণকে কার্যকারী করতে হলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় লোড প্রদান করতে হবে। বেশি লোড প্রদান করলে বেশি অভিযোজন হবে। মধ্যম পর্যায়ের লোড প্রদান করলে মাঝামাঝী পর্যায়ে অভিযোজন হবে এবং অল্প লোড প্রদান করলে অল্প পরিমাণ অভিযোজন হয়।

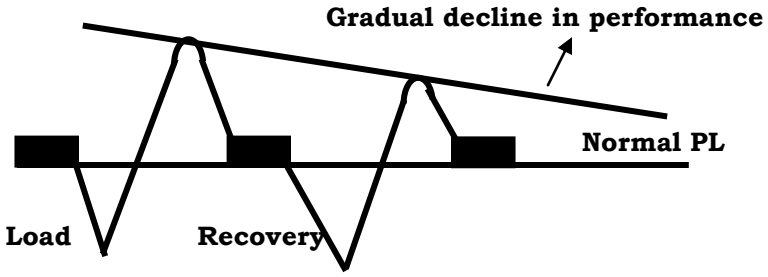

চিত্র .৬.লোড ও রিকভারীর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় না হলে পারফর্মেন্স কমে যায় ।

৫। নবীনদের ক্ষেত্রে অভিযোজন দ্রুত হয় অর্থাৎ যারা নতুন তাদের লোড প্রদান করলে অভিযোজন দ্রুত হয়।
৬। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন বিরতি দিলে বা লোড প্রয়োগ না করলে অভিযোজনের ব্যাঘাত ঘটে। অর্থাৎ দীর্ঘদিন লোড প্রদান না করলে বা প্রশিক্ষণের বিরতি দিলে অভিযোজন ক্ষমতা কমে যায়।
৭। লোডের অভিযোজন শুধু প্রশিক্ষণার্থীর পারফরমেন্সের উন্নতি করে না এটি বরং লোড গ্রহণের বৃহৎ শক্তির উন্নতি ঘটায়। প্রশিক্ষন অবস্থার উন্নতি করলে একজন খেলোয়াড়ের লোড গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ওভার লোড(Over Load)

যখন একজন খেলোয়াড়ের লোড নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়, তখন তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বাধাগ্রস্থ হয়। এক কথায় একজন খেলোয়াড়ের প্রশিক্ষণ বাধাগ্রস্থ হলে শারীরিক ও মানসিক ভাবে লোড নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ওভার লোড দীর্ঘ দিন একজন খেলোয়াড়ের ভিতরে চলতে থাকলে তার পারফরমেন্স ক্ষমতা কমে যায়। একজন খেলোয়াড়ের পারফরমেন্স শুধুমাত্র বিপাকীয় প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না, এটি ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্রের উপরও নির্ভর করে। যখন স্নায়ুতন্ত্র বাধাগ্রস্থ হয় তখন ব্যক্তির বিপাকীয় প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্থ হয় এবং শক্তি সঞ্চয় কমে যায়।

যখন একজন খেলোয়াড়ের প্রশিক্ষণের ফলে তার পারফরমেন্স স্বাভাবিক উন্নতি বাধাগ্রস্থ হয় এবং ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক ভাবে লোড নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন তাকে ওভার লোড বলে। যখন একজন খেলোয়াড়ের লোড নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় এবং লোড নেওয়ার ফলে রিকভারি দেরীতে হয় এবং কয়েক দিন অথবা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত ক্লান্তিবোধ করে তখন বুঝতে হবে উক্ত খেলোয়াড়ের ওভার লোড হয়েছে।

ওভার লোডেরর প্রকারভেদ (Types of Over Load)

ওভারলোড মূলত ২ প্রকার। যথা:
১। উত্তেজনার প্রক্রিয়ার প্রাধান্য (Dominance of excitation process)
২। শিথিলতার প্রক্রিয়ার প্রাধান্য (Dominance of relaxation process)

১। উত্তেজনার প্রক্রিয়ার প্রাধান্য
(Dominance of excitation process)
যখন কোন প্রকার প্রস্তুতি ছাড়া হঠাৎ করে লোডের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয় তখন এ ধরনের ওভারলোড হয়।
২। শিথিলতার প্রক্রিয়ার প্রাধান্য
(Dominance of relaxation process)
দীর্ঘদিন ধরে একই যখন পরিমান লোড প্রদান করা হয় তখন এ ধরনের ওভারলোড হয়।

ওভার লোডের কারণ (Causes of Over Loading)

ওভারলোডের প্রধান চারটি কারণ নিচে বর্ণনা করা হল:
১। ত্রুটিপূর্ণ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি
(Faulty Training Method)
ক) রিকভারি প্রতি অবহেলা করা।
খ) যথাযথ অভিযোজন না হওয়া সত্ত্বেও প্রশিক্ষণ লোড বৃদ্ধি করা।

গ) সর্বোচ্চ বা সর্বোচ্চ কাছাকাছি মাত্রায় লোডের তিব্রতা বৃদ্ধি করা।
ঘ) অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কর।
ঙ) একই ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা।

২। জীবনযাপন পদ্ধতি
(Life Factors)
ক) যথাযথভাবে রাতে বিশ্রাম না নেওয়া।
খ) দৈনন্দিন জীবন অনিয়মিত ভাবে অতিবাহিত করা।
গ) বিলাসবহুল জীবনযাপন।
ঘ) এলকোহল বা নিকোটিন গ্রহণ করা।
ঙ) খারাপভাবে জীবন যাপন করা।
চ) অবসর সময়কে খারাপভাবে ব্যবহার করা।
ছ) পরিবার বা সম্প্রদায়ের সাথে ঝগড়া করা ।

৩। সামাজিক উপাদান
(Social Factors)
ক) কোন কিছুতে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা।
খ) পরিবারে কলহ বিবাদ বা দ্বন্দ্ব।
গ) নির্দিষ্ট খেলায় বা কাজে অসন্তুষ্টি।
ঘ) সহপাঠিদের সাথে ভুল বুঝাবুঝি।
ঙ) পড়াশুনা ও খেলাধুলায় অতিরিক্ত লোড প্রদান।
চ) খেলাধুলার প্রতি পরিবারের অনীহা।
ছ) অতিরিক্ত বিনোদনমূলক ব্যবস্থা করা।

৪। স্বাস্থ্যগত উপাদান
(Health Factors)
ক) জ্বর বা ব্যাধি।
খ) হজম প্রক্রিয়ার সমস্যা।
গ) সংক্রামক।
ঘ) ইনজুরি।

ওভার লোডের লক্ষণসমূহ (Symptoms of Over Load)

ক) মানসিক লক্ষণমূহ (Psychological symptoms):
ক) উত্তেজনার মাত্রাবৃদ্ধি।
খ) বিরক্তিকরভাব বা ঝগড়াটে ভাব।
গ) কোচের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা।
ঘ) অন্যের সমালোচনায় মুখর।
ঙ) হতাশা।
চ) উদাসীন ভাব।
ছ) আত্মবিশ্বাসের অভাব।
জ) প্রেষণার অভাব বা উৎসাহের অভাব।

শারীরিক ক্রিয়াগত লক্ষণসমূহ
(Somatic-Functional Symptoms)

১। ঘুম কমে যাওয়া।
২। ওজন কমে যাওয়া।
৩। ক্ষুধার মাত্রা কমে যাওয়া।
৪। হজমে সমস্যা হওয়া
৫। ঘুম ঘুম ভাব
৬। ইনজুরির পরিমান বেড়ে যাওয়া।

পারফরমেন্সের লক্ষণসমূহ
(Performance Symptoms)

১। কৌশলগত ভুল বৃদ্ধি।
২। মনোযোগের অভাব।
৩। পৃথকীকরণ ক্ষমতা কমে যাওয়া।
৪। শক্তি, গতি এবং নিঃশ্বাস গ্রহণের ক্ষমতা কমে যাওয়া।
৫। রিকভারি দেরিতে হওয়া।
৬। প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিভাব কমে যাওয়া।
৭। প্রতিযোগিতায় হার মানার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া।
৮। প্রতিযোগিতার সময় অশালীন আচরণ করা।

ওভার লোড প্রতিরোধের উপায় (How to Tackle Over Load (Remedies)

ওভারলোড প্রতিরোধ করা সহজ বিষয় নয়। কোচ, খেলোয়াড়, ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানীদের সহায়তার ওভার লোড প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ করার উপায়সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

১। প্রশিক্ষণের সময় খুব সতর্কতার সাথে একজন কোচকে ওভারলোড পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত করতে হবে। কেননা ওভারলোডের মানসিক লক্ষণগুলো প্রথমে কোচই বুঝতে পারে।
২। যখন কোচ বুঝতে পারবে যে, প্রশিক্ষণার্থীর ওভারলোড হয়েছে তখন সাথে সাথে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
ক) প্রশিক্ষণের লোডের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে।
খ) সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, ম্যাসাজ করতে হবে।
গ) সাধারণ অনুশীলনের পাশাপাশি যথাযথ রিকভারির ব্যবস্থা করতে হবে।
ঘ) ক্রীড়া চিকিৎসক, ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানী অথবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে।
ঙ) পিতা-মাতা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে হবে।
৩। প্রতিযোগিতার মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে।
৪। কোচ, অন্যান্য ব্যক্তি যেমন-বন্ধু পিতা-মাতা, সহপাঠি ডাক্তার, ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানী এদের সাথে আলোচনা করে ওভারলোডের সঠিক কারণ চিহ্নিত করতে হবে।
৫। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সংশোধন করতে হবে।
৬। প্রশিক্ষণ পুনঃপরিকল্পনার মাধ্যমে চালু করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি
(Training Method)

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সুবিধা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। পদ্ধতিগুলো বিভিন্ন সেটে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে ।
নিম্নে কয়েক ধরণের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

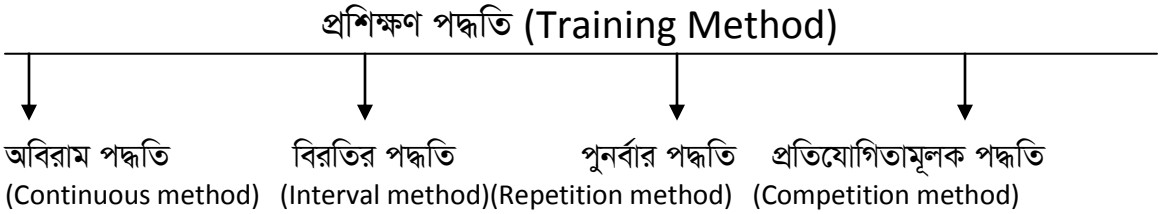

অবিরাম পদ্ধতি *(Continuous method)*

অবিরাম পদ্ধতির মাধ্যমে দীর্ঘ সময় কোন প্রকার রিবতি ছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময় বিরতিহীন ভাবে মধ্যম থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় তীব্রতর প্রশিক্ষণ লোড প্রদান করা হয়। অবিরাম পদ্ধতিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

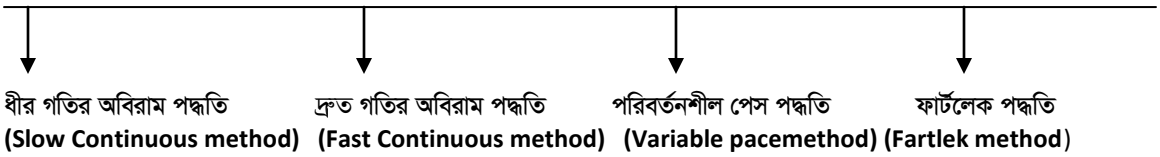

ধীর গতির অবিরাম পদ্ধতি (Slow Continuous method)

ধীর গতির পদ্ধতিতে দীর্ঘসময় ধরে কোন বিরতি ছাড়া একটা নির্দিষ্ট গতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে মূলত হৃৎপিন্ডের স্পন্দনের হার পরিমাপ করা হয়। প্রশিক্ষণ লোড এমন ভাবে প্রয়োগ করা হয় যেন একজন প্রশিক্ষণার্থীর হৃৎপিন্ডের স্পন্দনের হার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে প্রতি মিনিটে ১৪০-১৬০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় লোড প্রদান করা হয়। ৩০ মিনিটের কম সময় নয় এবং সর্বোচ্চ ১২০ মিনিট পর্যন্ড় প্রশিক্ষণ লোড প্রদান করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ফলে শারীরিক শক্তির দম গতি, হজম শক্তির পাশাপাশি মানবিক শক্তি ও বৃদ্ধি পায়।

২। দ্রুত গতির অবিরাম পদ্ধতি (Fast Continuous method)

দ্রুতগতির অবিরাম পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের লোড এমনভাবে প্রদান করা হয় যেন প্রশিক্ষণার্থীদের হৃদপিন্ডের স্পন্দনের হার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে প্রতি মিনিটে ১৬০-১৮০ বার পর্যন্ত হয়। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে লোডের

মাত্রা ও সময় এমন ভাবে নির্ধারণ করা হয় যেন ২০ মিনিট সময়ের কম না হয়। এই প্রশিক্ষণের পদ্ধতির ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের হার্টের কার্যক্রমতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এর ফলে হার্টের ও লাঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি করে।

৩। পরিবর্তনশীল পেস পদ্ধতি (Variable pacemethod)

পরিবর্তনশীল পেস পদ্ধতিতে একরকম ভাবে দীর্ঘ কোন বিরতি ছাড়া লোড প্রদান করা হয় তবে এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ লোডের পেস বা গতির পরিবর্তন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীর হৃদপিন্ডের স্পন্দনের হার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে প্রতি মিনিটে ১৪০-১৮০ বার হতে পারে। এই পদ্ধতিতে লোড প্রদানের সময় কাল ১৫ মিনিট থেকে ৬০ মিনিট পর্যন্ত করা হয়ে থাকে। সেহেতু এই পদ্ধতিতে গতির পরিবর্তন করা হয় এবং পরিকল্পিত থাকে ও খুব কষ্টকর হয় যেহেতু শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষণার্থী এটা করতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন গতি প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের এরোবিক (Aerobic) আনএ্যারোবিক (Anaerobic) ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

৪। ফার্টলেক পদ্ধতি (Fartlek method)

ফর্টিলেক পদ্ধতিতে ফর্টিলেক শব্দটি সুইডিশ শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হলো দ্রুত গতিতে খেলা (Speed play) এটি পরিবর্তন পেস পদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্নতর । ফর্টিলেক পদ্ধতিতে পেস বা গতির যে পরিবর্তন গুলো হয় সেগুলো পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়। এক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষণার্থী তার গতি পরিবর্তন করে তার নিজ প্রয়োজনে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও নিজস্ব অনুভুতি অনুসারে । পরিবর্তন পেস পদ্ধতির মতো ফর্টিলেক পদ্ধতিতেও হৃদপিন্ডের স্পন্দনের হার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে প্রতি মিনিটে ১৪০-১৮০ বার পর্যন্ড় হতে পারে। প্রশিক্ষণ লোডের মাত্রা ও সময়কাল পরির্বতন পেস পদ্ধতির মতো ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা বা ৬০ মিনিট হয়ে থাকে। শারীরবৃত্তিয় এবং প্রশিক্ষণের ফলাফল পরিবর্তন পেস পদ্ধতির মতো।

বিরতির পদ্ধতি(Interval Method)

দম বৃদ্ধির জন্য এটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের ব্যবধানে পুনঃপুনঃ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করা হয়। প্রতি দফায় দৌড়টি এরুপ হবে যেন হৃদস্পন্দনের গতি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে প্রতি মিনিটে ১৭০-১৮০ বিট হয়। হৃদ স্পন্দনের গতি প্রতি মিনিটে ১২০ বিট হলেই আবার তাকে লোড প্রদান করতে হবে।

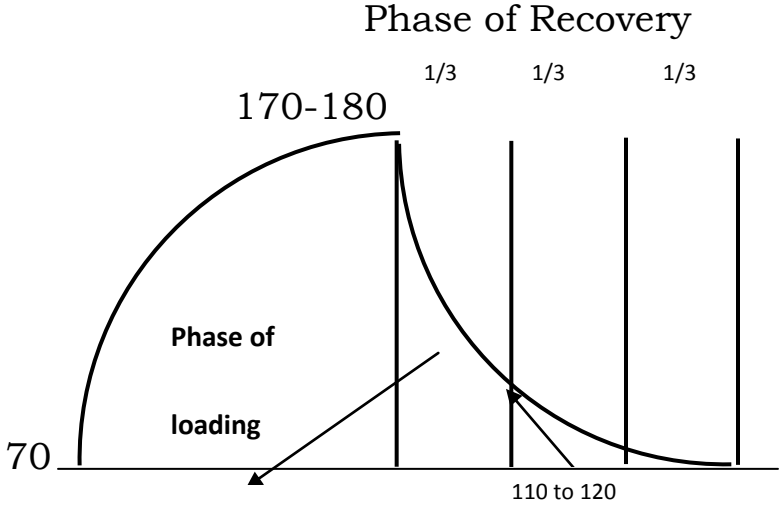

বিরতির পদ্ধতির প্রকারভেদ (Types of Interval Method)

Interval Method কে নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করা যায়। যেমন:

i) স্বল্পকালীন বিরতির পদ্ধতি (Short time Interval Method): এ পদ্ধতিতে প্রতি দফায় ১৫ সেকেন্ড থেকে ২ মিনিট পর্যন্ত লোড দিতে হবে।

ii) মধ্যমকালীন বিরতির পদ্ধতি (Middle time Method): এই পদ্ধতিতে প্রতি দফায় ২ থেকে ৮ মিনিট পর্যন্ত লোড দিতে হবে।

iii) দীর্ঘকালীন বিরতির পদ্ধতি (Long time Method): এই পদ্ধতিতে প্রতি দফায় ৮ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত লোড দিতে হবে।

উপযুক্ত তিনটি পদ্ধতি আবার তিব্রতার বিরতির পদ্ধতি (Intensive interval method) এবং প্রসারণ বিরতির পদ্ধতি (Extensive Internal method) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। তিব্রতার বিরতির দৌড়ের পদ্ধতি (Intensive interval running method) এর মাত্রা সঠিক তীব্র (৮০% - ৯০%)। প্রসারণ বিরতির দৌড়ের পদ্ধতি (Extensive interval running method) এর তিব্রতায় মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম ৬০% - ৮০% ।

এখানে রিকভারির প্রণালীটি হবে গুরুত্বপূর্ণ। রিকভারি হবে,তবে সেই রিকভারি হবে running থেকে Jogging বা walking এর মাধ্যমে কিংবা Jogging ও walking উভয়ের সমন্বয়ে হতে পারে। বসে বা শুয়ে এই রিকভারি করা যাবে না। [সাইক্লিক (Cyclic sport) এর মত বিশেষ খেলা যেমন – ট্রাক এন্ড ফিল্ড, সাঁতার, সাইক্লিক ইত্যাদি খেলায় তিব্রতার বিরতির দৌড়ের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও উত্তেজনাপূর্ণ খেলাতেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। গতির দম বিকাশে এটি সর্বোৎকষ্ট পদ্ধতি। এটা সাইক্লিক আনত্রারোবিক ক্ষমতা উজ্জীবিত করে এবং এভাবে phosphojen stores, lactic e এবং non oxidative engymes বিকশিত করে।

সার্কিট ট্রেনিং (Circuit Training)

সার্কিট ট্রেনিং শক্তি বৃদ্ধির জন্য খুবই জনপ্রিয় এবং কার্যকরী একটি পদ্ধতি। এ ধরণের প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অনুশীলন একটার পর একটা সম্পাদন করতে হয়। চক্রাকারে একটি সেটের প্রতিটি অনুশীলন সম্পূর্ণ করাকে এক রাউন্ড বলা হয়। সার্কিট ট্রেনিং এ সাধারণত তিন বা তার অধিক রাউন্ড সম্পাদন করতে হয়। এ ধরনের ট্রেনিংমূলত শক্তি ও দমের উন্নতির জন্য অধিক ব্যবহার করা হয়।

সার্কিট ট্রেনিং এ ৫-১৫টি অনুশীলন সজ্জিত থাকে তবে সাধারণত ৬-১০টি অনুশীলন পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করতে হয়। অনুশীলনের উপকরণগুলো এমন ভাবে সাজানো থাকে যেন চক্রকারে ভিন্ন ভিন্ন পেশীর অনুশীলন সম্পাদিত হয়। সার্কিট ট্রেনিং পর্যায় ক্রমে তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হলেও মূলত বিরতিহীনও বিরতির পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। যখন বিরতিহীন পদ্ধতি (Continued method) ব্যবহার করা হয় তখন কোন রকম বিরতি ছাড়া সার্কিটের সকল অনুশীলনগুলো সম্পাদন করতে হয়। আর বিরতির পদ্ধতি (Interval method) প্রতিটি অনুশীলন বা স্টেশনের পর অসম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হয়। সাধারণত প্রতিটি

রাউন্ডের মধ্যে ৩-৫ মিনিট বিশ্রাম দেওয়া হয়। সার্কিট ট্রেনিং কর্মসূচীতে খুব সতর্কতার সাথে অনুশীলন গুলো কয়েক সপ্তাহ ধরে করতে হয় এবং কোন একটি লক্ষ্য সুসম্পন্ন হওয়ার পর পরিবর্তন করতে হয়। সার্কিট ট্রেনিংয়ের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে। যথা:

১। অনুশীলন অবশ্য পূর্ব নির্ধারিত এবং সহজ ভাবে সম্পাদন করতে হবে।
২। অনুশীলনের লোড অবশ্য আলাদা আলাদা এবং ব্যক্তিগত হতে হবে।
৩। অনুশীলনগুলো এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন সেগুলো কষ্টকর তবে সহনীয় হয়।
৪। অনুশীলনের স্টেশনগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যেন একই ধরনের মাংসপেশির উন্নতি না হয়।
৫। সধারণত ছয় থেকে দশটি অনুশীলন করতে হবে।
৬। প্রত্যেক অংশগ্রহনকারী তার অনুশীলনটি যথাযথ সম্ভব দ্রুত শেষ করতে হবে।
৭। একটা স্টেশন থেকে আরেকটি স্টেশনে যাওয়ার জন্য বিরতি নিতে হবে এবং কতটুকু বিরতি নেওয়া হল তা রেকর্ড করতে হবে।
৮। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর নতুন লক্ষ্য, সময় তৈরি করতে হবে।

সার্কিট ট্রেইনিং এর সময় যেসব অনুশীলন করতে হয় সেসব নিম্নরূপ:

i) ক্ষিপ্রতার দৌড় (Agility runs) - দম ও ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধির জন্য
ii) স্কোয়াট থ্রাস্ট (Squat thrust) - শারীরিক অনুশীলন ও ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধির জন্য
iii) পা ভাঁজ করে উঠা-বসা (Bent leg sit-ups)- দম ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য
iv) স্টেপ আপ (Step-ups) -দম ও পায়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্য
v) দাঁড়ানো অবস্থায় দূরুত্বের লাফ (Standing long jump) – পায়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্য
vi) পুস আপ (Push-ups)-বাহু ও কাঁধের শক্তি ও দম বৃদ্ধির জন্য
vii) জাম্প ও রিচ (Jump and reach)- পায়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্য
viii) চিনস (Chins)--বাহু ও কাঁধের শক্তি ও দম বৃদ্ধির জন্য
ix) দড়ি বেয়ে উঠা (Rope climbing)- শক্তি ও দম বৃদ্ধির জন্য
x) সিঁড়ি বেয়ে উঠা ও নামা (Stair running) - শক্তি ও দম বৃদ্ধির জন্য
xi) ওয়েট ট্রেনিং (Weight training)- শক্তি বৃদ্ধির জন্য

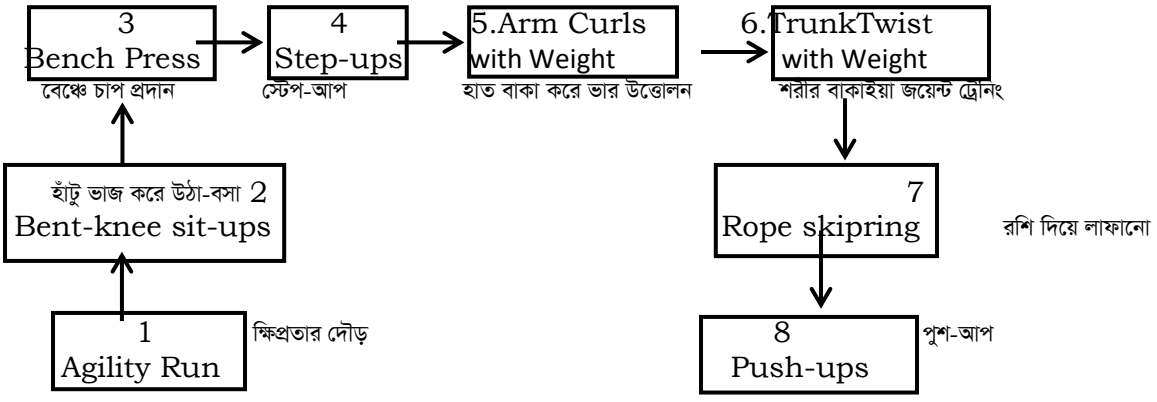

Fig. সার্কিট ট্রেনিং এর আটটি স্টেশন (Circuit of Eight Stations)

ওয়েট ট্রেনিং (Weight Training)

ওয়েট ট্রেনিং খুব সর্তকতার সাথে সম্পাদন করতে হয়। সাম্প্রতিকালে ওয়েট ট্রেনিং কারণে অনেক খেলোয়াড় মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রায় সময় দেখা যায় ১৪-১৫ বছরের ছেলে-মেয়েরা বডি বিল্ডারও পেশাদার ভারোত্তলনকারীদের মত শক্তিবৃদ্ধির জন্য ওয়েট ট্রেনিং করে থাকে। এটা খুবই বিপদজনক কাজ। কেউ বুঝতে চায়না যে ১৪-১৫ বছর বয়সে পেশাদারী বয়স্ক মানুষের মতো এ ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিৎ নয়। তরুণরা এ ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। উদাহরণস্বরুপ অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড় বিভিন্নভাবে রুটিন মাফিক ওয়েট ট্রেনিং করে থাকে, দেহের বিভিন্ন অংশের মাসংপেশির শক্তি বৃদ্ধির জন্য। কেউ করে প্রথমে দেহের উপরের অংশের জন্য পরে নিচের জন্য তারপর নির্দিষ্ট কোন মাংসপেশির জন্য। মূলত দেহের সকল মাংস পেশির শক্তি বৃদ্ধির জন্য ওয়েট ট্রেনিং এর প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র আরচারী এবং শ্যুটিং ছাড়া প্রায় সকল ধরণের খেলোয়াড়দের দেহের সকল পেশির শক্তি বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ফিটনেস বা সক্ষমতা (Fitness)

দক্ষতা (Skill)

কৌশল বুঝতে পারার ক্ষমতা হল দক্ষতা। দক্ষতা অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

স্টাইল (Style)

কৌশল প্রকাশ করার ব্যক্তিগত প্রকাশভঙ্গি হল স্টাইল। বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থী একই ধরনের কৌশল শিখে কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়।

শারীরিক সক্ষমতা (Physical Fitness)

জরুরি পরিস্থিতিতে, অবসর সময় প্রচুর শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে কোন প্রকার ক্লান্তি ছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম উদ্যমতার সাথে করার ক্ষমতাকে শারীরিক সক্ষমতা বা Physical Fitness বলে।

মটর ফিটনেস (Motor Fitness)

কোন প্রকার ক্লান্তি ছাড়া আমাদের শরীরের বড় মাংসপেশীগুলোর কার্য সম্পাদন করার বা প্রস্তুত হওয়ার ক্ষমতাকে মটর ফিটনেস বলে।
সাধারণ মটর ফিটনেস

(Genarel Motor Fitness)

সাধারণ ভাবে আমাদের মটর দক্ষতাগুলো সম্পাদন করার ক্ষমতাকে সাধারণ মটর ফিটনেস বা Genarel Motor Fitness বলে।

মটর ফিটনেস উপাদানসমূহ (Components Motor Fitness)

ক) শক্তি (Strength)
খ) গতি (Speed)
গ) দম (Endurance)
ঘ) নমনীয়তা(Flexibility)
ঙ) ক্ষিপ্রতা (Agility)

Strength

শক্তি সাধারণত একটি সাপেক্ষ ক্ষমতা। পারফরমেন্স এবং কৌশল বৃদ্ধির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোন বাধা বা প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করার ক্ষমতাকে শক্তি বলে। একজন খেলোয়াড় সাধারণত ৪ ধরনের বাধা অতিক্রম করে। যথা:

১। যন্ত্রপাতির প্রতিরোধমূলক বাধা।
২। নিজের শরীরের ভারসাম্যের প্রতিরোধমূলক বাধা।
৩। প্রতিপক্ষের প্রতিরোধমূলক বাধা।
৪। সংঘর্ষ প্রতিরোধমূলক বাধা।

শক্তিনির্ধারণের উপাদানসমূহ
(Factors Determining Strength)
ক) শারীরিক মাংসপেশির গঠন।
খ) মাংসপেশির গঠনগত উপাদান।
গ) মাংসপেশির সমন্বয় ক্ষমতা।
ঘ) শরীরে সঞ্চিত শক্তি।
ঙ) ওজন।
চ) মানসিক উপাদান।

শক্তির প্রকারভেদ
(Types of Strength)
শক্তি তিন প্রকার। যথাঃ
১। সর্বোচ্চ শক্তি (Maximum Strength)
২। বিস্ফোরক শক্তি (Explosive strength)
৩। শক্তির দম (Strength Endurance)

১। সর্বোচ্চ শক্তি
(Maximum Strength)
একটি উদ্দীপকের প্রতি সর্বোচ্চ তিব্রতার সাথে মাংসপেশির বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ শক্তি বলে। যেমন: শর্ট ডিসকাস, হামার নিক্ষেপ,বর্শা নিক্ষেপ ইত্যাদি।

২। বিস্ফোরক শক্তি
(Explosive strength)
কোন উদ্দীপকের প্রতি সর্বোচ্চর কাছাকাছি যত দ্রুত সম্ভব মাংসপেশির বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতাই হল বিস্ফোরক শক্তি বলে। যেমন: স্প্রিন্ট, জাম্প, হকিস্টিক দিয়ে আঘাত করা ইত্যাদি।

৩। শক্তির দম
(Strength Endurance)
কোন উদ্দীপকের প্রতি মধ্যম তিব্রতার সহিত যত সময় সম্ভব মাংসপেশির বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতাই হল শক্তির দম। যেমনঃ সাতার কাটা, অধিক দুরত্ব অতিক্রম করা, রেসলিং, বক্সিং, ম্যারাথন দৌড় ইত্যাদি।

গতি(Speed)

দম, শক্তির ন্যায় গতি সাপেক্ষ ক্ষমতা । এটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। শক্তি ও দমের মতো গতি ততটা অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত করা যায়না।

যত দ্রুত সম্ভব স্বল্প সময়ে দেহকে মুভমেন্ট বা সঞ্চালন করার ক্ষমতাকে গতি বলে।

গতিনির্ধারণের উপাদানসমূহ
(Factors Determining Speed)

ক) শারীরিক গঠন ও মাংসপেশি।
খ) স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া।
গ) শক্তি।
ঘ) কৌশল
ঙ) মাংসপেশির সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা।
চ) জৈব-রসায়নগত পন্থা
ছ) মানসিক শক্তি।

গতির প্রকারভেদ (Types of Speed)

গতি তিন প্রকার। যথা:

১। সর্বোচ্চ গতি (Maximum Speed)
২। প্রতিক্রিয়ার গতি (Reaction Speed)
৩। সঞ্চালনের গতি (Speed of Movement)
৪। প্রসারণ গতি (Acceleration Speed)
৫। গতি দম (Speed Endurance)

১। সর্বোচ্চ গতি (Maximum Speed)

সর্বোচ্চ গতি সহিত সবচেয়ে বেশি দূরূত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ গতি বলে। সর্বোচ্চ গতি বিশেষ করে ১০০মিটার,২০০মিটার দৌড়ের ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজন হয়। স্নায়ুতন্ত্রের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

২। প্রতিক্রিয়ার গতি (Reaction Speed)

কোন উদ্দীপক বা সংকেতের প্রতি যত দ্রুত সম্ভব প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা হলো প্রতিক্রিয়ার গতি । সংকেত বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেমন- দর্শণগত ,শ্রবনগত এবং স্পর্শগত । সংকেতের মাত্রা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দুই ধরণের হতে পারে যেমন-সরল এবং জটিল প্রতিক্রিয়া।

৩। সঞ্চালনের গতি (Speed of Movement)

স্বল্প সময়ে মুভমেন্ট করার ক্ষমতাকে সঞ্চালনের গতি বলে। সঞ্চালনের গতি ব্যক্তির খেলাধুলার প্রয়োজন অনুসারে হয়ে থাকে।এটি অনেকটা ব্যক্তির কৌশল শিক্ষণ ও শক্তির উপর নির্ভর করে।

৪। প্রসারণ গতি (Acceleration Speed)
স্বল্প গতির অবস্থা বা স্থির অবস্থা হতে দ্রুতগতির সহিত স্থানান্ড়রিত হওয়া বা স্থান পরিবর্তন করার ক্ষমতাকে প্রসারণ গতি বলে। প্রসারণ গতি কৌশল শিক্ষণ, শক্তির ও সঞ্চালন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

৫। গতির দম (Speed Endurance)
গতির দম প্রধাণত গতি ও দমের যৌথ ক্ষমতা। দ্রুতগতির সহিত দীর্ঘ সময় যাবৎ কোন কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতাকে গতির দম বলে। গতির দম অ্যানারোবিক ক্ষমতা, কৌশল ও মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে।

দম (Endurance)

কোন প্রতিকূল পরিবেশে ক্লান্তিহীন ভাবে দীর্ঘসময় ধরে কাজ করার ক্ষমতাকে দম বলে।

দমের প্রকারভেদ

Type of Endurance

দম প্রধানত চার প্রকার। যথাঃ

i) সাধারণ দম (Basic Endurance)
ii) গতির দম (Spred Endurance)
iii) ক্ষিপ্রতার দম (Sprint Endurance)
iv) শক্তির দম (Strength Endurance)

i) সাধারণ দম (Basic Endurance)
কোন একটি উদ্দীপকের সাথে মধ্যম তিব্রতার সহিদ ক্লান্তিহীনভাবে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার ক্ষমতাকে সাধারণ দম বলে।

ii) গতির দম (Spreed Endurance)
কোন উদ্দীপকের প্রতি সর্বোচ্চ তিব্রতার কাছাকাছি ক্লান্তিহীনভাবে দীর্ঘসময় ধরে কাজ করার সক্ষমতাকে গতির দম বলে।

iii) ক্ষিপ্রতার দম (Sprint Endurance)
কোন উদ্দীপকের সাথে সর্বোচ্চ তিব্রতার সহিত ও সর্বোচ্চ মটর মুভমেন্টের এর মাধ্যমে ক্লান্তিহীনভাবে দীর্ঘসময় কাজ করার ক্ষমতাকে ক্ষিপ্রতার দম বলে।

iv) শক্তির দম (Strength Endurance)
কোন উদ্দীপকের সহিত মধ্যম তিব্রতায় যতক্ষণ সময় সম্ভব মাংসপেশির বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতাকে শক্তির দম বলে।

Endurance হল এমন এক বৈশিষ্ট্য যা কার্যক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখে এবং যেসব প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিকূল পরিবেশ দেহমনে অবসাদ নিয়ে আসে তাকে প্রতিহত করে।

নমনীয়তা(Flexibility)

একটি বড় পরিসরে Joint বা সন্ধি সাথে সংযুক্ত পেশিসমূহ সঞ্চালনের ক্ষমতাই হল নমনীয়তা। এটি কিছুটা শরীরের শক্তি অবমুক্ত এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে।

নমনীয়তা নির্ধারণের উপাদানসমূহ (Factors Determining Flexibility)

নমনীয়তা নির্ধারণের উপাদানসূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

ক) Joint বা সন্ধির গঠন কাঠামো
খ) লিগামেন্ট এবং মাংসপেশির প্রসারণ ক্ষমতা
গ) প্রাণীর অবস্থা বা জীবের বৈশিষ্ট্য
ঘ) নমনীয়তার জন্য অনুশীলনের পরিমান।
ঙ) শক্তি
চ) বয়স
ছ) লিঙ্গ
জ) সময়

নমনীয়তার প্রকারভেদ
(Types of Flexibilty)

নমনীয়তা প্রধাণত ২ প্রকার । যথা:
১। সক্রিয় নমনীয়তা (Active Flexibilty)
২। নিষ্ক্রিয় নমনীয়তা (Passive of Flexibilty)

১। সক্রিয় নমনীয়তা (Active Flexibilty)

একটি বড় পরিসরে বাহ্যিক সঞ্চালনের ক্ষমতাকে সক্রিয় বা Active নমনীয়তা বলে।

২। নিষ্ক্রিয় নমনীয়তা (Passive of Flexibilty)

একটি বড় পরিসরে বাহ্যিক সাহায্যের মাধ্যমে সন্ধির সাথে সংযুক্তসমূহ সঞ্চালনের ক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় বা Passive নিষ্ক্রিয় নমনীয়তা বলে।
সক্রিয় নমনীয়া আবার ২ প্রকার।
নিচের এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ক) স্থির নমনীয়তা (Static flexibility)
দাড়ানো অবস্থায় একটি বড় পরিসরে বাহ্যিক সাহায্যের মাধ্যমে সন্ধির সাথে সংযুক্তপেশির সঞ্চালনের ক্ষমতাকে স্থির নমনীয়তা বলে।

খ) গতিশীল নমনীয়তা (Dynamicflexibility)
গতির সাথে দৌড়ানো বা লাফ দেওয়ার মাধ্যমে সন্ধির সাথে সংযুক্ত মাংসপেশির সঞ্চালন ক্ষমতাকে গতিশীল নমনীয়তা বলে।

ক্ষিপ্রতা (Agility)

গতির সাথে নির্দেশনা ও প্রয়োজন অনুযায়ী দেহের নির্দিষ্ট কোন অংশ পরিবর্তন করার ক্ষমতাকে ক্ষিপ্রতা বলে।

সমন্বয় ক্ষমতা (Co-ordinatve Ability)

খেলোয়াড়দের দলগত Movment বা সঞ্চালনের ক্ষেত্রে সমন্বয় ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স এর ক্ষেত্রে সমন্বয় ক্ষমতার প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। বিভিন্ন ধরনের খেলার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স অনেকটাই সমন্বয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সমন্বয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। অতীতে সমন্বয় ক্ষমতাকে ক্ষিপ্রতা হিসেবে মনে করা হত। বিগত দুই দশক হতে ক্ষিপ্রতা শব্দটি সমন্বয় ক্ষমতা হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে।

সমন্বয় ক্ষমতার প্রকারভেদ (Types of Co-ordinatve Ability)

বিজ্ঞানী Blum(1978) সমন্বয় ক্ষমতাকে ৭টি ভাগে ভাগ করেছেন। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

১। যৌথ ক্ষমতা (Combination ability)
২। পৃথকীকরণ ক্ষমতা (Differentiation ability)
৩। পরিচিতিমূলক ক্ষমতা (Orientation ability)
৪। প্রতিক্রিয়ামূলক ক্ষমতা (Reaction ability)
৫। ভারসাম্যমূলক ক্ষমতা (Balance ability)
৬। ছান্দসিক ক্ষমতা (Rhythm ability)
৭। অভিযোজনমূলক ক্ষমতা (Adaptation ability)

১। যৌথ ক্ষমতা (Combination ability)

এটা হল ক্রীড়াশৈলি প্রদর্শনের মুহূর্তে কোন খেলোয়াড়ের নিয়ম মাফিক ও অর্থপূর্ণভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বিত সকল অঙ্গ-সঞ্চালন। এটা সেই সামর্থ্যের দক্ষতাকে বোঝায় যখন কোন কৌশল শিক্ষা কর্মসূচিতে কোন খেলোয়াড়ের প্রদর্শন করতে হয়। এই দক্ষতা যেসব ক্রীড়াক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেগুলো হল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলা, জিমন্যাস্টিক এবং দলীয় খেলায়। এই দক্ষতা দৈহিক গতিশীলতা এবং দর্শণগত ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ।

২। পৃথকীকরণ ক্ষমতা (Differentiation ability)

এই ক্ষমতা একজন খেলোয়াড়কে তার দেহের বিভিন্ন অংশ প্রয়োজন অনুযায়ী মিতব্যয়ীভাবে পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করে। পৃথকীকরণ ক্ষমতা ব্যবহার ব্যক্তির দক্ষতা অর্জনের পরিপূর্নতা লাভের উপর নির্ভরশীল। এক কথায় প্রয়োজন অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অংশ পৃথক পৃথক সঞ্চালন করার ক্ষমতাকে পৃথকীকরণ ক্ষমতা বলে। এটা ব্যক্তির গতি সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

৩। পরিচিতিমূলক ক্ষমতা (Orientation ability)

এটা হল একজন খেলোয়াড়ের এমন একটি ক্ষমতা যার মাধ্যমে তার শরীর ও শরীরের বিভিন্ন অবস্থা, সময় ও স্থানের পরিবর্তন যেমন-খেলার মাঠ, জিমনেস্টিক উপকরন, বক্সি, রিং ইত্যাদি) অথবা কোন

চলাচলের বস্তুর (যেমন-বল, প্রতিপক্ষ, সহযোগি খেলোয়াড় ইত্যাদি) পরিবর্তনে সে তার পারফরমেন্স করতে পাবে। এটি ব্যক্তির শ্রবণগত,দর্শণগত ও গতি সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

৪। প্রতিক্রিয়ামূলক ক্ষমতা (Reaction ability)

কোন একটি উদ্দীপক বা সংকেতের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাকে প্রতিক্রিয়ামূলক ক্ষমতা বলে। এটা হল একজন খেলোয়াড়ের সেই ক্ষমতা যার মাধ্যমে সে প্রদত্ত উদ্দীপকের প্রতি দ্রুত সাড়া দিতে পারে এবং কোন একটি সংকেত অনুসারে নির্দেশিত কার্যাদি ভালভাবে সম্পাদন করতে পারে। এটি ব্যক্তির শ্রবণগত, দর্শণগত ও স্পর্শ সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

৫। ভারসাম্যমূলক ক্ষমতা (Balance ability)

এটা হল একজন খেলোয়াড়ের সেই ক্ষমতা যার মাধ্যমে সে তার শরীরে স্থিতিশীল ও গতিশীল উভয় অবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। সকল ধরণের দেহ নাড়া চাড়া এই সামর্থ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় । কিন্তু যখন সংকীর্ণ পরিসরে দেহ নাড়া চাড়ার বিষয়টি ঘটে তখন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে । এটি ব্যক্তির শ্রবণগত ইন্দ্রিয়ের কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

৬। ছান্দসিক ক্ষমতা (Rhythm ability)

ছন্দ বুঝে বা কোন তালের সাথে তাল মিলিয়ে কোন নির্দিষ্ট খেলা বা শারীরিক কর্মকান্ড সম্পাদন করার ক্ষমতাকে ছান্দসিক ক্ষমতা বলে। ছন্দ বা তাল অনেক সময় ভিতর থেকে হতে পারে আবার অনেক সময় বাহির থেকে হতে পারে। এটি ব্যক্তির শ্রবণগত,দর্শণগত ও স্পর্শ সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

৭। অভিযোজনমূলক ক্ষমতা (Adaptation ability)

প্রয়োজন ও পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাকে অভিযোজন ক্ষমতা বলে। অবস্থার পরিবর্তন অনেক সময় প্রত্যাশিতভাবে হতে পারে আবার অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ভাবেই হতে পারে। অভিযোজন ক্ষমতা অনেকটা ব্যক্তির শ্রবণগত,দর্শণগত ও গতি সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে । এছাড়া এটি প্রতিনিয়ত পরিচিতি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

পঞ্চম অধ্যায়

কৌশল প্রশিক্ষণ (Technique Training)

প্রশিক্ষণার্থীদের উচ্চ পারফরমেন্স অর্জনের জন্য কৌশল হল একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ও মিতব্যয়ী পন্থা, যা অনুশীলন সময় ও বিজ্ঞানের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। কৌশল শিক্ষণকে আবার তিনটি ধাপে ভাগ করা যায়। যথা:

ক) ধাপ-১:
এ পর্যায়ে কৌশল শিক্ষনের মূল উদ্দেশ্য হল একজন প্রশিক্ষণার্থীকে কোন বিষয়ে মোটামুটি ধারণা দেওয়া। এটি দক্ষতা শিক্ষনের সূচনার মাধ্যমে শুরু হয় এবং শেষ হয় সহজ অবস্থায় দক্ষতাগুলোর কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে। যখন সঠিক অনুশীলন করতে বলা হয় তখন ভুল হবে এটাই স্বাভাবিক। এ পর্যায়ে সময় কত দিন হবে তা দক্ষতা, জটিলতা, মটর উপাদানের সমন্বয় ক্ষমতা, প্রশিক্ষণার্থীর প্রেষণা, আগ্রহ, মনোভাব এবং কোচের নির্দেশনা প্রদানের উপর নির্ভর করে।

ধাপ-২:
এ ধাপ মোটামুটি শিক্ষণের মাধ্যমে সূচনা হয় এবং সঠিক সমন্বয় ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে শেষ হয়। এ সময় প্রশিক্ষণার্থী স্বাভাবিক অবস্থার কোন রকম গুরুত্বপূর্ণ ভুল ছাড়া তার সম্পাদন করতে পারে। তবে যদি শিক্ষণ অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন বা কঠিন করা হয় বা কোন বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে দক্ষতা প্রয়োগে কিছুটা ভুল হতে পারে। কারণ দক্ষতার শিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ পর্যায়ে সময় কতদিন হবে দক্ষতা জটিলতা, মটর ক্ষমতার উন্নতি, প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা, মানসিক শক্তি এবং কোচের নির্দেশ প্রদানের উপর নির্ভর করে।

ধাপ-৩:
এ পর্যায়ে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শুরু হয় এবং দক্ষতার মাস্টারি অর্জন পর্যন্ত চলতে থাকে। দক্ষতার মাস্টারি অর্জন তখনি হয় যখন সে প্রতিকুল এবং পরিবর্তিত অবস্থায় কোন প্রকার ভুল ছাড়া তার কার্য সম্পাদন করতে পারে। এ পর্যায়ে শেষ নেই কারণ কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। একজন উচ্চতর পারফরমেন্স সম্পূর্ণ খেলোয়াড় কোন কৌশল বা কোন বিষয়ে শতকরা ৮৫% অর্জন করতে পারে। আর বাকিটা সারাজীবন ধরে শিখতে থাকে।

টেকনিক শিক্ষণের মূলনীতিসমূহ
(Principles of Technique Training)

➢ টেকনিক শিক্ষণের প্রথম ধাপের মূলনীতি
(Principles of Technique Training During the First Phase)

১। খেলোয়াড়দের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ।
২। সহজ এবং অনূকুল পরিবেশে অনুশীলন।
৩। কৌশল শিক্ষণের সঞ্চালনগুলোর উন্নয়ন।
৪। গতি প্রত্যক্ষনের উপর কম জোর দেওয়া।
৫। সঞ্চালন সংশোধনের উপর কম গুরুত্ব দেওয়া।
৭। স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার উপর কম গুরুত্ব দেওয়া।

➢ টেকনিক শিক্ষণের দ্বিতীয় ধাপের মূলনীতি
(Principles of Technique Training During the Second Phase)

১। কৌশল শিক্ষণের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি করা।
২। মনোযোগের মাত্রা বৃদ্ধি করা।
৩। স্বাভাবিক অবস্থায় অনুশীলন করা।
৪। সঞ্চালনের উন্নয়ন।
৫। গতি প্রত্যক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া।
৬। সঞ্চালন সংশোধনের উপর গুরুত্ব দেওয়া।
৭। প্রতিযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি করা।

➢ টেকনিক শিক্ষণের তৃতীয় ধাপের মূলনীতি
(Principles of Technique Training During the Third Phase)
১। পরিবর্তিত ও কঠিন পরিবেশে অনুশীলন করা।
২। সঞ্চালন উন্নয়নের অধিক গুরুত্ব দেওয়া।
৩। দক্ষতার মাস্টারি অর্জনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করা।
৪। প্রতিযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি করা।
৫। সঞ্চালন প্রক্রিয়ার স্থান ও সময় অনুযায়ী স্থায়ীকরণের মানসিক প্রস্তুতি বৃদ্ধি করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা
(Training Plan)

আমাদের সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী কিছু পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে পরিকল্পনার অর্থ হলো বিভিন্ন পন্যের স্থায়ী উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা যা দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে উন্নতিতে সহায়তা করা।

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা(Training Plan)

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা হল প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ অবস্থার উন্নতির জন্য একটি প্রত্যক্ষ পন্থা যেখানে একজন খেলোয়াড় প্রশিক্ষণের সার্বিক অবস্থার উন্নতির বিধান থাকে এবং সকল প্রকার পরিমাপ যেমন-প্রশিক্ষণের অনুশীলনের ধরন, অনুশীলন পরিচালনা পদ্ধতি, প্রশিক্ষণের অর্থ ও পদ্ধতি, প্রকৃতি, প্রতিযোগিতার মাত্রা, পরিমাপের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি লিখিত আকারে থাকে।

পরিকল্পনার অর্থ

(Meaning of Planning)

ক) পারফরম্যান্সের লক্ষ্য অনুযায়ী কতটুকু অর্জিত হল তা লিখে রাখা।
খ) পারফরম্যান্সের লক্ষ্য হতে কতটুকু কাজ সম্পাদন হল তা নির্ধারণ করা।
গ) ধারাবাহিকতা অনুযায়ী প্রধান কাজ কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা লিখে রাখা।
ঘ) প্রশিক্ষণ লোডের উন্নতি অনুমান করা।
ঙ) প্রধান প্রধান কাজসমূহ সম্পাদন করার জন্য অর্থপূর্ণ পদ্ধতি ও সময় পদ্ধতি নির্ধারন করা।
চ) প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার জন্য সঠিক পন্থা নির্ধারন।

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার মূলনীতিসমূহ
(Principles of Training plan)

১। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অবশ্য জাতীয় দর্শণ অনুযায়ী হবে

(Sports training plan must be based on the national philosophy)

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অবশ্যই সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী হতে হবে। এমন কোন পরিকল্পনা করা যাবে না যা দেশ ও সমাজের কোন কাজে আসে না। এক কথায় সমাজ ও দেশ বিরোধী পরিকল্পনা করা যাবে না।

২। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে

(Sports training plan must have a scientific basis)

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে। যেখানে সকল প্রকার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, তত্ত্ব বর্তমান গবেষণার ভিত্তিতে প্রাপ্ত তত্ত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হবে। এককথায় আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সাদৃশ্য থাকতে হবে।

৩। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গণতন্ত্রের নীতি থাকবে

(Planning must follow the principle of democracy)

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় অবশ্যই গণতন্ত্রের নীতি থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় অবদান রাখতে পারে। এমনকি একজন খেলোয়াড়ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

৪। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ ও সমন্বয়

(Important points of training plan must be properly fixed and correctly coordinated)

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা একটি জটিল প্রক্রিয়া । সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। সে সকল বিষয়গুলো সতর্কতার সাথে সঠিকভাবে সমন্বয় করে রাখতে হবে।

৫। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার ধারাবাহিক উন্নতি হতে হবে

(Sports training plan must be constantly improved)

শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার ধারণা নিয়ে বসে থাকলে ভালো ফল পাওয়া যাবে না। পরিকল্পনা একটি গতিশীল বিষয়। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় একজন খেলোয়াড়ের বর্তমান পারফরমেন্স ভিত্তিতে নিয়মিত নিয়ন্ত্রন, মূল্যায়ন ও সংশোধন করতে হবে।

৬। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা মূল্যায়ন, পরিমাপন ও নিয়ন্ত্রনের একক

(Sports training plan evaluation and control measures constitute a unit)

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা মূল্যায়ন, পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রনের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন- বিভিন্ন পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার চক্র (Cycles of Training plan)

সেকশনাল পরিকল্পনাকে বিভিন্ন ধাপ, পর্যায় ও সাপ্তাহিক হিসেবে ভাগ করা যায়। প্রশিক্ষণের সময়কে বিভিন্ন সময়ে ভাগ করা যায়। যেমন:

- প্রস্তুতিমূলক পর্যায় (Preparatory periods)
- প্রতিযোগিতামূলক পর্যায় (Competition periods)
- অবস্থানগত পর্যায় (Transitional periods)

আবার চক্র হিসেবে প্রশিক্ষন পরিকল্পনাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক) ক্ষুদ্র চক্র (Macro Cycle)

খ) মাঝারী চক্র (Meso Cycle)

গ) অতিক্ষুদ্র চক্র (Micro Cycle)

পরিকল্পনার চক্রগুলো সর্ম্পকে নিচে আলোকপাত করা গেল:

ক) ক্ষুদ্র চক্র

(Macro Cycle)

এই চক্রের সময়কাল ৩ থেকে ১২ মাস। সাধারণত এই চক্রকে বৃহত্তম চক্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই চক্রের মূল উদ্দেশ্য হল একটি নির্দিষ্ট বিশেষ করে প্রতিযোগিতার সময় একজন খেলোয়াড়কে সর্বোচ্চ

পারফরমেন্স অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা। এই চক্রকে আবার কয়েকটি মাঝারি চক্রে ভাগ করা হয়। সর্বশেষ চক্রে রিকভারি ও রিল্যাকজেশন নিশ্চিত করা হয়।

খ) মাঝারী চক্র
(Meso Cycle)

এই চক্রের সময়কাল ৩ থেকে ৬ সপ্তাহ। সাধারণ এই চক্রকে মধ্যম পর্যায় হিসেবে বিবেচনা হয়। মাঝারী চক্রের চতুর্থ সপ্তাহকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এই সময় শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়। এই চক্রের শেষের সময় রিকভারি ও রিল্যাকজেশন নিশ্চিত করা হয়। এই চক্রের মূল উদ্দেশ্য নিম্নরুপ:

i) দক্ষতার মাস্টারি অর্জন ও শিক্ষণ।
ii) পারফরম্যান্স নিয়ন্ত্রন ও স্থায়ীকরন।
iii) শারীরিক ও মটর সক্ষমতার উন্নতি সাধন।
iv) বিশেষ প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতকরন।
v) সর্বোচ্চ পারফরমেন্স অর্জন।

গ) অতি ক্ষুদ্র চক্র
(Micro Cycle)

এই চক্রের সময়কাল হল ৩ থেকে ১০ দিন। এই চক্রে সাধারণত মধ্যম ও উচ্চতর পারফরম্যান্স সম্পূর্ণ খোলোয়াড়দের নিয়ে কাজ করা হয়। এই চক্রের সর্বশেষ দিনে রিকভারি ও রিল্যাকজেশন নিশ্চিত করা হয় পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার জন্য। যদি ৩-১০ দিন প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট নয়। তবুও এই সময়কাল প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার জন্যএই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিকল্পনার পন্থাসমূহ (Systems of Planning)

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার বিভিন্ন ধরনের পন্থা আছে এবং একটি বিশেষ খেলায় সর্বোচ্চ পারফরমেন্স অর্জনের জন্য ক্রীড়াবিদকে সব ধরনের পন্থা বা পদ্ধতি অনুসরন করতে হবে।

নিম্নে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার পন্থা বা পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করা হল-

১। দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নমুলক পরিকল্পনা (Long term Development Plan)
২। অলিম্পিক পরিকল্পনা (Olympic Plan)
৩। বার্ষিক পরিকল্পনা (Annual Plan)
৪। সেকশনাল পরিকল্পনা (Sectional Plan)
৫। ডে-পরিকল্পনা (Day's Plan)

১। দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নমুলক পরিকল্পনা
(Long term Development Plan)

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার সবচেয়ে বৃহত্তম পরিকল্পনা হলো দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নমুলক পরিকল্পনা। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মূলত ৮ বছর থেকে ১৫ বছরের জন্য করা হয়ে থাকে। খেলোয়াড়দের সাধারণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ ধরনের পরিকল্পনার সূচনা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট খেলা সর্বোচ্চ পারফরমেন্স অর্জনের প্রস্তুতি করা পর্যন্ত এটি চলতে থাকে। এ ধরণের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণের প্রধান প্রধান কাজসমূহ প্রশিক্ষণ

পদ্ধতি ধরণ প্রশিক্ষণের সময় পর্যায়, প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফলাফল সবকিছু লিখিত আকারে থাকে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আদর্শগত খেলোয়াড় তৈরির জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় পরিশোধ ও পরিমার্জণ করা হয়।

২। অলিম্পিক পরিকল্পনা

(Olympic Plan)

অলিম্পিক পরিকল্পনা প্রতিযোগিতার ধরন অনুযায়ী মূলত ৪ বছরের জন্য হয়ে থাকে। এই পরিকল্পনা মুলত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং পরবর্তী অলিম্পিক গেমস শুরু হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। অলিম্পিক পরিকল্পনা প্রধানত কোন ফেড়ারেশন বা সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই ধরনের পরিকল্পনায় খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ পারফরমেন্স অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

অলিম্পিক পরিকল্পনা যেসব বিষয়ে বিশেষ ভাবে বিবেচ্য সেগুলো নিম্নরূপ:

১। ক্রীড়া চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়।
২। পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণর লোড সময় ও বিষয়বস্তুগুলো পর্যবেক্ষণ।
৩। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পারফরমেন্স সংক্রান্ত ধারনা গ্রহণ।
৪। মটর দক্ষতা ও মটর সক্ষমতার বর্তমান অবস্থা জানা।
৫। প্রতিযোগিতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীর মানসিক অবস্থা ও মনোভাব জানা।
৬। খেলার প্রতি প্রশিক্ষণার্থীর আস্থা ও ইচ্ছা।

এ ছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীর কিছু ব্যক্তিগত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হয় যেমন-

- ব্যক্তিগত তথ্য
- পারফরম্যান্সের ফলাফলের বিশ্লেষণ।
- ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ।
- প্রশিক্ষণার্থীর প্রধান লক্ষণসমূহ ও তার বাৎসরিক ফলাফল।
- বিভিন্ন বছরের প্রধান প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
- প্রধান প্রতিযোগিতামূলক কাজসমূহ।
- অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য খেলোয়াড়ী মনোভাব ইত্যাদি।

৩। বার্ষিক পরিকল্পনা

(Annual Plan)

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রধানত ১ বছরের জন্য হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিকল্পনা মূলত প্রতিযোগিতার ধরন ও সময় অনুযায়ী হয়ে থাকে। বছরের যে কোন সময় এ ধরনের প্রতিযোগিতা হতে পারে। জানুয়ারি থেকে জানুয়ারি হবে এমন কোন কথা নয় এপ্রিল মে যে কোন সময় হতে পারে। বার্ষিক পরিকল্পনার যেসব রেকর্ড রাখতে হয় সেগুলো হলো-

- প্রশিক্ষণার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য
- পারফরমেন্সের ফলাফলের বিশ্লেষণ।
- ব্যক্তিত্বের ফলাফল বিশ্লেষণ
- পারফরমেন্স সংক্রান্ত লক্ষণসমূহ।
- প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায় প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কাজ সমূহ।
- প্রশিক্ষণ লোড সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গ্রহণ ।

- শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ।
- শিক্ষামূলক কাজ।
- প্রতিযোগিতামূলক কাজ।
- প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ।
- সময়মত ফলাফলের মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ।

৪। সেকশনাল পরিকল্পনা
(Sectional Plan)

সারা বছরের প্রশিক্ষণের সময়কে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায় যেমন-প্রস্তুতি মূলক পর্যায়, প্রতিযোগিতামূলক পর্যায় ও অবস্থানগত পর্যায়। আবার চক্র হিসেবে ক্ষুদ্রচক্র, মাঝারী ক্ষুদ্রচক্র এবং অতি ক্ষুদ্রচক্র হিসেবে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো সব সেকশনাল পরিকল্পনা।

চক্র হিসেবে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাকে নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল–

ক) ক্ষুদ্র চক্র (Macro Cycle)
খ) মাঝারী চক্র (Meso Cycle)
গ) অতিক্ষুদ্র চক্র (Micro Cycle)

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার চক্রগুলো সর্ম্পকে নিচে আলোকপাত করা গেল:

ক) ক্ষুদ্র চক্র (Macro Cycle)

এই চক্রের সময়কাল ৩ থেকে ১২ মাস। সাধারণত এই চক্রকে বৃহত্তম চক্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই চক্রের মূল উদ্দেশ্য হল একটি নির্দিষ্ট সময় বিশেষ করে প্রতিযোগিতার সময় একজন খেলোয়াড়কে সর্বোচ্চ পারফরমেন্স অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা। এই চক্রকে আবার কয়েকটি মাঝারি চক্রে ভাগ করা হয়। সর্বশেষ চক্রে রিকভারি ও রিল্যাকজেশন নিশ্চিত করা হয়।

খ) মাঝারী চক্র
(Meso Cycle)

এই চক্রের সময়কাল ৩ থেকে ৬ সপ্তাহ। সাধারণত এই চক্রকে মধ্যম পর্যায়ের চক্র হিসেবে বিবেচনা হয়। মাঝারী চক্রের চতুর্থ সপ্তাহকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এই সময় শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়। এই চক্রের শেষের সময় রিকভারি ও রিল্যাকজেশন নিশ্চিত করা হয়।

এই চক্রের মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

i) দক্ষতার মাস্টারি অর্জন ও শিক্ষণ।
ii) পারফরমেন্স নিয়ন্ত্রন ও স্থায়ীকরণ।
iii) শারীরিক ও মটর সক্ষমতার উন্নতি সাধন।
iv) বিশেষ প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতকরণ।
v) সর্বোচ্চ পারফরমেন্স অর্জন।

গ) অতি ক্ষুদ্র চক্র (Micro Cycle)

এই চক্রের সময়কাল হল ৩ থেকে ১০ দিন। এই চক্রে সাধারণত মধ্যম ও উচ্চতর পারফরম্যান্স সম্পূর্ণ খোলোয়াড়দের নিয়ে কাজ করা হয়। চক্রের সর্বশেষ দিনে রিকভারি ও রিল্যাকজেশন নিশ্চিত করা হয়

পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার জন্য । যদি ৩-১০ দিন প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সময় নয়। তবুও এই সময়টা প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫। ডে-পরিকল্পনা

(Day's Plan)

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা পদ্ধতির সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পন্থা হলো ডে-পরিকল্পনা। এ ধরনের পরিকল্পনা খুব ছোট হলেও এর বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট থাকে। ডে-পরিকল্পনা যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলো নিম্নরুপ:

- প্রশিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ এবং এর প্রয়োজীয়তা।
- প্রধান প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট অনুশীলন করা।
- টেকনিক্যাল এবং কৌশলগত প্রশিক্ষণের জন্য প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ নির্ধারণ।

এছাড়াও যেসব বিষয় দেখতে হবে তা হলো:

- কোচের ডায়েরী
- প্রশিক্ষণার্থীর ডায়েরি
- প্রতিযোগিতার ফলাফল পর্যবেক্ষণ।
- প্রশিক্ষণার্থী সম্পর্কে ক্রীড়া চিকিৎসকের রিপোর্ট।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Darden .E.(1972). 16 PF Profiles of Competitive Body-Builders and Weightlifters Research Quaterly.

Hackman Carcel (1978). Influential factors in the Development of Sports for Women. Physical Education Review.

Hebbelnck, M.(1988). Flexibilty in Olympic book of Sports Medicine.

Kenyon, G.S.(1977). The Process of Becoming on Elite Athlete in Canada . In Post-olympic Games Symposium, edited by Taylor. Ottawa: The Coaching Association of Canada.

Matveyew L. P. Fundamentals of Sports Training (Moscow: Progress Publishers)

Paish Wilfred. The Complete Manual of Sports Science, A and C Black London, 1998

Roleb, M.(1972). Dynamics of Motor Skill acquisition .W. Saunder Publishers, New York.

Singh Hardayal (1991). Science of Sports Training.

Singh H. Sports Training: General Theory and Methods (Patiala: NSNIS)

Tandon D. K, Uppal A. K. (2001), Alegaonkar P. M. and Singh Kanwaljeet. Scientific Basis of Physical Education and Sports. Friends Publication (India), Delhi.

Tandon, D.K.et al(2001) Scientific Basis of physical Education & Sports.

Counsilman, J.E.(1977). Competitive Swimming manual for coaches and Swimmers. Counsilman Co. Inc.Bloomington.

Uppal A. K. (2001). Scientific Principles of Sports Training. Friends Publication (India), Delhi.

স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বি-স্পোর্টস ডিগ্রীর সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত

মো. বখতিয়ার
সাদেকা ইয়াসমিন
মোহাঃ শফিকুল ইসলাম

মুখবন্ধ

বইটি মূলত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি স্পোর্টস কোর্সের সিলেবাস অনুযায়ী রচিত। ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বাংলা বই এর অপ্রতুলতার কারণে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের নিজস্ব ভাষায় অধ্যয়নের সুবিধার্থে বইটি রচনা করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন বই, ইন্টারনেট, ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে কাজে লাগিয়ে স্পোর্টস ফিজিওলজি, স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স ও স্পোর্টস সাইকোলজি বিভাগের তিনজন ক্রীড়াবিজ্ঞানীর যৌথ প্রচেষ্টায় বইটি সম্পন্ন হয়েছে। বইটি ছাত্র ছাত্রীদের অধ্যয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

বইটি লেখার কাজ সম্পন্ন করতে যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা পেয়েছি তাদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মো. বখতিয়ার
সাদেকা ইয়াসমিন
মোহা. শফিকুল ইসলাম

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়----------১৩২

ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা

দ্বিতীয় অধ্যায়----------১৩৪

ক্রীড়া সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

তৃতীয় অধ্যায়----------১৩৯

ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব

চতুর্থ অধ্যায়----------১৪৩

ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতা

পঞ্চম অধ্যায়----------১৪৬

বাজেট ও পরিকল্পনা

প্রথম অধ্যায়: ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা

স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট (Sports management)
স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট হলো ক্রীড়া শিক্ষার এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে ক্রীড়া ও বিনোদন বিষয় সমূহের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।
উদাহরণস্বরূপ: ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা, ক্রীড়া বিপনন, ক্রীড়া অর্থনীতি ইত্যাদি ।
ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম (Function of Sports management)।
ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমকে চার ভাগে ভাগ করা যায় । যথা-:

১। পরিকল্পনা (Planning)

২। সংগঠন (Organizing)

৩। পরিচালনা (Leading)

৪। নিয়ন্ত্রণ (Controlling)

১। পরিকল্পনা (Planning)

ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম-এ প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিকল্পনা। এই ধাপে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুবিস্তৃত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করাই ব্যবস্থাপকের প্রধান কাজ। সংগঠন ও তার সদস্যদের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা পূরণের জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা। যেমন: একজন খেলোয়াড় জাতীয় প্রতিযোগিতার সময় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

পরিকল্পনার প্রকারভেদ (Types of Planning)
পরিকল্পনা দুই প্রকার-
ক) কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic planning)
খ) কার্যগত পরিকল্পনা (Opperating Planning)

২। সংগঠন (Organizing)
ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে সংগঠিত করা। এই ধাপে ক্রীড়া ব্যবস্থাপকের কাজ হলো সম্পদ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠনের সদস্যদের সংগঠিত করে কার্য সম্পন্ন করা ।

একজন সফল ক্রীড়া ব্যবস্থাপক তার পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য সংগঠনের সদস্যের ছোট ছোটো পরিকল্পনা ও বিভিন্ন পন্থার মাধ্যমে চেষ্টা করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি লিগ টুর্নামেন্ট সম্পৃক্ত কর্মরত সকল সদস্যদের (যেমন, কোচ, সহকারী, ইকুইপমেন্ট ম্যানেজার ও পরিচ্ছন্ন কর্মীসহ অন্যান্য) সংগঠিত করে কার্য পরিচালনা করা।

৩। পরিচালনা (Leading)

পরিচালনা হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মরত সদস্যদের প্রবাহিত করার প্রক্রিয়া। শুধু কর্মরত সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখাই ক্রীড়া ব্যবস্থাপকের কাজ নয়, তাকে অবশ্যই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সদস্যেদের প্রেরণা যোগাতে হবে। সফল নেতৃত্বে অবশ্যই সদস্যদের সম্পর্কে ভালো জানতে হবে এবং দক্ষতার সহিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

৪। নিয়ন্ত্রণ (Controlling)

ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এর শেষ ধাপ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া। একজন ব্যবস্থাপকের কাজ হলো উদ্দেশ্য অনুযায়ী কতটুকু ফলাফল অর্জিত হয়েছে তা মূল্যায়ন করা। যদি লক্ষ্য অর্জিত না হয় সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের কাজ হলো উক্ত পরিকল্পনা প্রয়োজনে সংশোধন করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ক্রীড়া সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংগঠন ছাড়া কোনো দল বা সাংগঠনিক কাজ করা সম্ভব নয়। আর শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সংগঠন ছাড়া কোনো দল তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। তাই শারীরিক শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুণাবলি মেনে চলা একজন প্রশাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সংগঠন

কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কতগুলো লোক সমবেত হয়ে তা সফল করে তোলার জন্য যোগ্যতানুসারে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নেয়াকে 'সংগঠন' বলে।

সুতরাং সংগঠন হলো কতগুলো লোকের সমবেত প্রচেষ্টার ফল, আবার কোনো কিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে কর্মীবৃন্দকে কাজে লাগানোকেই 'সংগঠন' বলে।

আবার অন্যভাবে বলা যায় যে, 'সংগঠন হলো একটি ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা, যা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল বা সম্পর্কযুক্ত'। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায়, বিভিন্ন একককে বা লোককে একত্রে করে ধারাবাহিকভাবে কাজ করা বা অপরের প্রতি নির্ভরশীল বা সম্পর্কযুক্ত হওয়াকে বোঝায়।

আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক হার্বার্ট কফম্যান (Herbert Kaufman) সংগঠনের সংজ্ঞায় বলেছেন- 'An organized structure, body systematic arrangement for specific purpose and organized whole.'

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে মূল বক্তব্য দাঁড়ায়, নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের সমবেত প্রচেষ্টা ও তাদের ভেতর সহযোগিতার মনোভাবই হলো সংগঠন।

সংগঠনের নীতিমালা

প্রত্যেক সংগঠনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে, যাতে প্রাথমিক পর্যায় হতে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। মাঝি ছাড়া নৌকা যেমন- সঠিক দিকে চলতে পারে না, তেমনি নীতি ছাড়া কোনো সংগঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। নিম্নে কয়েকটি নীতি বর্ণনা করা হলো-

- **জনকল্যাণমুখী হবে-** সব সংগঠনের মূলেই জনগণ। জনগণের কল্যাণ ছাড়া কোনো সংগঠন টিকতে পারে না। সংগঠনের মূল নীতিই হলো জনগণের কল্যাণ সাধন করা।

- **বিনোদনমূলক-** যেহেতু আমরা খেলাধুলার সংগঠন নিয়ে আলোচনা করেছি সেহেতু জনগণ যাতে দৈনন্দিন কাজের একঘেয়েমি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেদিকেই সংগঠনের লক্ষ্য।
- **অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা থাকবে-** অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা না থাকলে কোনো কল্যাণমুখী বা সেবামূলক কাজ করা যায় না। সেজন্য সংগঠনের মূল উদ্দেশ্যই থাকবে অর্থনৈতিভাবে স্বাবলম্বী হওয়া।
- **সমাজ ও পবিেশের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে-** সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে কাজ হাতে নিতে হবে। সব পরিবেশে সব ধরনের কাজ করা যায় না। সেজন্য সমাজ ও পরিবেশের ওপর লক্ষ্য রেখে সংগঠনের কার্যাদি পরিচালনা করা হবে।
- **অরাজনৈতিক হবে-** সামাজিক সংগঠন সব সময় অরাজনৈতিক হবে। রাজনৈতিক হলে কোন্দল, মারামারি ইত্যাদি বেড়ে যাবে। কোনো কল্যাণমুখী কাজ হবে না এবং সংগঠন টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে।
- **সমস্ত সদস্যদের অধিকার ও তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে হবে-** সংগঠনের সমস্ত সদস্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে এবং তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারী শাসন চালালে সংগঠন টিকবে না; বরং সংগঠনে ভাঙ্গন ধরবে।
- **স্বাবলম্বী হওয়ার সংকল্প থাকতে হবে-** একটি সংগঠনে অর্থ, জনবল ইত্যাদি না বাড়লে অর্থাৎ নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে তা কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত বা স্বাবলম্বী হতে পারে না। এজন্য সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মীর প্রয়োজন আছে।

পরিশেষে বলা যায়, সংগঠনের সকল সদস্যকে সুসংগঠিত করে স্বার্থ হাসিলের জন্য নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে কাজ করতে হবে। এতেই সংগঠন সঠিকভাবে পরিচালিত হবে।

যোগ্য প্রশাসকের গুণাবলি

প্রশাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যাপারে স্বভাবতই একজন দক্ষ প্রশাসকের প্রয়োজন। প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালনার ভার একজন আদর্শ প্রশাসকের ওপরই ন্যাস্ত হয়। যদি প্রশাসক দুর্বল হয় তা হলে প্রশাসনিক কাঠামোও ভেঙ্গে পড়বে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে প্রশাসনিক যোগ্যতার চাবিস্বরূপ একটি শব্দ প্রচলিত ছিল। শব্দটি হলো ‘‘POSDCRB’’ অর্থাৎ P=Programme, O=Operating, S=Staffing, D=Direction, C=Co-ordiniting, R=Reporting , B=Budgeting.

উল্লিখিত শব্দটি পর্যালোচনা করলে একজন প্রশাসকের কী কী গুণ বা যোগ্যতা থাকবে তা পরিলক্ষিত হয়।

একজন দক্ষ প্রশাসকের গুণাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে- প্রশাসনকার্যে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রশাসনকার্যে অভিজ্ঞতা না থাকলে অধীনস্থ কর্মচারীর ওপর নির্ভর করতে হবে। যদি প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ওপর তার কোনো দক্ষতা না থাকে, সে প্রশাসন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

২. কথায় ও কাজে সংগতি থাকতে হবে- প্রশাসকের কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে। এ কাজ করব, ও কাজ করব, কিন্তু পরে দেখা গেল কাজের বেলায় কিছুই হলো না, তা হলে অধীনস্থ কর্মচারীরা তাকে গুরুত্ব দেবে না, বরং দায়িত্বহীন বা বাজে লোক মনে করবে। তাই কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে।

৩. সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে স্বাবলম্বী হতে হবে- জরুরি কোনো অবস্থার জন্য ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এজন্য নিজের চিন্তা শক্তি ভালো থাকতে হবে। তবে, প্রয়োজনবোধে অন্যের কাছ থেকেও উপদেশ নেওয়া যেতে পারে।

৪. শারীরিক যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে- প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে চাকরির যোগ্যতাস্বরূপ তার স্বাস্থ্য অবশ্যই ভালো থাকতে হবে। নচেৎ প্রশাসনিক কার্য চালানো সম্ভব হবে না।

৫. ন্যায়পরায়ণ হতে হবে- অধীনস্থ সকল কর্মচারীকে একচোখে দেখতে হবে। নিজের কাছে সবাইকে সমান মনে করতে হবে। পক্ষপাতিত্ব করলে সবাই তাঁকে ভেতরে ভেতরে ঘৃণার চোখে দেখবে। তাই কোনো প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করার সময় নিজেকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।

৬. কাজের খুঁটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে- একজন দক্ষ প্রশাসকের তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজের ব্যাপারে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। কী কী কাজ তার প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হচ্ছে এবং কোনোটির দায়িত্ব কার ওপর ছিল এবং কোনো দায়িত্ব নিজের কাছে রাখলে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো বাস্তবায়িত করা যাবে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭. সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে- সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাস একজন দক্ষ প্রশাসকের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। যদি অধীনস্থ বা সহকর্মীদের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস না থাকে, তা হলে কোনো সময়ই ভালো ফল আশা করা যায় না। কারণ, প্রশাসক একা কোনোদিন সব কাজ করতে পারে না। বিভিন্ন লোকের ওপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। সুতরাং অধীনস্থ সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে।

৮. টেকনিক্যাল দক্ষতাসম্পন্ন হতে হবে- একজন প্রশাসক প্রশাসনিক কার্যে অনেক সময় অনেক রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তা অবস্থা বুঝে কৌশলে বা টেকটিক্যাল সমাধান করতে হবে। কারণ, তাঁর একক আদেশের ওপর গোটা প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে। এটা শুধু টেকনিক্যাল দক্ষতার দ্বারাই সম্ভবপর হয়।

৯. ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে- একজন দক্ষ প্রশাসককে অবশ্যই একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক হতে হবে। তার চাল-চলন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছু মিলে তাঁকে একজন আদর্শ ব্যক্তিতে পরিণত হতে হবে। কথাবার্তা অত্যন্ত মার্জিত ও বুঝে-সুজে কথা বলতে হবে। কথাবার্তার বিষয়ে যেন কোনো রকমের ছেলেমিভাব বা অনাবশ্যকতা না থাকে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। তা হলেই একজন দক্ষ প্রশাসকে পরিণত হওয়া সম্ভবপর হবে।

১০. প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক- একজন যোগ্য প্রশাসক যে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করবেন সে প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবশ্যই তাঁকে আন্তরিক হতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, একজন দক্ষ প্রশাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হলে তাকে উল্লিখিত গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে।

শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা, ব্যায়াম, স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ও বিনোদনমূলক যে সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, তাকে শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচী বলে।

শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-

- অত্যাবশ্যকীয় কার্যাবলি (Service programme)
- আন্তঃ বা ইন্ট্রামুরাল ক্রীড়া (Intramural Sports)
- বহিঃ বা এক্সট্রামুরাল ক্রীড়া (Extramular Sports)

অত্যাবশ্যকীয় কার্যাবলি (Service programme)

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে সরকারি নির্দেশাবলি, শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক ক্লাস, প্রতিযোগিতা, সমাবেশ ও স্থানীয় প্রস্তাবলি ইত্যাদি সবই সার্ভিস প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত, যা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে একজন শারীরিক শিক্ষককে পালন করতে হবে। অত্যাবশ্যকীয় কার্যাবলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ যথা-

১. শারীরিক উন্নতির দিক:

- শারীরিক শিক্ষা কারিকুলামে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যাতে সঠিকভাবে ব্যায়ামের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করতে পারে, তার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ থাকতে হবে।
- ছেলে-মেয়েরা যে সমস্ত কাজ করতে পারে, তা দেখে একটি পৃথক তালিকা তৈরী করতে হবে।
- কারিকুলাম কাঠামোতে ছেলে-মেয়েদের উন্নতি ও শারীরিক বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

২. মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বা মানবিক উন্নতির দিক:

- শারীরিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম পূর্বের যুগের প্রাকৃতিক খেলাধুলা বা কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে গঠন করতে হবে।
- কার্যকলাপের গুরুত্ব অনুসারে কোনোটার পর কোনোটা করবে, তা উল্লেখ থাকতে এবং উক্ত কলাকৌশলগুলো শেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

৩. সামাজিক উন্নতির দিক:

- এমন ধরনের কার্যকলাপ রাখা উচিত যাতে, আমাদের ছেলেমেয়েরা সমাজে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

- পাঠ্যক্রম কার্যকলাপ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তা সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়। ছেলেমেয়েরা যাতে ভবিষ্যতে খারাপ কাজ হতে দূরে থাকতে পারে বা সমাজে যোগ্য স্থান দখল করে নিতে পারে।

আন্তঃ বা ইন্ট্রামুরাল ক্রীড়া (Intramural Sports)

ইন্ট্রামুরাল একটি ল্যাটিন শব্দ। Intra অর্থ Within বা ভেতরে এবং Muralis অর্থ Wall বা দেয়াল। তা হলে এর পুরো অর্থ হয় দেয়ালের ভিতরে। অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠানের চারি দেয়ালে বা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আকারে যে সমস্ত খেলাধুলা হয় তাকে আন্তঃ বা ইন্ট্রামুরাল ক্রীড়া বলে। যেমন- অ্যাথলেটিক্স,জিমন্যাস্টিক্স ইত্যাদি।

ইন্ট্রামুরাল খেলার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব: প্রতিটি প্রতিযোগিতার কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে যেমন-

- একজন খেলোয়াড়কে শারীরিক,সামাজিক ও বুদ্ধিমত্তায় বলীয়ান করে গড়ে তোলা যা সাধারণ শিক্ষার পক্ষে সম্ভবপর নয়।
- ইন্ট্রামুরাল অবসর সময় অতিবাহিত করার সুযোগ করে দেয়।
- শরীরকে বৃদ্ধি ও মজবুত করে। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বাড়ায়।
- প্রতিযোগিতা হতে যে সামাজিকতা লাভ করা যায়, তা ভবিষ্যতে কাজে লাগে।
- সত্যিকার চ্যাম্পিয়নকে খুঁজে বের করা যায়।
- এ প্রতিযোগিতায় অনেক সংখ্যক ছেলে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।
- প্রতিযোগিদের ভেতর বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি গড়ে তোলে, যা পরবর্তী জীবনেও কাজে লাগে।

বহিঃ বা এক্সট্রামুরাল ক্রীড়া (Extramular Sports)

Extra অর্থ বাইরে, Mural অর্থ দেয়াল, পুরো অর্থ হয় দেয়ালের বাইরে যে সমস্ত প্রতিযোগিতা করা হয়। যেমন-আন্তঃ স্কুল, আন্তঃ ইউনিভার্সিটি বা একটি ক্লাবের সাথে অন্য ক্লাবের ইত্যাদি খেলাগুলোকে Extramural খেলা বলে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের জন্যই প্রশাসন ও সংগঠন দরকার এবং এ দুটি একে অপরের পরিপূরক। তাই একটি আদর্শ ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সংগঠন-প্রশাসনের সুষ্ঠু ব্যবহার অপরিহার্য।

তৃতীয় অধ্যায়: ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে 'নেতৃত্ব' শব্দটির সাথে আমরা অত্যন্ত পরিচিতি। প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনধারায় বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব সৃষ্টিকারী আচরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন- একটি পরিবারে মা ও বাবার মধ্যে, মা বাবা ও শিশুর মধ্যে, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে, রাজনীতিবিদ ও তার অনুগামীদের মধ্যে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে। মোটের উপর বলা যায় যে, যেখানেই দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো ক্রিয়া সাধন করেন সেখানেই একজন নেতার ভূমিকায় থাকেন এবং অন্যজন অনুগামীর ভূমিকা পালন করেন এবং যিনি নেতার ভূমিকায় থাকেন তার আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ অন্যজনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

নেতৃত্ব (Leadership)

নেতা ও 'নেতৃত্ব' শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে এই শব্দ দুটি একই অর্থ প্রকাশ করে না। নেতৃত্ব হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে নেতা, অনুগামী এবং পরিস্থিতি এই তিনটি উপাদান কার্যকরী হয়। নেতা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করলেও তার কাজই কেবলমাত্র নেতৃত্ব নয়। অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এবং পরিস্থিতির চাহিদা ও বৈশিষ্ট্য হলো নেতৃত্ব প্রক্রিয়ায় অবিচ্ছেদ্য অংশ। নেতৃত্ব মূলত কোনো পরিস্থিতিতে নেতা ও অনুগামীদের সম্পর্কের ফলশ্রুতি । বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী নেতৃত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

১. হল্যান্ডার ও জুলিয়ান (১৯৬৯) বলেন যে, 'নেতৃত্ব একটি দ্বিমুখী প্রভাবের সম্পর্ক' অর্থাৎ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা ও তার অনুগামীদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশা করেন আবার অনুগামীরাও নেতার কাছ কিছু পাবার আশা করেন।

২. মনোবিজ্ঞানী লাপিয়ের ও ফ্রান্সওয়ার্থ "Leadership is a behavior that effects the behavior of others people more than their behavior effects that of the leaderd" অর্থাৎ অপর ব্যক্তিদের আচরণ নেতাকে যতখানি না প্রভাবিত করে, নেতৃত্ব হলো সেই আচরণ যা অপর ব্যক্তিদের আচরণকে অধিকতর প্রভাবিত করে।

৩. মনোবিজ্ঞানী বার্নার্ড এম বাস এর মতে "নেতৃত্ব হলো দুই বা ততোধিক সদস্যের মধ্যে এক প্রকার পারস্পরিক কার্যকলাপ। যখন কোনো দলীয় সদস্য দলের এক বা একাধিক সদস্যের আচরণকে পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হয়, তখনই নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়।"

'নেতৃত্ব' বিষয়ক আলোচনায় প্রভুত্বব্যঞ্জক ও গণতান্ত্রিক (Authoritative and Democratic Leadership) নেতৃত্বের পার্থক্য বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়। এ দু ধরনের নেতৃত্বের মূল পার্থক্য হলো প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে অনুগামী বা দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ কম কিন্তু গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতা ও অনুগামী উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ, তাই অনুগামীরাও সমানভাবে অংশ নিয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে সদস্যদের মতামত নেয়া জরুরি কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে এর বাধ্যবাধকতা নেই। নিম্নে এদের পার্থক্য দেয়া হলো-

প্রভুত্বব্যঞ্জক ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের পার্থক্য

গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব	প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্ব
১। গণতান্ত্রিক নেতারা কোনো সমস্যা সমাধানে দলীয় সদস্যদের সাথে সর্বদা সক্রিয় সহযোগিতা করে থাকেন।	১। প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতারা যে কোনো সমস্যা সমাধানে দলীয় সদস্যদের তেমন সাহায্য করে না ।
২। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে সব সদস্যই অংশগ্রহণ করে বলে এতে নেতা ও অনুগামী সবাই বেশি সন্তুষ্ট থাকেন ।	২। কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জ নেতৃত্বে অনুগামীরা অংশগ্রহণ করতে না পারায় তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা যায়।
৩। গণতান্ত্রিক নেতারা অনেক বেশি সহনশীল হয়ে থাকেন ।	৩। প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতারা যেহেতু একক ক্ষমতার অধিকারী তাই তাদের সহনশীলতা কম ।
৪। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতা দলীয় লক্ষ্য অর্জনকে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধান্য দেন ।	৪। কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে নেতা অনেক সময় দলীয় লক্ষ্য অপেক্ষা ব্যক্তিগত লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন ।
৫। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে পারস্পরিক যোগাযোগের মাত্রা অনেক বেশি এবং নেতা কেন্দ্রীয় ভূমিকায় থাকলেও তিনি মূলত দলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন ।	৫। প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বের কাঠামো দলের বিভিন্ন সদস্যের পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ককে খর্ব করে।
৬। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে মতবিরোধের প্রতি সহনশীল এবং কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এরুপ নেতৃত্ব মতামত বিনিময়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।	৬। এ ধরণের নেতৃত্বে যে কোনো মতবিরোধ কম সহ্য করা হয়। তাই কোনো সমস্যা সমাধানে মতামত বিনিময়কে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না ।
৭। গণতান্ত্রিক নেতৃতে যে কোনো সিদ্ধান্তই নেতা এককভাবে নিতে পারে না। সেখানে অনুগামীদেরও অংশগ্রহণ থাকে, এ কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় লাগে।	৭। কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃতে নেতা-ই সব সিদ্ধান্ত এককভাবে নিয়ে থাকেন। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় অনেক কম লাগে।
৮। গণতান্ত্রিক নেতারা দলীয় সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন।	৮। প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতারা এসব বিষয় অনেক সময় গুরুত্ব দেন না।
৯। যে কোনো সমস্যা-ই গণতান্ত্রিক নেতারা অনুগামীসহ সংঘবদ্ধভাবে মোকাবেলা করেন।	৯। প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতারা একক নেতৃত্বে সিদ্ধান্তে সমস্যা সমাধান করেন।
১০। নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক নেতা অনুগামীদের মতামত নিয়েই নীতিমালা প্রণয়ন করেন।	১০। প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে নীতিমালা প্রণয়নেও নেতা অনুগামীদের মতামতকে প্রাধান্য দেন না।
১১। গণতান্ত্রিক নেতারা দলের নেতার প্রতি সহানুভূতি দেখান তার কাজে সাহায্য করেন কিন্তু এতে বাধ্যবাধকতা থাকে না।	১১। প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতারা বাধ্য হয়েই দলের প্রতি এবং দলের নেতার প্রতি নমনীয় থাকে।
১২। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতার স্বল্প সময়ের উপস্থিতি কাজে তেমন কোনো বাধার সৃষ্টি করে না।	১২। প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে যেহেতু নেতাই সর্বেসর্বা সেহেতু তার উপস্থিতি কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

১৩। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বেশি কার্যকরী ও ফলপ্রসূ।	১৩। কিন্তু জরুরি সঙ্কট মোকাবেলায় প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বেই বেশি কার্যকরী।
১৪। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব যোগ্যতা, দক্ষতা ইত্যাদি গুণের মাধ্যমে নেতৃত্ব অর্জন করতে হয়।	১৪। কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে নেতা নেতৃত্ব ইচ্ছানুসারে বা গায়ের জোরেই অনেক সময় নিয়ে নেন।
১৫। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতা সব সময় আমরা হিসেবে চিন্তা করে।	১৫। কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে নেতার মধ্যে 'আমি' অনুভূতিটাই সবচেয়ে বেশি কাজ করে।

নেতৃত্বের ধরণ ও কার্যাবলি:

নেতার প্রকৃতি কী তার উপর ভিত্তি করেই নেতার কাজগুলো বা নেতৃত্বদান পরিচালিত হয়।
গণতান্ত্রিক ও প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতার ভূমিকা (Role of Democratic & Authoritative Leadership):

প্রথমত: নেতার প্রথম কাজ হিসেবে বলা যায় নির্বাহী হিসেবে তার দায়িত্ব পালন। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নেতা বা প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতা উভয়কেই দলের মূলনীতি নির্ধারণ করতে হয়। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নেতা মূলনীতি স্থির করার সময় তার নিজের মতামতের সাথে সাথে অনুগামীদের মতামতের উপরও সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতারা অনুগামীদের মতামতের কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করে না এবং নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন ।

দ্বিতীয়ত: দলের অভ্যন্তরে একটি সাবলীল সুসম্পর্ক বজায় রাখা নেতার অন্যতম কাজ। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে এ কাজ সুন্দরভাবে পালন সম্ভব কেননা অনুগামীরাও এখানে মতামত দেয়ার ক্ষমতা রাখে। তাই নেতা ও অনুগামী সবার মধ্যে একটি সুসম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে নেতার কাঠিন্যের জন্য বা অনুগামীদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলার দায়ে এ ধরনের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে না।

তৃতীয়ত: নেতা দলের একজন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে নেতার এই প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে দলের অন্য সবাইকে ছোটো করে নিজেকে সবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করেন অর্থাৎ দল বলতে তাকেই বোঝাতে চান কিন্তু এই কাজে গণতান্ত্রিক নেতা শুধুমাত্র প্রতিনিধির দায়িত্বটুকুই পালন করেন নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা প্রকাশ করা তার উদ্দেশ্য নয়।

চতুর্থত: পুরষ্কার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ও প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতার কাজে সবচেয়ে বেশি পার্থক্য দেখা যায়। গণতান্ত্রিক নেতা অনেকটাই নমনীয় থাকেন। তাই, তিনি যথাযথভাবে পুরস্কার ও শাস্তি প্রয়োগ করেন এবং শাস্তির চেয়েও অনেক সময় পুরস্কারকেই গুরুত্ব দেন কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতা মনে করেন পুরুস্কারের চেয়ে শাস্তির মাধ্যমেই তিনি অনুগামীদের ভালভাবে নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন আর তাই অনেক সামান্য কারণেও প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতা শাস্তি দিয়ে থাকেন।

পঞ্চমত: গণতান্ত্রিক নেতার নেতৃত্ব হলো উদ্ভূত নেতৃত্ব অর্থাৎ এই ধরনের নেতার নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য দলের অনুগামীদেরও সমর্থন প্রয়োজন হয়, তাদেরকেও গুরুত্ব দিতে হয় কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্ব যেহেতু নিযুক্ত নেতৃত্ব তাই অনেক সময় তিনি আগ্রাসী ও স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন।

৬ষ্ঠত: বিচারক ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনও নেতার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজে নেতাকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতা কারও কাছে কোনো কাজের কৈফিয়ত দেন না। তাই তার কাছ থেকে অনেক সময় পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। কিন্তু গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব হচ্ছে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা, তাই এ কাজ সম্পাদনে নেতা যদি পক্ষপাতিত্ব করেন তাহলে তাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়।

সপ্তমত: নেতা একজন অভিবাবক, অর্থাৎ সদস্যদের অভিভাবক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এই কার্যসম্পাদন অবশ্যই প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে ভালো হয় কেননা প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে নেতাই সব সিদ্ধান্ত নেন। যেটা তিনি ভালো এবং উপযুক্ত বলে মনে করেন অভিভাবক হিসেবে যা খুবই প্রয়োজন কিন্তু গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হয় বলে নেতা একা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাই গণতান্ত্রিক নেতা তার এই কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারে না।

অষ্টমত: নেতাকে সদস্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বা আদর্শরূপে নিজেকে তুলে ধরতে হয় অর্থাৎ যে বিশ্বাস বা ন্যায় নীতি দলের জন্য প্রয়োগ করেন ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এর প্রযোগ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এর প্রয়োগ কতটা করেন তা অনুগামীরা অনুকরণ করেন। যেহেতু প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বে কৈফিয়ত দেয়ার প্রয়োজনটা অনেক কম সেহেতু ব্যক্তিগত জীবনে স্বৈরাচারী নেতা অনেক সময় নিজেই নিয়ম-কানুন বহির্ভূত জীবন যাপন করেন এবং নিজেকে আদর্শ বা মডেল হিসেবে উপস্থাপন করার দায় থাকে না। গণতান্ত্রিক নেতার এই সম্ভাবনা কম তবে এমন নয় যে গণতান্ত্রিক নেতাও এমন হবেন না।

নবম: স্বৈরাচারী নেতা দলের সদস্যদের কাছে প্রায়ই সময় দলের পরিকল্পনা, আদর্শ বা ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গোপন করেন ফলে অনুগামীরা দলের নেতা ও দল থেকেই অনেক সময় দূরে সরে যায়।

দশম: দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি যে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতা প্রায় সময়ই আগ্রাসী ভেদী ও বহির্মুখী হয়ে ওঠেন। এর কারণ হিসেবে তার একা ক্ষমতা ভোগের অধিকারই দায়ী, কিন্তু গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতা নমনীয় ও সহযোগী মনোভাব সম্পন্ন হয়ে থাকেন। এছাড়া তার কার্য সম্পাদন সফল হয়ে ওঠে না।

সর্বোপরি, একজন নেতার কার্যাবলির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা তার কার্যাবলি দলীয় উন্নতি এবং দল টিকে থাকার বিষয় নির্ধারণ করে। তাই গণতান্ত্রিক নেতা হোক আর প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতাই হোক, এই কার্য সম্পাদন সঠিকভাবে না করলে এর পরিণাম অবশ্যই খারাপ হয়। তাই গণতান্ত্রিক ও প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতা তাদের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বের ধরনটাই এমন যে এক্ষেত্রে নেতা তার কাজে অনেক সময় আগ্রাসী ও স্বৈরাচারী হয়ে পড়েন। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতা ও অনুগামীর সম্পর্ক বা সান্নিধ্য বেশি হবার কারণে এটা হবার সম্ভাবনা অনেকটা কম। তবে গণতান্ত্রিক নেতা ও প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতা উভয়ই তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করেন কেননা নেতৃত্ব বিষয়টা সবাই উপভোগ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়: ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতা

নৈতিকতা (Ethics)

সঠিক আচরণের মূলনীতি হলো নৈতিকতা। কোনো পেশার সদস্যদের বা ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণের নীতিমালা বা আদর্শ হচ্ছে নৈতিকতা।

কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা বা ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণের নৈতিক নীতিসমূহকে নৈতিকতা বলে।

নৈতিকতার মাধ্যমে ব্যক্তির কোনো আচরণটি সঠিক বা ভুল, কোনোটা ভালো বা মন্দ, কোনটি যথার্থ, কোনটি যথার্থ নয় তা বিচার করা যায়।

খেলোয়াড়দের জন্য খেলোয়াড়নীতি চিকিৎসকদের জন্য চিকিৎসা নীতি নৈতিকতার উদাহরণ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Descision Making)

একাধিক কোনো বিষয় থেকে সঠিক পন্থা নির্বাচন করাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কোনো একটি প্রতিযোগিতার জন্য ক্লাবের পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের জন্য পোশাকের ধরন নির্বাচন করা হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো ব্যবস্থাপনার ৪টি মৌলিক কার্যাবলি পরিকল্পনা, সংগঠিত, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ এর প্রধান দিক। যখন একজন ব্যবস্থাপক দক্ষতার সহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখনই কিছু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

সিদ্ধান্তের প্রকারভেদ (Types of Decision)

সিদ্ধান্ত প্রধাণত ২ প্রকার:

১। কর্মসূচিমূলক সিদ্ধান্ত (Programming decision)

২। কর্মসূচিহীন সিদ্ধান্ত (Non programmed decision)

১। কর্মসূচিমূলক সিদ্ধান্ত (Programming decision)

কর্মসূচিমূলক সিদ্ধান্ত হলো পুনরাবৃত্তিমূলক ও নিয়মিত কার্যক্রমের সূচি। এটি নির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত। সমস্যা সমাধানের জন্য এ পদ্ধতি সুগঠিত ও তথ্যসমৃদ্ধ। এটি একটি পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতি। যেমন: বিকেএসপিতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি।

২। কর্মসূচিহীন সিদ্ধান্ত (Non programmed decision)

কর্মসূচিহীন সিদ্ধান্ত একটি নতুন ও অনন্য পদ্ধতি। এটা অভিনব কাঠামোহীন ও জটিল পদ্ধতি। সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নাই। সাধারণত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

এ ছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Rational decision making)

(খ) স্বজ্ঞাত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Intuitive decision making)

(গ) সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Combinative decision making)

(ঘ) সন্তুষ্টিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Satisficing decision making)

(ঙ) সিদ্ধান্ত সমর্থিত পদ্ধতি (Decision support system)

(চ) স্বীকৃতিমূলক সিদ্ধান্ত (Recognition for prime decision making)

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া (Decision making process)

একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহকে অনুসরণ করতে হবে-

প্রথম ধাপ: স্বীকৃতি, শ্রেণিবিভাগ এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণ

- সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হবে
- সমস্যাকে শ্রেণিকরণ করতে হবে (যেমন: কর্মসূচিমূলক না কর্মসূচিহীন)
- সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা বা ঝুকি নির্ণয় করতে হবে
- সমস্যাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে (যেমন: কোনো মাঠে নতুন দর্শক গ্যালারি নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্যালারি প্রস্তুতের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে হবে)

দ্বিতীয় ধাপ : লক্ষ ও মানদণ্ড নির্ধারণ (Set goals and criteria)

সাধারণত কর্মসূচিমূলক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নীতিমালার মধ্যে মানদণ্ড নিহিত থাকে। বস্তুত কর্মসূচিহীন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোনো লক্ষ বা মানদণ্ড থাকে না। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এটা তার একক সিদ্ধান্ত বা দলীয় সিদ্ধান্ত হতে পারে।

তৃতীয় ধাপ: বিকল্প পন্থা উন্নয়ন ও মূল্যায়ন (Developing and evaluating alternating)

সাধারণত প্রত্যেকটি সমস্যার জন্য বিভিন্ন বিকল্প সমাধান থাকে। বিকল্প পন্থাসমূহ থেকে নানান ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। নতুনত্ব ও সৃজনশীলতা বিকল্প পন্থা অনুসন্ধানে বিশেষ ভূমিকা রাখে। দলীয় প্রচেষ্টা সমস্যা সমাধানে ও প্রক্রিয়া উন্নয়নে সহায়তা করে। বিকল্প পন্থার উদ্ভাবন সময় ও অর্থের সাথে সম্পর্কিত।

চতুর্থ ধাপ : সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্প পন্থা নির্বাচন করা (Select the best alternatives)

- এই ধাপে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক ২য় ধাপের লক্ষ্য ও মানদণ্ড অনুযায়ী বিকল্প পন্থাসমূহ মূল্যায়ন করে।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিকল্প পন্থাসমূহ ক্রমানুসারে সাজানো হয়।
- ব্যবস্থাপকের অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ ও নিজস্ব নীতি বিকল্প পন্থা নির্বাচনে প্রভাবিত করে।

পঞ্চম ধাপ : বিকল্প পন্থার বাস্তবায়ন (Implementing the alternative)
- বিকল্প পন্থা গ্রহণ করার পর তা বাস্তবায়নে সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- বিকল্প সিদ্ধান্ত ভালোভাবে বাস্তবায়ন করতে কাদের সম্পৃক্ত করতে হবে এবং কীভাবে করবে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।
- সিদ্ধান্তসমূহ ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই বুঝতে পারে।

ষষ্ঠ ধাপ : মূল্যায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা (Conduct follow up)
-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার্যক্রম শুরু করার পর তা মূল্যায়ন করে পর্যালোচনা করতে হবে।
- কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের সাথে প্রাপ্ত ফলাফলের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়: বাজেট ও পরিকল্পনা

বাজেট (Budget)

বাজেট হচ্ছে কোনো দেশের একটি অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের হিসাব। বাজেটে একদিকে আয়ের উৎসসহ আয়ের পরিমাণ ও অন্যদিকে ব্যয়ের খাতসহ ব্যয়ের পরিমাণ দেখানো হয়ে থাকে।

জন এফ.ডিউ বাজেটকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রণীত আর্থিক পরিকল্পনা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বাজেট হলো আর্থিক বছরের প্রথমে একটি পরিকল্পনা বা কর্মসূচি প্রস্তুতি যা ভবিষ্যতে কী ধরনের খরচ হতে পারে তার আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব।

খেলাধুলার বাজেট আর্থিক বাজেটের ন্যায় একটি কঠিন পরিকল্পনা। এখানেও বিভিন্ন আয়ের উৎস সামঞ্জস্য রেখে ব্যয়ের পরিমাণ ঠিক করতে হয়। "It requires constructive Planning in advance in needs, income and expenditure for a fiscal year by means of a process called Budget making" অর্থাৎ একটি অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের প্রয়োজন অনুসারে অগ্রিম একটি সঠিক পরিকল্পনা করার পদ্ধতিকে বাজেট বলে।

বাজেটের প্রকারভেদ (Types of Budget)

বাজেট সাধারণত দু প্রকার

(ক) রাজস্ব বাজেট (খ) মূলধনী বাজেট

(ক) রাজস্ব বাজেট:

যে বাজেটে সরকারের দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের খতিয়ান তুলে ধরা হয় তাকে রাজস্ব বাজেট বলে। এ বাজেট সরকারের দৈনন্দিন প্রশাসনিক ব্যয়ের হিসাব।

(খ) মূলধনী বাজেট:

যে বাজেটে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আয়-ব্যয়ের খতিয়ান দেয়া থাকে তাকে মূলধনী বাজেট বলে। এ বাজেটকে উন্নয়ন বাজেট বলা হয়ে থাকে।

যে বাজেটে আয়-ব্যয় সমান থাকে তাকে **সুষম বাজেট** বলে।

যে বাজেটে সম্ভাব্য আয় ও সম্ভাব্য ব্যয় সমান থাকে না তাকে **অসম বাজেট** বলে। অসম বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকতে পারে আবার ঘাটতিও থাকতে পারে।

টেমপল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান উইলিয়াম, এল হাফস বলেন "A Budget is an organized statement of estimated receipts and expenditure" বাজেট একটি আনুমানিক খরচের ফিরিস্তি। এ ফিরিস্তি তৈরি করতে কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এ হিসাব যেন ক্রয়ের স্বার্থে সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়।

"The first essential in the efficient management of any enterprise is to plan carefully in advance the income and expenditure for fiscal period"

তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতার বা নির্দিষ্ট সময়ের বাজেট তৈরি করতে আনুষাঙ্গিক আয়-ব্যয় ও সতর্কতার সাথে হিসাব-নিকাশ করতে হবে। এ হিসাব-নিকাশের ওপরই বাজেটের সফলতা নির্ভর করে।

বাজেট প্রস্তুত করার পদ্ধতিঃ

একজন শারীরিক শিক্ষাবিদ বাজেট প্রস্তুত করার সময় কতকগুলো মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে বাজেট তৈরী করেন। যদি মৌলিক নীতিগুলো অনুসরণ করা হয় তাহলে বাজেট সবার কাছে অর্থবহ হবে। নীতিগুলো হলো-

১। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
২। উক্ত তথ্যের শ্রেণিবিভাগ করতে হবে।
৩। উক্ত তথ্যের একটা খসড়া হিসাব করতে হবে।
৪। বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন করতে হবে।

১। প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে উক্ত সময়ে আয় ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব করতে হবে। যেমন গেম ফি, সরকারি সাহায্য অন্য কোনো ফান্ড হতে সাহায্য, টিকিট বিক্রয় ইত্যাদি হতে যত আয় হতে পারে তা পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে বা পূর্বের রেকর্ড দেখে হিসাব করতে হবে।

কোনো খেলায় কত ব্যয় হবে, সরঞ্জাম ক্রয়, নাস্তা, যাতায়াত, মেডিক্যাল, প্যান্ডেল, পুরস্কার ক্রয়, প্রচার পত্র কর্মসূচি, মাইক ইত্যাদি বিষয় পূর্বের অভিজ্ঞতা বা রেকর্ড দেখে যতদূর সম্ভব সঠিকভাবে খরচ ধরতে হবে।

২। বিভিন্ন খাত হতে আয়ের ও ব্যয়ের তথ্য পাবার পর সেটিকে আরও সঠিক করার জন্য আয় ও ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে Pittenger বলেছেন- "This ensures uniformity of presentation and makes for accuracy in planning. It facilitates the gathering and compiling of the date and it makes easier the reviewing and revising of the estimates. কোনো কোনো খাতে ব্যয় হতে পারে সে খাত বের করতে হবে যেমন যাতায়াত, নাস্তা, পুরস্কার, সরঞ্জাম ক্রয়, অফিসিয়াল ইত্যাদি ব্যয়ের খাতগুলো পৃথক করতে হবে।

৩। তারপর আয়ের কোনো উৎস হতে কত টাকা আসবে তা হিসাব করে বের করতে হবে। কোনো খাতে কত ব্যয় হবে তা আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্দিষ্ট করে দেখাতে হবে।

৪। বিভিন্ন খাতের আয় ও বিভিন্ন খাতের ব্যয়ের ফিরিস্তি তৈরি করে বাজেট কমিটি দিয়ে অনুমোদন করাতে হবে। কমিটি সেটা পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষভাবে পর্যালোচনা করে অনুমোদন করলেই তা বাজেট হিসাবে স্বীকৃত হবে।

৫। অনুমোদনের পর বাজেটের বিবরণ মতে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করতে হবে ব্যয় কিছু কম বেশি হলে তা আন্তঃখাত পূরণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে বাজেট হুবহু অনুসরণ করে চলতে হবে এমন কোনো ধরা বাধা নিয়ম নেই। অবস্থা বুঝে এটি পরিবর্তন করা যেতে পারে। বাজেটে যে অংশ ধরা থাকবে বিভিন্ন খাতের জন্য যদি কোনো খাতে তার চেয়ে বেশি লাগে তা অন্য খাত হতে এনে খরচ করা যাবে তবে মোট অংক কখনো অতিক্রম করা যাবে না।

ক্রীড়া সরঞ্জাম - ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ (Sports goods-Use & Preservation)

শিক্ষা হলো ব্যক্তির আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। আর এ শিক্ষা গ্রহণ নির্ভর করে ব্যক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টার ওপর। ব্যক্তির প্রচেষ্টা এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়া দুটোই জ্ঞান অর্জনের প্রধান অবলম্বন। আর শেখা এবং শেখানোর কাজকে সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানোর জন্যই প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তথা সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার করতে হয়। শারীরিক শিক্ষাক্ষেত্রে এ শিক্ষা উপকরণ হিসেবে প্রথমেই আসে সাজ-সরঞ্জাম যার গুরুত্ব অত্যাধিক।

ক্রীড়া সরঞ্জাম- শারীরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলাধুলা তথা শারীরিক শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ ও আনন্দঘন এবং চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্য যে সমস্ত উপকরণের যথার্থ ব্যবহার করা হয়, তাদেরকে এক কথায় ক্রীড়া সরঞ্জাম বলে। সরঞ্জাম বলতে খেলাধুলার যাবতীয় সরঞ্জাম যা সরানো যায়, যেমন-বল, ব্যাট, ম্যাট, পোশাক, তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি বোঝায়। উইলিয়াম এল হাফস সরঞ্জাম ও সুবিধার সংজ্ঞায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, The word of\ equipment is used here to mean constimes, uniform, Bails, Bat, Mat towels and other movable less permanent materials সুযোগ সুবিধা বলতে যে সমস্ত জিনিস হতে সুবিধা পাওয়া যায় তাকে সুযোগ বা Facilities বলে। "Incontrast to the facilities which designates the more permanent building, Fields Pools and Courts" একজন অ্যাথলেটের সরঞ্জাম বলতে নিজের ব্যবহৃত পোশাক, সাবান তোয়ালে ও প্রতিযোগিতার জন্য জিনিসপত্র বা অংশগ্রহণ করার জন্য অনুশীলনের দ্রব্যাদি বুঝিয়ে থাকে। শারীরিক শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখার জন্যা ক্রীড়া সরঞ্জাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই প্রত্যেক শারীরিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ে ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয়- শারীরিক শিক্ষার খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয় করার আগে শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং ছাত্র সংখ্যার ওপর বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। সাধারণত ভালো মানের খেলোয়াড়দের জন্য উন্নত ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয় করা উচিত। আর নিম্নমানের শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষানবীশদের জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের

খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয় করা উচিত। প্রথমে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ধরে, খেলাধুলার সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত করে সে অনুযায়ী সামগ্রী ক্রয় করতে যাওয়া প্রয়োজন।

ক্রীড়া সরঞ্জাম ব্যবহার - শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রীড়াসামগ্রী ব্যবহারের সময় অবশ্যই ঋতুভেদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। শীতকালীন খেলাধুলার সরঞ্জাম শীতকালেই ব্যবহার করতে হবে অথবা গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলার সরঞ্জাম গ্রীষ্মকালেই ব্যবহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিস্ট ক্রীড়া শিক্ষক যথার্থ নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শারীরিক কর্মকাণ্ডে ক্রীড়া সরঞ্জাম ব্যবহারের সময় শিক্ষার্থীর চাহিদার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। খেলার প্রয়োজন অনুযায়ী উপকরণের চাহিদা ভিন্নতর হতে পারে। ক্রীড়া শিক্ষার সরঞ্জাম ছাড়া যেহেতু শারীরিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুরোটাই অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়, সেহেতু ক্রীড়া শিক্ষকের একনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে সময় উপযোগী এবং মজবুত ক্রীড়া সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে শরীরে পরিধানের সামগ্রী অত্যন্ত আরামদায়ক এবং টেকসই হতে হবে। ক্রীড়া সরঞ্জাম ব্যবহার শেষে সেগুলোকে যথার্থ স্থানে সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। যথাসময়ে সরঞ্জাম ব্যবহার করে যথানিয়মে সংরক্ষণ না করলে তাদের দীর্ঘস্থায়িত্ব কমে যায় এবং প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। এজন্যই প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ক্রীড়া সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার ব্যবহারবিধি জানিয়ে দেয়া উচিত।

ক্রীড়া সরঞ্জাম সংরক্ষণের নীতিমালা

শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রীড়া সরঞ্জাম ব্যবহারের বেলায় নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়ে থাকে- যেমন-

১. কার্যক্রমে ক্রীড়া শিক্ষার উপকরণ ব্যবহারের সময় শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, আগ্রহ-প্রবণতা ও চাহিদা শারীরিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে ক্রীড়া সরঞ্জাম নির্বাচন করতে হবে।

২. শারীরিক শিক্ষায় ক্রীড়া শিক্ষার উপকরণ ব্যবহারের সময় উদ্দেশ্য খেয়াল রাখতে হবে।

৩. ক্রীড়া শিক্ষার সরঞ্জাম ব্যবহারের সময় অবশ্যই পূর্ব পরিকল্পনা থাকতে হবে। যার ওপর ভিত্তি করে কার্য হাসিল করা হয়ে থাকে।

৪. ক্রীড়া শিক্ষার সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সময়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৫. ক্রীড়া শিক্ষায় এমন সব সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে, যা হবে শারীরিক কসরত বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই চিত্তাকর্ষক।

৬. শারীরিক শিক্ষায় ক্রীড়া শিক্ষার সরঞ্জাম ব্যবহারের আগে অবশ্যই উপকরণসমূহের যাচাই বাছাই করে নিতে হবে।

৭. অধিকাংশ ক্রীড়া শিক্ষার সরঞ্জাম দীর্ঘস্থায়ী, মজবুত এবং সংরক্ষণ সুবিধা পূর্ণ হতে হবে।

ক্রীড়া শিক্ষাকে আকর্ষণীয় এবং সহজতর করার জন্য ক্রীড়া শিক্ষার উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। পৃথিবীর সকল ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বড়ো করে দেখা হয়ে থাকে। বিশেষ করে

অ্যাথলেটিক্স এবং অন্যান্য শারীরিক কসরত প্রদর্শনীতে ক্রীড়া শিক্ষার সরঞ্জাম খুবই প্রয়োজনীয়। এক কথায় ক্রীড়া শিক্ষার সরঞ্জাম ছাড়া এ বিষয়ের শিক্ষা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়।

ক্রীড়া সরঞ্জাম সংরক্ষণের উপায়সমূহ

সরঞ্জামের প্রতি লক্ষ রাখা প্রত্যেক শারীরিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট লোকদের কর্তব্য। যত দামি বা ভালো জিনিসই ক্রয় করা হোক না কেন যদি যত্ন না নেয়া হয় তাহলে অল্পদিনের ভেতর ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে। বিশেষ করে আমাদের দেশে সরঞ্জামের দাম অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

স্কুল-কলেজে সরকারি সাহায্য অপ্রতুল। যার ফলে সরঞ্জাম ক্রয় করা সবসময় সম্ভব নয়। তাই যত্ন নেয়া প্রত্যেকের অবশ্যই কর্তব্য। ক্রীড়া সরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে -

সরঞ্জামাদি রাখার জন্য গুদামঘর বা স্টোর রুম অত্যন্ত দরকার। সরঞ্জাম যাতে ঠিকমত রাখা যায় সেজন্য পরিমিত জায়গা থাকতে। অনেক স্কুল-কলেজে স্টোররুম না থাকায় মেঝে বা কোনো অন্ধকার রুমের একপাশে জিনিসগুলো রেখে দেয়া হয়।

স্টোর রুমের জানালা থাকতে হবে। যাতে আলো, বাতাস, রৌদ্র ইত্যাদি সুন্দরভাবে চলাচল করতে পারে। সরঞ্জামাদী রাখার বিভিন্ন ধরনের তাক, আলমারি জাতীয় জিনিসপত্র তৈরী করে তার ওপর ঠিকমতো রাখতে হবে। এই সরঞ্জাম রাখার আসবাবপত্রের পরিমিত জায়গা থাকতে হবে। জুতা ও ঐ জাতীয় সরঞ্জাম রাখার জন্য চিকন ধরনের তাকের ব্যবহার করতে হয়। কোনো সরঞ্জাম দেয়ালে বা মেঝেতে রাখতে নেই। বড়ো ধরনের জিনিসপত্র রাখার জন্য গভীর তাক প্রয়োজন।

সরঞ্জাম এমনভাবে রাখতে হবে যাতে উই পোকা, ছোট কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর, তোলাপোকা বা ঐ জাতীয় পোকামাকড় কেটে নষ্ট করতে না পারে। যে সমস্ত সরঞ্জাম বর্তমানে লাগবে না সেগুলো ভালো করে বাক্সে পুরে রাখতে হবে। পূর্বে কয়টা ছিল নতুন কয়টা আনা হলো, ছেঁড়া মেরামত যোগ্য ইত্যাদি পৃথক ঘর করে স্টক রেজিস্ট্রারে হিসাব রাখতে হবে। যাতে কোনো জিনিস হারিয়ে বা চুরি না হয়ে যায়।

সুতা, পশমী, নায়লন, রেয়ন ইত্যাদি পোশাক-পরিচ্ছেদ সতর্কতার সাথে পরিষ্কার করতে হয়। বল ও এ জাতীয় সরঞ্জাম ভিজে গেলে রৌদ্রে শুকায়ে তার পর রাখতে হয়। পোশাক পরিচ্ছদ ঘামলে বা ময়লা জামা সাথে সাথে ধৌত করে শুকায়ে হ্যাঙ্গারে বা তারের ওপর ছড়ায়ে রাখতে হয় এবং কিছুদিন পর পর রৌদ্রে দিয়ে গরম করতে হয়। কোনো পোশাক ছিঁড়েগেলে সাথে সাথে মেরামত করে রাখতে হয়। হাওয়া দেওয়া বল খেলার পর হাওয়া ছেড়ে দিয়ে ও কাঠের সরঞ্জাম খুব ভালো করে রাখতে হয়। যাতে করে ছোটো পোকামাকড় নষ্ট করতে না পারে। মাটিতে যেন না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ওঠে গেলে রং করার ব্যবস্থা করতে হবে। লৌহ জাতীয় জিনিসপত্র ব্যবহারের পর মাটি পরিষ্কার করে সবার নিচের তাকে রেখে দিতে হয় যাতে পড়ে গেলে কেহ ব্যথা না পায়।

ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় ও দরপত্র আহবান

ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয়ের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে -

ক্রয়কৃত দ্রব্য মাপ মতো আছে কি না সেলাই এবং অন্যান্য ঠিক আছে কি না দেখে নিতে হবে। এক কথায় শুধুমাত্র ব্যবসায়ীর নাম বা দোকানের নাম দেখে না কিনে জিনিস দেখে কিনতে হবে।

- মোট সরঞ্জামের মধ্যে যেগুলো বেশি প্রয়োজনীয় সেগুলো প্রথমে নির্বাচিত করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সংখ্যা ও নমুনা পূর্বে দোকানদারকে দিলে ভালো জিনিস আশা করা যায়।
- যতদূর সম্ভব বিভিন্ন দোকান থেকে সরঞ্জাম কেনার চেষ্টা করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠিত ও সরকার অনুমোদিত দোকান থেকে সরঞ্জাম ক্রয় করতে হবে।
- ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুসারে তা মৌসুমের পূর্বেই ক্রয় করতে হবে।

দরপত্র আহ্বানের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জিরানি, সাভার, ঢাকা

নং.....

তারিখ.....

দরপত্র গ্রহণের শেষ ত

তারিখ.....

নিম্নবর্ণিত জিনিসসমূহ সরবরাহ করতে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে –

ক্রমিক নং	সরঞ্জামের নাম	উচ্চমান সম্পন্ন	মান সম্পন্ন	মোট প্রয়োজন	মন্তব্য
১	ক্রিকেট বল	২ ডজন	৪ ডজন	৬ ডজন	বিদেশি/ দেশি
২	ফুটবল	১০ ডজন	.....	১০ ডজন	বিদেশি/ দেশি
৩	ভলিবল	.....	৪টি	৪টি	বিদেশি/ দেশি

কোচ/ক্রীড়া শিক্ষক

বিকেএসপি

মহাপরিচালক

বিকেএসপি

তথ্যসূত্র

অধ্যক্ষ আব্দুল হক, ২০০৪, শারীরিক শিক্ষার সংগঠন ও প্রশাসন, সিটি পাবলিশিং হাউজ।

জসিম উদ্দীন আহম্মদ, ২০০৩, শিক্ষা ও ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান ।

Chelladurai, P. 2006. Human resource management in sport and recreation.

Fried, G. 2010. Managing sport facilities, 2nd edition.

Hernande Z, R.A. 2002. Managing sport organizations.

Parkhouse, B.L. 2005. The management of sport.

Robinson, M.J. 2010. Sport club management.

Slack, T. & parent, M.M. 2006. Understanding sport organizations.

ক্রীড়াজনিত আঘাত ও পুষ্টি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বি-স্পোর্টস সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত

আবু ওবায়দা ভূঞা লিংকন ফিজিওথেরাপিস্ট, বিকেএসপি
লুৎফা আক্তার, ফিজিওথেরাপিস্ট, বিকেএসপি

ভূমিকা

স্পোর্টস ইনজুরি ক্রীড়া ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ক্রীড়াবিষয়ক বিভিন্ন কোর্সে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্পোর্টস ইনজুরি মূলত চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক শাখা, স্পোর্টস মেডিসিনের অন্তর্ভুক্ত। আমরা সবাই জানি, ক্রীড়া এখন শুধু শরীর চর্চা ও বিনোদনের বিষয় নয়, এটি বর্তমানে একটি শিল্প ও পেশায় পরিণত হয়েছে। ইহা খেলোয়াড়দের সুস্থতা, ফিটনেস, ক্রীড়া নৈপুণ্যের পূর্বশর্ত। ইনজুরি খেলাধুলারই একটি অংশ। তাই একজন খেলোয়াড়ের ইনজুরির প্রথমিক চিকিৎসা, প্রতিরোধ, পুণর্বাসন সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস সাইন্স এবং স্নাতক পর্যায়ে (Sports Nutirtion; Care and Prevention of Sports injuries) বিষয়টি ইতোমধ্যে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ এ বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় রচিত কোনো বই নেই বললেই চলে। উক্ত সিলেবাসের আলোকে 'ক্রীড়াজনিত আঘাত ও পুস্টির' বইটি রচিত হয়েছে। স্পোর্টস ইনজুরি ও পুষ্টির উপর ইংরেজি ভাষায় অনেক বই রয়েছে। সেসব বইয়ে এমন কিছু ইংরেজি শব্দ আছে যাদের পরিভাষা এখনো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। আমরা সেসব শব্দের সহজ সরল অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি আর যেসব শব্দের অনুবাদ দুর্বোধ্য তা মূল ইংরেজি শব্দেই ব্যবহার করা হয়েছে। বইটি যেহেতু প্রথমবার প্রণয়ন করা হয়েছে তাই এতে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ভুল থাকা স্বাভাবিক। সে জন্য পাঠকবৃন্দদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যাথাযথ নির্ভুল করতে সচেষ্ট থাকব এবং পাঠকের যেকোন গঠন মূলক মতামত সাদরে গ্রহণ করব। বইটি প্রণয়নে বিকেএসপি কর্তৃপক্ষসহ আমাদের অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীগণ ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করায় আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, যাদের জন্য বইটি লেখা হলো তারা পড়ে উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। এছাড়া বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছে তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আবু ওবায়দা ভূঞা লিংকন
লুৎফা আক্তার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় পুষ্টি, সংজ্ঞা, সুষম খাদ্য, উপাদান----------১৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা, সংজ্ঞা, নীতি, ফাস্ট এইড বক্স----------১৭৫

তৃতীয় অধ্যায় স্পোর্টস মেডিসিনের ভূমিকা, সংজ্ঞা, পরিধি ----------১৭৯

চতুর্থ অধ্যায় ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট, সফট টিস্যু, হাঁটু , গোড়ালী, কাঁধ, কোমর---১৮১

পঞ্চম অধ্যায় ইনজুরি প্রতিরোধ----------১৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায় ইনজুরি পুনর্বাসন----------১৯২

সপ্তম অধ্যায় কোমর ব্যথা ----------১৯৮

অষ্টম অধ্যায় খেলোয়াড়দের হাঁটুর ইনজুরি----------২০০

নবম অধ্যায় ম্যাসাজ----------২০৩

দশম অধ্যায় টীকা----------২০৬

প্রথম অধ্যায়
পুষ্টি (Nutrition)

পুষ্টি: আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মের জন্য এবং শরীরের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু শক্তি ও জরুরি কিছু শারীরিক উপাদান নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। খাদ্যের মাধ্যমে যে সকল উপাদান দ্বারা ঐ ক্ষয়পূরণ হয় তাকেই পুষ্টি বলে।

আমাদের দেহযন্ত্রটি একটি ইঞ্জিনের মতোই। ইঞ্জিন চালাতে যেমন কয়লা, পেট্রোল ও জলের প্রয়োজন তেমনি আমাদের দেহের ইঞ্জিন চালাতেও খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন। এই খাদ্য ও পানীয় থেকেই আমরা দেহ পরিচালনা করার শক্তি অর্জন করি। মানবদেহের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ এক একটি ক্ষুদ্র রসায়নাগার। এটির ভেতরে অণু-পরমাণুর ভাঙা-গড়ার কাজ অবিরাম চলছে। ইহা থেকে তাপ জন্মায়, সেই তাপে খাদ্য সামগ্রী রান্না হয়। কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের কতক কার্বন অংশ অক্সিজেন সহযোগে কার্বন ডাইঅক্সইড হয়ে প্রশ্বাসে বেরিয়ে যায়। হাইড্রোজেন জলে পরিণত হয়। গ্রন্থি কোষেরা দিনরাত এনজাইম তৈরি করে খাদ্য ভেঙে শোষণ উপযোগী করছে। এন্ডোক্রাইণ গ্রন্থিরা হরমোন তৈরি করেছে। সব রস মিলেমিশে খাদ্যসার প্রস্তুত করে সেটি রক্ত স্রোতে চেলে দেয় এবং রক্ত স্রোত দেহের সর্বত্র সেই খাদ্য সার সরবরাহ করে থাকে।

এই প্রসংগে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, খাদ্য খেলেই শরীরে গিয়ে সেটি খাদ্যসারে পরিণত হয় না বরং উহা যথাযথ ভাবে হজম হওয়া চাই। যারা পরিশ্রম করে না বা অলস ভাবে জীবন যাপন করে তাদের দেহে খাদ্য সহজে হজম হয় না। কারণ খাদ্য হজমের কাজ দেহের পরিশ্রমের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আহারের সাথে বা আহারের ঠিক পরেই অধিক পরিমাণ জলপান করা উচিত নয়। কারণ তা হজমে বিঘ্ন ঘটায়। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা প্রয়োজন। তবে রাতের আহারের পর সম্ভব হলে একটু পদচালনা করা ভালো। রাতের আহার সর্বদাই যেন হালকা ও কম হয়, সেটি সুনিদ্রা ও হজমের পক্ষে সহায়ক হবে। বৃদ্ধদের সর্বদাই হালকা, সহজপাচ্য এবং খাদ্যের পরিমাণ কম হওয়া উচিত।

বিভিন্ন ধরনের খাদ্য (Foods of Different kinds): পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিন ধরনের খাদ্য যথা- প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য, স্নেহ বা ফ্যাট জাতীয় খাদ্য এবং শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য। এছাড়াও বিভিন্ন ধাতব ও অজৈব লবণ, জল এবং ভিটামিন আমাদের দেহের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান।

প্রোটিন: মাছ, মাংস, দুধ, ছানা ও ডিম হচ্ছে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য তথা জান্তব প্রোটিন। আর ভেজিটেবিল প্রোটিনের মধ্যে সয়াবিন, ডাল প্রভৃতি পড়ছে। প্রোটিন খ্যদ্য আমাদের পুষ্টি জোগায় ও পেশীর ক্ষয়পূরণ করে।

ফ্যাট খাদ্য: তেল, ঘি, চর্বি, মাখন, বাদাম, নারকেল প্রভৃতি হচেছ এই শ্রেণিভুক্ত খাদ্য। এই খাদ্য আমাদের মেদ বাড়ায়, পরিশ্রমের শক্তি যোগায় এবং দেহের তাপ সমতা রক্ষা করে।

এছাড়াও বিভিন্ন ধাতব ও অজৈব লবণ যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাসিয়াম ইত্যাদি আমাদের দেহের জন্য অতি প্রয়োজন।

দেহেযন্ত্রে খাদ্যের আয়-ব্যয় হিসাব: খাদ্য, পানীয় ও অক্সিজেন হচ্ছে আমাদের আয়। শ্বাস প্রশ্বাস, মলমূত্র ঘাম এবং অনাবশ্যক অবশেষ বা দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তা হচ্ছে ব্যয়। খাদ্যের বেশি অংশ জৈব (Organic) বাকি জল, লবণ হচ্ছে অজৈব (inorganic) এই লবণ ও জল যদিও কোনো শক্তি (Energy) দান করে না কিন্তু সেটি না হলে হেদযন্ত্র চলে না। জৈব (organic) খাদ্য তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় যথা- প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটস এবং ফ্যাট।

ক্যালরি (Calory): খাদ্য পরিপাক করে দেহ যে তাপ ও ক্রিয়া শক্তি লাভ করে তা পরিমাপ করার জন্য ক্যালরি শব্দ ব্যবহার হয়।

মেটাবলিজম ও বিপাক অর্থাৎ পাক পরিণাম।

অ্যানাবলিজম ও গড়ন, দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, ক্ষয় মেরামত করা।

ক্যাটাবলিজম ও ভাঙন, যা কেবল ধ্বংস করে। অ্যানাবলিজম+ ক্যাটাবলিজম অর্থাৎ গড়ন+ভাঙন, দুই মিলে পাকক্রিয়া পূর্ণ হয়।

বি.এম.আর (B.M.R) Basal Metabolic Rate: এর মানে, উপবাস কালে দেহ ইঞ্জিন চালু রাখতে যে এনার্জির প্রয়োজন হয় তার পরিমাপ অর্থাৎ দেহ গরম রাখা, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চালান, হার্ট ও দেহের সকল টিসু ও যন্ত্র চালু রাখতে যে শক্তির দরকার। খালি পেটে যখন পরিপাক ক্রিয়া শেষ হয়েছে তখন B.M.R মাপা হয়। আবার কাজকর্ম করার সময় বাড়তি যে এনার্জির প্রয়োজন হয় তার হিসাব পৃথক রাখা হয়। সুস্থ মানুষের গড় পড়তা B.M.R হিসাব: দেহের প্রতি স্কোয়ার মিটার অঙ্গের জন্য প্রতি ঘণ্টা ৪০ ক্যালরি তার বেসাল মেটাবলিক রেট। শরীরের বহিরাবরণের ক্ষেত্রফল (area) বের করা দুয়ের সূত্র (Duboi's formula)

$S = 0.0071 \times We.425 \times H^{0725}$

S = স্কোয়ার মিটারের শরীরের বহিরাবরণের ক্ষেত্রফল ।

W = কিলোগ্রাম হিসাবে শরীরের ওজন।

H = সেন্টিমিটারে শরীরের উচচতা।

BMR হ্রাসবৃদ্ধির কারণঃ বিভিন্ন জাতের লোকের BMR ভিন্নতর হয়। মানুষের বয়স যত বাড়ে BMR তত কমে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের BMR কিছু বেশি হয়। গর্ভবতীদের BMR বেশি থাকে। শীতকালে BMR বাড়ে আবার গ্রীষ্মকালে তেমনি কমে। অনশনে BMR কমে যায়। অনেক উচু পাহাড়ে উঠলে এবং জ্বর হলে BMR বাড়ে। এড্রিনাল কর্টেক্স ও মেডুলা, থাইরয়েড এবং অ্যান্টিরিয়ার পিটুইটারির হরমোনরা BMR বাড়িয়ে দেয়। বেন্‌জিড্রিন, কোকেন প্রভৃতি ঔষধ BMR বৃদ্ধি করে। রোগের মধ্যে হাইপারথাইরয়ডিজম, লিউকোমিয়া, পলিসাইথিসিয়া BMR বাড়ায় আবার হাইপোথাইরয়েডিজম, এডিসনস ডিজিজ BMR কমায়।

প্রোটিন মেটাবলিজম (Protein Metabolism)

কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট খাদ্যের মতোই প্রোটিন ও অক্সিডাইজ হয়ে দেহে এনার্জি দান করে। তবে প্রোটিনের ক্রিয়া শক্তি কম। কিন্তু দেহের মেরামতি কাজে এবং উঠতি বয়সীদের দেহ পুষ্টি করতে বা ব্যাধি থেকে আরোগ্যের মুখে প্রোটিনের পূর্ণ প্রয়োজন হয়। দেহযন্ত্র প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়িত কোষ, তন্তু ও নাইট্রোজেন দেহ থেকে বের করে দিচ্ছে আবার খাদ্যের অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো নুতন প্রোটিন জুগিয়ে চলছে। প্রোটিন ভেঙে অ্যামাইনো এসিড হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে আটটি অত্যাবশ্যক, কারণ এদের অভাব হলে ক্ষিধে হয় না, যন্ত্র বিগড়ায়, দেহের বাড় বৃদ্ধি হয়ে যায়। ডাঃ রোজ এই অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের একটি তালিকা প্রকাশ করেনঃ

অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড	ডিমে শতকরা ভাগ	অত্যাবশ্যক নয় এমন অ্যামাইনো এসিড
১. লাইসিন (Lysine)	7.5%	অ্যালানাইন (Alanine)
২. আইসোলিউসিন (Isolucine)	7.7%	অ্যাস্‌পার্টিক এসিড (Aspartic Acid)
৩. ট্রিপটোফান (Tryptophan)	1.6%	সিটুলিন (Citrurulline)
৪. ফনিলালানাইন phenylalanine	6.3%	সিসটিন (Cystine)
৫. মিথিওনাইন (Methionine)	4.0%	গ্লুটামিক এসিড (Glutamic Acid)
৬. থ্রিওনাইন (Threonine)	4.9%	গ্লাইসিন (Glycine)
৭. লিউসিন (Leucine)	9.2%	হাইড্রক্সি গ্লুটামিক এসিড (Hydroxy Glutamic Acid)
৮. ভ্যালিন (Valine)	7.8%	নরলিউসিন (Norleucine) প্রোলিন (Proline) সেরিন (Serine) আর্জিনাইন (Arginine) হিস্টিডাইন (Histidine) টাইরোসিন (Tyrosine)

ডা. রোজ দেখিয়েছেন যে, মিথিওনি (সিস্টিন+ কোলিন) লিভারকে তাজা ও সতেজ রাখে। এটির অভাব হলে ইঁদুরের সিরোসিস রোগ জন্মে। ভ্যালিন যদি ইঁদুরের খাদ্য থেকে বাদ দেওয়া হয় তা হলে সে ঘুরে ঘুরে পড়ে যায়। ডা. মালফার্ব বলেন গ্লুটামিক এসিড পশু মস্তিষ্কের গ্রেম্যাটার (Graymatter) তাজা রাখে। লিম্ফোসাইটরা অ্যামাইনো এসিড থেকে গামা গ্লোবিউলিন তৈরি করে এবং টেবডিজের মধ্যে রেখে দেয়। সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে এই গামাগ্লোবিউলিন, ইসিনে মিশিয়ে এম্পুলে পুরে বাজারে আমদানি হয়েছে। দেহে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় রাখার জন্য ভ্যালিনের প্রয়োজন। এছাড়া ফেনিল অ্যালানাইনের সঙ্গে এড্রিনালিন এবং ট্রিপটোফেনের সংগে ইরোক্সিনের রাসায়নিক সাদৃশ্য রয়েছে। দেহের পক্ষে দুই অত্যাবশ্যক। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট যদি বেশি খাওয়া যায় তবে দেহ থেকে সে অনুপাতে বেশি কার্বন বেরিয়ে যায় না। বাড়তি ভাগ গ্লুকোজ ও ফ্যাটে ভাণ্ডারে জমা হয়। কিন্তু প্রোটিন বেশি বেশি খেলে, বাড়তি নাইট্রোজেন মলমূত্র দিয়ে নির্গত হয়ে যায়। বেশি মাংস বা ছানা খেলে নিশ্বাস বেড়ে যায়, মেটাবলিজমও বৃদ্ধি পায়। অ্যামাইনো এসিডের নাইট্রোজেন অংশ দেহের ইন্ধন কার্যে বিশেষ আবশ্যক হয় না। এটির কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অংশ, কার্বোহাইড্রেটের মতোই পোড়ে এবং এনার্জি যোগায়। কিন্তু প্রোটিনের প্রধান ক্রিয়া হলো, প্রোটোপ্লাজমকে সর্বদা তাজা রাখা এছাড়া মেরামতির কাজের প্রোটিনের সকল উপাদান বিশেষ প্রয়োজনে আসে।

প্রোটিনের চাহিদা (Necessity of Protine): গর্ভকালে, শিশু এবং তরুণের বাড়ন্ত বয়সে ব্যাধি বা যে কোনো কারণে ধাতুক্ষয় হলে প্রোটিনের চাহদা বেশি হয়। নিরামিষাশীরা ছানা ও ডাল থেকে বেশি প্রোটিন সংগ্রহ করে, আমিষাশীরা পশুমাংস থেকে সংগ্রহ করে। আর্জিনাইন অ্যামাইনো এসিড) ছানা অপেক্ষা মাংসে তিনগুণ অধিক থাকায়, এক ছটাক মাংসে যে শক্তি হয় তিন ছটাক ছানা খেলে তবে সেই ফল হয়। প্রত্যহ ৭০-৮০ গ্রাম প্রোটিন খেলেই দেহযন্ত্র ঠিকমতো চলতে পারে। পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, পূর্ণ কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট খাদ্যের সঙ্গে যদি ৪/৫ গ্রাম মাত্র প্রোটিন প্রত্যহ আহার করা যায় তবে দেহের কোনো ক্ষতি হয় না। মানুষের প্রতি এক কিলো দেহের ওজনে দেড় গ্রাম প্রোটিন খাদ্য যথেষ্ট। কেবল মাংস আহার করলে দেহ যন্ত্রের কাজ চলতে পারে না। কারণ প্রোটিন খাদ্যে বারো আনা নাইট্রোজেন যুক্ত যার এনার্জি দেবার শক্তি নেই। কেবল প্রোটিন খাদ্য খেয়ে সম্পূর্ণ ক্রিয়া শক্তি পেতে হলে বহু পরিমাণ আহার করা আবশ্যক। তা মানুষে খেতে পারে না, খেলেও পরিপাক হবে না। কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট যকৃতের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে, চাহিদামতো পাওয়া যায়। কিন্তু প্রোটিন দেহতন্তুকে খোরাক জুগিয়ে ভাঙ্গা গড়া মেরামতি কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে, যকৃতের ভাণ্ডারে অতি ক্ষুদ্র অংশই রাখতে পারে। হিসাব করে দেখা যায়, খাদ্য থেকে নাইট্রোজেন আমরা পাই ১৬ ঘণ্টার মধ্যে ততটাই মলমূত্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। যদি কোনোদিন লোভ করে দ্বিগুণ পরিমাণ মাংস খাওয়া যায় তবে ঐ দ্বিগুণ মাত্রায় নাইট্রোজেনও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

বিভিন্ন প্রোটিনের পরিপাক মানঃ- দুধ মাংস প্রায় সবটাই জীর্ণ হয়। ডিম শতকরা ৯০ ভাগ, সিম মটরশুটি প্রভৃতি শতকরা ৭৫ ভাগ পরিপাক হয়। খোসা ঢাকা প্রোটিন জীর্ণ হয় না। দুধের প্রোটিন মান যদি ১০০ ধরা যায় তবে পশুমাংসের মান হবে ১০৪, মাছ ৯৫, কাঁকড়া ৭৯, ছোলা মটর প্রভৃতি সিদ্ধ ৫৬, গমের প্রোটিন ৪০। প্রোটিনের পোষণ ক্রিয়াঃ- অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো অন্ত্রের ভিলাইয়ের রক্তনালী দ্বারা শোষিত হয়ে যকৃতের পোর্টাল রক্ত স্রোত দিয়ে সরাসরি দেহের শোষিত স্রোতে অবিকৃতভাবে চলে যায়। পথে যেতে যেতে চারিদিকের অন্তর চাহিদা মেটায় এবং শেষে আবার যকৃতে ফিরে যায়। সেখানে অবশিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড ভেঙে নাইট্রোজেন ভাগ ইউরিয়ায় পরিণত হয়ে কিডনি দিয়ে মূত্র হিসাবে বেরিয়ে যায় এবং কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তন্তুদের ক্রিয়া শক্তি প্রদান করে। প্লাজমা প্রোটিন যকৃত কতক অ্যামাইনো এসিড থেকে সিরাম এলবুমিন ও সিরাম গ্লোবুলিন তৈরি করে ভাণ্ডারে রাখে। আবশ্যক হলে ঐ ভাণ্ডার থেকে বের করে দেয়। বহুদিন যদি কেহ প্রোটিন খাদ্য না পায় তবে যকৃতের সঞ্চিত ভাণ্ডার প্রায় খালি হয়ে যায়। তার ফলে প্লাজমার/রক্তরসের অসমোটিক চাপ খর্ব হয়। এটির ফলে শোথ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যকৃত ছাড়া দেহের সব পেশি ও তন্তু থেকে সদ্য প্লাজমা তৈরি হয়। বেশি রকম রক্তপাত হলে টিস্যুরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বহু রক্তরস তৈরি করে রক্তস্রোতে পাঠিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে প্রোটিন দ্বারা দরকার মত টিস্যু প্রোটিন তৈরি হয়ে থাকে।

কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম (Carbohydrate Metabolism)

যত প্রকারের শ্বেতসার খাদ্য আমরা খাই, অন্ত্রে জারিত হয় তা গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও গ্যালাকটোজে পরিণত হয়। শেষে এই তিন মিলে এক গ্লুকোজ রূপ নিয়ে রক্ত বা টিস্যুতে বিচরণ করে এবং বাকি গ্লাইকোজেন আকারে যকৃতে সঞ্চিত হয়। রক্তরসে যে পরিমাণ গ্লুকোজ আছে তার পাঁচগুণ থাকে টিস্যু রসে। যদি শিরার মধ্যে ৫.বা ১০০cc গ্লুকোজ ইনজেকশান দেওয়া হয় তখনি রক্তে সুগারের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পায় এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়তি শর্করা তন্তুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে জন্য রক্তে সুগারের মান পূর্ববৎ থেকে যায়। রক্তের স্বাভাবিক শর্করা (Sugar) মান ১.০৮ থেকে ০.১২১

গ্লুকোজের পরিমাণ টেষ্টঃ- বারো ঘণ্টা উপবাসের পর প্রাতে রক্তে কি পরিমাণ সুগার আছে তা দেখা হয়। সুস্থ লোকের ১০০c.c.রক্তে ৮০.১২০ মিলিগ্রাম সুগার থাকে। তারপর তাকে ৫০ গ্রাম গ্লুকোজ জলে গুলে খাওয়ান হয় এবং আধঘণ্টা অন্তর তার রক্ত পরীক্ষা করা হয়। দেখা যাবে, প্রথমে শতকরা ১৮০ মিলি গ্রাম থাকে, এক ঘণ্টা পরে কম হয়, দুঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিক বা তা থেকেও কিছু কম দেখা যাবে। কতকটা

ভাত খেলে, ঘণ্টা দুই রক্তে শর্করার মান কিছু বৃদ্ধি হয়ে তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক এসে যায়। বাড়তি সুগার দেহকোষদের ইন্ধন যোগায়। কতক এনার্জি প্রদান করে, কিছু পেশি ও তন্তুর ভাণ্ডারে গ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চিত হয়। সাধারণত যকৃত, পেশি, তন্তু এই তিন স্থানে গ্লাইকোজেন থাকে। যদি কোনো কারণে দেহ কোষ বাড়তি সুগার শোষণ করতে না পারে তবে কিছুটা মূত্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। একে গ্লুইকোসুরিয়া বলে। রক্তে বেশি শর্করা জমলে হাইপার গ্লাইসিমিয়া বলা হয়। আর রক্তে সুগারের মান কমে যদি ৭০ মিলিগ্রামে নেমে যায় তবে কোমা ও মৃত্যুর লক্ষণ দেখা যায়। এটিকে হাইপোগ্লাইসিমিয়া বলে। গ্লাইকোজেন যকৃতে ৩৮% এবং মাংসে ৪৪% থাকে। এটি সহজেই গ্লুকোজ পরিণত হয় এবং মৃত্যুর পরে সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে লুপ্ত হয়।

ইনসুলিন (Insuline):- এটি প্যানক্রিয়াসের হরমোন, এনজাইম নয়। এটি প্রোটিন বস্তু, রক্তে শর্করার মান স্থির রাখে। ইনসুলিনের অভাব হলে রক্তে সুগার অংক বেড়ে যায়। দেহকোষ গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সৃষ্টি করতে পারে না, মূত্র দিয়ে বেরিয়ে যায়, ডায়াবেটিস ব্যাধির সৃষ্টি হয়। ইনসুলিন ইনজেকশন দিলে রক্তে সুগার কমে যায় । আবার বেশি কমে গেলে হাইপোগ্লাইসিমিয়া জন্মে। তখনি গ্লুকোজ ইনজেকশন দিলে ঐ সকল দুর্লক্ষণ কেটে যায়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, রক্তে অন্তত পক্ষে শতকরা ৪০মি. গ্রা. সুগার থাকা চাই। তা না হলে স্নায়ুকেন্দ্র অচল হয়ে পড়ে। যেমন প্যানক্রিয়াসের আইলেটস্‌ের বিটা সেলের হরমোন ইনসুলিন তেমনি আলফা সেলের হরমোন গ্লুকাগন (Glucagon)। এটি যকৃতের গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি করে। এই গ্লুকোজন রক্তে এসে Blood বাড়িয়ে দেয়। প্যানক্রিয়াস গ্লান্ড যদি ইনসুলিন তৈরি করতে না পারে তবে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি হবে না। যকৃৎ ও মাংসের গ্লাইকোজেন ভাণ্ডার ক্রমে খালি হয়ে যায়। শ্বেতসার থেকে যে গ্লুকোজ জন্মে তা মূত্র দিয়ে বেরিয়ে যায়, দেহে কিটোন বডিজ (যাতে Co আছে) জমতে থাকে। ফলে ডায়াবেটিস ব্যাধি হয়। প্রত্যহ ইনসুলিন দিয়ে অর্থাৎ ইনজেকশনের মাধ্যমে এই দুরারোগ্য ব্যাধিকে প্রতিরোধ করা যায়। গ্লাইকোজেনেসিস মানে ইনসুলিন প্রয়োগে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সৃষ্টি। এই কাজে ইনসুলিনকে সাহায্য করে দেহের প্রধান দুই হরমোন-এড্রিনালিন কর্টেক্স ক্বাথ এবং এন্টিরিয়ারপিটুইটারি গ্রন্থি হরমোন।

কার্বোহাইড্রেট ভাণ্ডার বলতে যকৃতে এবং দেহের পেশর মধ্যে যে গ্লাইকোজেন সঞ্চিত থাকে তাকে বুঝায়। অনশনকালেও এই ভাণ্ডার একেবার শূন্য হয় না। দেহের সকল পেশী একত্র করলে যকৃত অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণ হয় বটে কিন্তু মোট মজুদ ৫০০ গ্রাম গ্লাইকোজেন তহবিলের মধ্যে একশত গ্রাম যকৃতেই থাকে। বাকি ৪০০ গ্রাম দেহের সমস্ত মাংস পেশিতে ছড়িয়ে আছে।

গ্লুকোজ শোষণ পদ্ধতিঃ শ্বেতসার ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হলে, অন্ত্রের যে সকল ভিলাই আছে তাদের ঝিল্লী ও উপঝিল্লী (এপিথেলিয়াম) সব গ্লুকোজ শুষে নিয়ে রক্তনালীকে দেয়। রক্ত সর্বদেহে ঐ গ্লুকোজ ছড়িয়ে দেয়। কিডনিতে গ্লুকোজ গেলে সেটির টিবিউলস (ছাঁকনি) প্রতি মিনিটে ২৮০ মিলিগ্রাম করে শুষে নিয়ে পুনরায় রক্তস্রোতে তা ফিরিয়ে দেয়। তিন শর্করার মধ্যে কতক গালাকটোজ যকৃতে সরাসরি চলে যায়, কিন্তু লেভুলেজ মাংসে যায় এবং সেখানে গিয়ে এগুলো গ্লাইকোজনে পরিণত হয়। গ্লুকোজ যকৃতে গিয়ে গ্লাইকোজনে রূপান্তরিত হয়। এই কাজে ইনসুলিন-এ এড্রিনাল কর্টেক্সের হরমোন সাহায্য করে। হঠাৎ যদি দেহে গ্লুকোজের চাহিদা বেশি হয় তবে ইনসুলিন এবং হরমোন তাড়া লাগিয়ে যকৃতকে বেশি হারে গ্লাইকোজেন তৈরি করায়। অধিক পরিশ্রমের সময় মাংস পেশীতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন থেকে বেশি করে ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয়। এই এসিড রক্ত স্রোত দিয়ে যকৃতে উপস্থিত হয় এবং সেখানে পুনরায় গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়।

চর্বি থেকে যে গ্লিসারল উৎপন্ন হয় তার কতক অংশ যকৃতে গিয়ে গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়। এ্যামাইনো এসিডদের কিছু অংশ এবং পাইরুভিক গ্লাইকোজেন রূপে যকৃতে রক্ষিত হয়। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, দেহ কারখানায় নানা উপায়ে পেশী ও যকৃতের একেবারে নিঃশেষ হয় না।

কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম যকৃতের কাজঃ কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে যকৃতের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যথা (১) গ্লুকোজ, লেভুলোজ, গালাকটোজ এবং ল্যাকটোজকে যকৃৎ গ্লাইকোজেনে পরিণত করে রং আবশ্যক মতো পুনরায় গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে রক্তস্রোতে প্রেরণ করে। এই ভাঙা গড়া কাজ অবিরাম চলে। (২) রক্তে সুগারের পরিমাণ কম মাত্র গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজে এনে যকৃত রক্তে চালান দেয় এবং সুগারের মান বাজায় রাখে। (৩) কার্বোহাইড্রেটের অভাবে চর্বি ও প্রোটিন থেকে গ্লুকোজ তৈরি করে যকৃত কাজ চালিয়ে যায়। একে নিওগ্লুকোজেনোসিস বলা হয়।

অনেক সময় সাময়িকভাবে রক্তে সুগার বৃদ্ধি পায়। অধিক শারীরিক পরিশ্রম এবং শ্বেতসার বহুল আহারের পরে, ভাবের উত্তেজনায়, অ্যাড্রিনাল, নিকোটিন, গ্লুকোজন সেবনে, পিটুইট্রিন ইনজেকশনে, রোগীকে এনেস্থেসিয়ার (অজ্ঞান করা) সময় রক্তে সুগার সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায়। কার্বোহাইড্রেটের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দেহকোষদের এনার্জি যোগানো। এটি দেহ ভাণ্ডারে গ্লাইকোজেন রূপে অবস্থান করে এবং বাড়তি কার্বোহাইড্রেট ফ্যাটে রূপান্তরিত হয়ে দেহে রক্ষিত থাকে।

ফ্যোট মেটালিজম বা স্নেহ পদার্থের পাক পরিমাণ (Fat metalism): সাধারণ মানুষের দৈহিক ওজনের শতকরা ১২ ভাগ চর্বি। এর অর্ধেক পরিমাণ চামড়ার নীচেই থাকে। আমরা তেল, ঘি, মাখন, পশু চর্বি থেকে চর্বি খাদ্য পাই। তাছাড়া শ্বেতসার খান্য থেকেও দেহকোষ কিছু ফ্যাট সংগ্রহ করে। খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট গরুর ভেড়া শুকরদের চর্বিবহুল করার জন্য যব, ছাতু, ছোলা প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট খাবার খাওয়ান হয়। নিরামিষাশীদের মধ্যে ভুঁড়িওলা চর্বিবহুল মানুষের সংখ্যা অনেক। প্রয়োজন কালে দেহ প্রোটিন থেকেও চর্বি বের করে তবে সেটা কম ক্ষেত্রেই ঘটে।

চর্বির ক্রিয়া (Function of fat): (১) দেহের তাপ সাম্যের রক্ষা। বেশি ঠান্ডা বা অত্যন্ত গরম থেকে চর্বির আবরণ আমাদের রক্ষা করে। চর্বি চাপ ও তড়িৎ বিকীরণ হতে দেয়া না, ইনসুলেশনের কাজ করে। স্ত্রীলোকদের দেহে বেশি চর্বি থাকায় তাদের গরম ঠাণ্ডা ও তড়িৎ সহনশীলতা পুরুষের চেয়ে বেশি। (২) চর্বি মানব দেহে প্যাডের কাজ করে। অল্প আঘাত ঠেকাতে পারে। দুই উরুতে চর্বির প্যাড থাকায় বসার সুবিধা, ইহা কুশনের কাজ করে। পদতলে চর্বি থাকায় চলাফেরার ধাক্কা লাগে না। ইহা অনেকটা হাওয়া ভরা টায়ারের কাজ করে। দুই করতলের চর্বির প্যাড থাকায় রক্তনালী ও নার্ভদের চাপ ও ঠান্ডা গরম থেকে বাঁচায়। আমাদের দুই অক্ষিগোলক চর্বির দ্বারা সুরক্ষিত, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচায় এবং চোখের ঘোরা ফেরা সহজ করে। দুই গালে চর্বি থাকায় চিবানো, শোষণ কার্য ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রক্ষা, সহজ ও সম্ভব হয়। (৩) চর্বি আপৎকালে খাদ্য ও এনার্জি ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। প্রথমত এটির ক্যালরিক মূল্য, কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন অপেক্ষা দ্বিগুণের বেশি। দ্বিতীয়ত ফ্যাট শুকনো ও ঘন পদার্থ, এর শতকরা মাত্র ৫ ভাগ জলে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের জলীয় অংশ অনেক বেশি। ফ্যাট অল্প অঙ্গে বসে থেকে বহু এনার্জি সঞ্চয় করে রেখেছে। এই সঞ্চিত ধন লুকানো নেই। আদান প্রদান দ্বারা সর্বদা তাজা থাকে। আবশ্যক হলে দেহের যে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পাঠান যায়। ইহা অনেকটা ইঞ্জিনের ইন্ধন ও তেলের কাজ করার ন্যায় কাজ করে। (৪) হিট ও এনার্জি। ফ্যাটের দহনে (অক্সিডেশান) তাপ জন্মে, দেহের ক্রিয়া শক্তি বাড়ে। দেখা যায় দেহের যে সব যন্ত্র বেশিকাজ করে তাদের মধ্যে চর্বির পরিমাণও অধিক। আমাদের হৃদপিণ্ড দিনরাত এক তালে খাটে, এটির আবরণের মধ্যে যথেষ্ট চর্বি সঞ্চিত আছে।

অনেক সময় ফ্যাট পরিপাকে বিঘ্ন ঘটতে দেখা যায়। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্রিয়া যদি কমে তবে দেহে চর্বি জমে যায় আর যদি ক্রিয়া বাড়ে তা হলে চর্বি কমতে থাকে। পিটুইটারি গ্রন্থির বিকারে দেহাকৃতি ক্ষুদ্র হয় এবং মেদ বৃদ্ধির হয়। ওবিসিটি মানে অস্বাভাবিক মোটা ও চর্বির বস্তা। সাধারণত আমরা যে সকল মোটা মানুষ দেখি, এরা প্রচুর খায়, কম পরিশ্রম করে, সেজন্য অতিরিক্ত খাদ্য, চর্বিরূপে তাদের পেটে ও

সর্বদেহে জমে যায়। রোগা মানুষের চেয়ে চর্বির বস্তার ন্যায় মানুষ বাঁচে অল্পকাল। দেহের চাহিদা অপেক্ষা অধিক চর্বিযুক্ত খাদা খেলে, অন্ত্রে হজম হয় না, মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। শিশুকে জোর করে অধিক দুধ খাওয়ালে মলে সাবানের মতো ফেনা দেখা যায় এবং পেটের গোলমাল সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন ধরনের খাদ্য: পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিন ধরনের খাদ্য (১) প্রোটিন জাতীয় বা আমিষ জাতীয় খ্যদ্য, (২) ফ্যাট জাতীয় বা চর্বি/স্নেহজাতীয় খাদ্য (৩) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় বা শর্করা জাতীয় খাদ্য। এছাড়াও আছে বিভিন্ন ধাতব ও অজৈব লবণ, জল এবং ভিটামিন এগুলোও আমাদের দেহের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

প্রোটিন জাতীয় খাদ্য: মাছ, মাংস, দুধ ছানা ডিম তথা জান্তব প্রোটিন। আর ভেজিটেবিল প্রোটিনের মধ্যে সয়াবিন, ডাল প্রভৃতি। প্রোটিন খাদ্য আমাদের পুষ্টি যোগায় পেশীর ক্ষয়পুরণ করে।

ফ্যাট জাতীয় খাদ্য: তেল, ঘি, চর্বি, মাখন, বাদাম, নারকেল প্রভৃতি হচ্ছে এ শ্রেণিভুক্ত খাদ্য। এই খাদ্য আমাদের মেদ বাড়ায়, পরিশ্রমের শক্তি যোগায় এবং দেহের তাপের সমতা রক্ষা করে।

কার্বোহাইড্রেট খাদ্য: এইসব খাদ্যের মধ্যে মিষ্টি, গ্লুকোজ বা চিনি, মিছরি, গুড়, মধু, মিষ্টি ফলের রস, চকোলেট প্রভৃতি। এছাড়া আলু, ভাত, চিড়ে গম বার্লি, সাবু, মুড়ি, খৈ প্রভৃতি স্টার্চ বা শ্বেতসার প্রধান খাদ্য ও এই শর্করা খাদ্যের শ্রেণিভুক্ত। শর্করা খাদ্য দেহে তাপ ও শক্তি যোগায় এবং কিছুটা মেদ সৃষ্টির পক্ষেও সহায়ক হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন ধাতব ও অজৈব লবন যথা সোডিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাসিয়াম ইত্যাদি আমাদের দেহের পক্ষে অতি প্রয়োজন। এটির অভাবে শরীরের ক্ষতি বা রোগ হয়।

ভিটামিন (Vitamins)

খাদ্যে এমন কয়েক প্রকার সূক্ষ্ম উপাদান আছে যার অভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না, জীবনী শক্তি দ্রুত হ্রাস পায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ফলে দেহে নানা রোগ দেখা যায়। এই সব সূক্ষ্ম উপাদানগুলোকে বলে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। নিচে এই ভিটামিন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:
ভিটামিন এ (Vitamin A): ইহা হচ্ছে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন। এটি প্রাকৃতিক বা সিন্থেটিক উভয়ভাবেই পাওয়া যায়। কর্ড, হ্যালিবাট, খার্ক প্রভৃতি সামুদ্রিক মাছের যকৃতের তেলে এই ভিটামিন প্রচুর থাকে। এছাড়া দুধ, মাখন, ক্রিম, ডিমের কুসুম, মাংসের চর্বি, মেটুলি প্রভৃতিসহ নটে শাক, পালং শাক, গাজর, রাঙা আলু, মটরশুটি, ফুলকপি, বাধাকপি, স্পাইনাক শাক, টমেটো, পেপে, পাকা আম প্রভৃতিতে এই ভিটামিন প্রচুর থাকে।

ভিটামিন 'এ' র অভাবে চোখের নানা রোগ হয় যথা- রাতকানা, জেরোফথ্যালমিয়া, ফেরাটোম্যালেসিয়া, ফোটোফোরিয়া ইত্যাদি। এছাড়া পেটের গোলমাল, অগ্নিমান্দ্য, সহজে ঠাণ্ডা লাগা, সর্দিকাশি, শিশুদের কতগুলো চর্মরোগ এবং বাড়বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটা, রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা কমে যাওয়া, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দুর্বলতা ও ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া প্রভৃতি দেখা দেয়।

ভিটামিন ডি (Vitamin D): এটিকে অ্যান্টার‍্যাচিটিক ভিটামিন বলে। এটিও চর্বিতে দ্রবণীয়। এই ভিটামিন দেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণে তথা দেহের কাজে লাগাতে সাহায্য করে। শিশুদের ডি-ভিটামিনের অভাব হলে দেহে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয় এবং রিকেটস্ রোগ হয়। এছাড়া বয়স্কদের অস্হি নরম ও বিকৃত হয়ে অস্টিওম্যালাসিয়া রোগ দেখা দেয়। এছাড়া এই ভিটামিনের অভাবে শিশুদের দাঁতের গঠন ঠিকমতো হয় না, বিকৃত হয়। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে সহজেই ঠাণ্ডা লাগে এবং সর্দিকাশি হয়।

রিকেটস্ এবং অস্টিওম্যালাসিয়া রোগে ডি-ভিটামিন ক্যালসিয়ামের সাথে একত্রে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এই দুই রোগের গুরুতর উপসর্গস্বরূপ টেটানি রোগ দেখা দিলে সেক্ষেত্রেও এই ভিটামিন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ক্রনিক আথ্রাইটিস রোগে বিশেষ করে অ্যাট্রিফিক ও হাইপারট্রফিক আথ্রাইটিস কেসে ডি-ভিটামিন ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। লুপাস ভালগারিস সহ বিভিন্ন কতগুলো চর্ম রোগেও এই ভিটামিন ব্যবহার করা হয়। বারবার সর্দিকাশিতে ভোগার ক্ষেত্রে দেহের প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানোর জন্য এই ডি-ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম একত্রে ব্যবহার করা যায়। তবে অধিক মাত্রায় ডি-ভিটামিন ব্যবহারে ক্যালসিয়াম পয়েজনিং লক্ষণ দেখা দেয়। কড, হ্যালিবাট ও শার্ক মাছের যকৃতের তেলে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। ডিমের কুসুম, ছানা, দুধ, ঘি, মাখন, মেটুলি, পশুদের পিত্ত চর্বিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। কিছু কিছু ভেজিটেবল অয়েলেও এই ভিটামিন পাওয়া যায়। এছাড়া সূর্যের আলো চর্মে লেগে এই ভিটামিন অমাদের শরীরে প্রস্তুত হয়। কোলেক্যালসিফেরল, ক্যালসিফেরল প্রভৃতি হচ্ছে ডি-ভিটামিনের বিভিন্ন রূপ এবং নানা পেটেন্ট নামে বাজারে পাওয়া যায়।

ভিটামিন ই (Vitamin E): চর্বিতে দ্রবণীয় এই ভিটামিনটি প্রাকৃতিক উপায়ে বিভিন্ন শস্য বীজের তেল প্রধানত হুইটজার্ম অয়েল ও সয়াবিনের তেল থেকে প্রস্তুত। এছাড়া সিন্থেটিক উপায়েও এটি তৈরি হয়। ইহার রাসায়নিক নাম টোকোফেরল। এই ভিটামিনের অভাবে পুরুষের বীর্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়া, মেয়েদের স্তনের দুধের অভাব, বারবার গর্ভপাত প্রভৃতি হতে পারে। তাই এইসব ক্ষেত্রে এই ভিটামিন প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। তবে এসব ক্ষেত্রে এর ফলাফল সন্তোষজনক নয়। আরো যে সব রোগে এই 'ই' ভিটামিন ব্যবহার হচ্ছে তা হলো মেনোপজাল সিনড্রোম (অ্যাস্ট্রোজেনের সাথে) ঋতু সংক্রান্ত কয়েকটি গোলযোগ, করোনারি থ্রম্বোসিস, থ্রম্বোফ্লিবাইটিস, তুষার ক্ষয়, পায়ের কড়া ঘা, প্রৌঢ় ব্যক্তির কাঁধ ও বাহুর বেদনা তথা বাহু নড়ানো চড়ানো অসুবিধা সংক্রান্ত রোগ প্রভৃতি। এছাড়া এই ভিটামিনের অভাব থেকে মাংস পেশীর ক্ষয় ও দুর্বলতা রোগ হলে (muscular dystrophy): E Vitamin সেবন করিয়ে বিশেষ সুফল হয়। নবজাত প্রিম্যাচিওর শিশুদের হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার সম্ভবত এই ভিটামিনের ঘাটতি থাকে। তাই আজকাল অপুষ্ট কচি শিশুদের এই রোগে ভিটামিন 'ই' প্রয়োগ করা হয়। সয়াবিন, গম, যব ভুট্টা, লেটুস শাকের পাতা, তুলা ও ধানের বীজ এবং গমের বীজে এই ভিটামিন প্রচুর থাকে। ডিমের কুসুম, অলিভ অয়েল, মাংস ও চর্বিতে এই ভিটামিন কিছু থাকে।

ভিটামিন কে (Vitamin K): K Vitamin ব্লাড প্লাজমায়ে প্রোথ্রম্বিনের স্বাভাবিক মান রক্ষা করে ও রক্ত জমাট বাঁধায় সাহায্য করে। এটিও চর্বিতে দ্রবণীয়, জলে গলে না। এই ভিটামিনের অভাব হলে লিভারে প্রোথ্রাম্বিনের সৃষ্টি কাজে বিঘ্ন ঘটে, ফলে রক্ত জমাট বাঁধার সময় দীর্ঘ হয় এবং অকারণ রক্তপাত প্রবণতা দেখা দেয়। নবজাত রুগ্ন শিশুদের রক্ত স্রাবের মূলে এই K Vitamin এর অভাব থাকে। নবজাত রুগ্ন শিশুদের রক্তস্রাব ও পিত্ত অবরুদ্ধজনিত জণ্ডিসে এই ভিটামিন প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। এছাড়া

হেপাটাইটিস রোগেও অন্যান্য চিকিৎসার সাথে K Vitamin সেবন করার ব্যবস্হা করা হয়। সিলিয়াক ব্যাধি, ননট্রপিকাল স্প্রে এবং কয়েক ধরনের আলসারেটিভ কোলাইটিসে ভুগলে এই ভিটামিন অন্ত্রে শোষণের কাজে বিঘ্ন ঘটায়। তাই এক্ষেত্রেও K Vitamin অন্যান্য চিকিৎসার সাথে একত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। ক্রনিক আমাশাতেও এই ভিটামিন সেবনের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি চলার সময় প্রয়াজনে K প্রয়োগ করা হয়।

ভিটামিন বি১ (Vitamin B1): এটির রাসায়নিক নাম থিয়ামিন ও এনিডিরিন হাইড্রোক্লোরাইড। এই ভিটামিন আমাদের অতি প্রয়োজনীয়। এর অভাবে হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা, ক্ষুধামন্দা, ক্লান্তি, পেশীতে খিলধরা, পেটের গোলযোগ, বেরিবেরি এবং স্নায়ু সংক্রান্ত নানারোগ দেখা দেয়। পেরিফেরাল নিউরাইটিস ও বেরিবেরি রোগের প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে ভিটামিন 'বি' অবশ্য এইরোগে অন্যান্য 'বি' ভিটামিনের ঘাটতি থাকে। তাই 'বি' ছাড়াও অন্যান্য 'বি' ভিটামিনও (vitamin B Complex) এই রোগে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন, শিশুদের বাড়-বৃদ্ধির সময়, সংক্রমক রোগে ভোগকালিন, যকৃত ও পিত্ত সংক্রান্ত রোগ, উদরাময়, আমাশয়, অন্ত্রপেশীর দুর্বলতা জনিত কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়াবেটিস, অপারেশনের পর প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভিটামিন 'বি' প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে এই সব ক্ষেত্রে কেবল vitamin B না দিয়ে ঐ সাথে অন্যান্য 'বি' ভিটামিনও অর্থাৎ ভিটামিন B Complex দেওয়া যায়। অনেক সময় স্নায়ু সংক্রান্ত রোগেও এই ভিটামিন ভাল কাজ করে। স্পাইনাক, বীট, গাজর, কপি, টমেটো, আঙ্গুর প্রভৃতিসহ বিভিন্ন ফল পাকড়, ধান, যব, গম, ভুট্টা, তাড়ি ও ইস্ট-এ এই ভিটামিন প্রচুর থাকে। এছাড়া মেটুলি, দুধ, ডিম ও শুকরের মাংসে এই ভিটামিন যথেষ্ট থাকে।

ভিটামিন বি২ (Vitamin B2): এর রাসায়নিক নাম রিবোফ্লাভিন, বিভিন্ন প্রকার সবুজ শাক সবজি, ফল, বার্লি, ইস্ট, যকৃত, ডিম ও দুধে এই খাদ্যপ্রাণ থাকে। এই ভিটামিনের অভাবে মুখ ও ঠোটের দু কোনো ফাটা ও ক্ষতযুক্ত হয় (angular stomatitis) জিভ ফাটা, জিভ ফোলা, ব্যথা, ফুসকুড়ি ও প্রদাহ হয়। এছাড়া সিবোরিক ধরনের ডার্মাটাইটিস, দেহের বিভিন্ন স্থানে চুলকানি, অণ্ডকোষ ও চর্মের ছাল ওটা, পদতলে জ্বালা (buming geet), গুহ্য ও জনন ইন্দ্রিয়ে চুলকানি, পেশীর অবসন্নতা প্রভৃতি দেখা দেয়। চোখের বিভিন্ন রোগ যথা চোখ দিয়ে জল পড়া, জ্বালা করা, চোখে রক্তাধিক্য, চোখের প্রদাহ কর্ণিয়ার প্রসারণ, ক্ষত ও প্রদাহ এবং ফটোফোবিয়া নামক চোখের রোগ vitamin B_2র (রিবোফ্লাবিন) অভাবে হয়। উপরোক্ত সব রোগ বা সবক্ষেত্রেই রিবোফ্লেভিন দৈনিক ৫-১০ মি. গ্রাম বা তারও বেশি মাত্রায় সেবন করানো হয়। তবে উপরোক্ত রোগে এটি এককভাবে না দিয়ে সচরাচর অন্যান্য B vitamin এর সাথে একত্রে vitamin B Complex ব্যবহার করা যায়। পেলেগ্রা রোগে এটি নিকোটেনামাইড সহ অন্যান্য বি ভিটামিনের সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়। বেরিবেরি রোগেও ইহা ব্যবহার করা যায়।

ভিটামিন বি৬ (Vitamin B6): এর রাসায়নিক নাম পাইরিডিন। যকৃত, টাটকা মাংস, মাছ, দুধ, ডিম, ইস্ট, শাক সবজী, রাইস ব্রান ও সিরিয়ালে এই খাদ্যপ্রাণ প্রচুর থাকে। শিশুদের এই ভিটামিনের অভাব হলে মৃগী রোগীর মতো খিঁচুনি, অস্থিরতা, অনিদ্রা দেখা দেয়। এর অভাবে নিউরাইটিস হতে পারে। বিশেষ করে 'টিবি' রোগিদের দীর্ঘদিন ধরে আইসোনিয়াজিড সেবনের কুফল স্বরূপ এই খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটে পেরিফেরাল নিউরাইটিস প্রায়ই দেখা দেয়। এছাড়া ওষ্ঠ, জিভ, মুখের প্রদাহ ক্ষত ডার্লাটাইটিস প্রভৃতি ক্ষেত্রেও অন্যান্য B Vitamin এর সাথে পাইরিডিনের অভাব প্রকাশ করে। তাই এসব ক্ষেত্রে পাইরিডিনসহ অন্যান্য B Vitamin A(vitamin B Complex) খেতে দেওয়া হয়। গর্ভাবস্থায় বমি বা

বমিভাব, অ্যাকিউট অ্যালকোহলিজম, রেডিয়েশন সিক্‌নেস, লিউকোপিনিয়া, পার্কিনসনস ডিজিজ, অ্যাগ্রানুলোসাইটোসিস রোগেও এই ভিটামিন ব্যবহার করা হয়।

নিকোটিনাইড ও নিকটিনিক এসিড: এ দুটোও vitamin B এর অন্তর্গত এবং এদের ব্যবহার একই। পেলাগ্রা রোগ মূলত এই ভিটামিনের অভাব থেকে হয়। তাই এই রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক হিসাবে এই ভিটামিন ব্যবহার করা হয়। তবে এর সাথে অন্যান্য vitamin B দেওয়া যায়। জিভের প্রদাহ, উদরাময়, কোলাইটিস, মনের বিকার, স্নায়ু সংক্রান্ত গোলযোগ বা পেরিফেরাল নিউরাইটিস, চর্মপ্রদাহ, চর্মে ছোপ ধরা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই ভিটামিনের অভাব থাকে। তাই এসব ক্ষেত্রে নিকোটিনামাইড বা নিকোটিনিক অ্যাসিড ব্যবহার হয়। এছাড়া মেনিয়ারস, লিনড্রোম, সেরিব্রাল আর্টিলিওস ক্লোরোসিস, অ্যাঞ্জাইনা পেকটোরিস, সেরিব্রোভাসকিউলার স্প্যাজম, চিলব্লেইনস্ প্রভৃতি রোগে নিকোটিনিক এসিড অধিক মাত্রায় ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে নিকোটিনামাইড কার্যকরী নয়।

মিটামিন বি১২ (Vitamin B12): এর রাসায়নিক নাম সায়ানোকোবালামিন। লিভার-এ, ট্রাক্‌টে এটি যথেষ্ট থাকে। আজকাল প্রধানত সিন্থেটিক উপায়ে এটি প্রস্তুত হয়। Vitamin B12 রক্ত উৎপাদন কেন্দ্রকে উজ্জীবিত করে, অস্থিমজ্জা থেকে লাল রক্ত কণিকা গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া প্লেটলেটিস্ ও হিমোগ্লোবিন তৈরি করে রক্ত প্রবাহে প্রেরণ করে। এই ভিটামিনের অভাব ঘটলে পার্নিপাস অ্যানিমিয়া নামক এক প্রকার ভয়ংকর প্রকৃতির অ্যানিমিয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমিয়ায় এই ভিটামিন অর্থাৎ সায়ানোকোবালামিন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া টনিক ও পুষ্টির উপাদান হিসাবে সায়ানোকোবালামিন অন্যান্য B vitaminএর সঙ্গে রোগ অরোগ্য কালিন অবস্থায়, শিশুদের বাড়ন্ত বয়সে, যকৃতের রোগে, গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদান কালিন সংক্রামক রোগে ভোগকালিন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবহার হয়। এছাড়াও স্নায়ু সংক্রান্ত নানা গোলযোগ যথা বিভিন্ন প্রকার নিউরাইটিস, এ্যালকোহলিক নিউরাইটিস, ডায়াবেটিস জনিত নিউরাইটিস, সায়াটিকা, লাম্বাগো, হার্পিস জক্টার জনিত নার্ভেও বেদনা, জ্বালাপোড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে Vitamin B12 ব্যবহার করা যায়।

ফোলিক এসিড (Folic Acid): ইহাকেও বি গোষ্ঠীর ভিটামিন হিসাবে গণ্য করা হয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক লাল রক্তকণা গঠন ও তার পরিপূর্ণ বিকাশে ফোলিক এসিডের অবদান যথেষ্ট। এটির অভাবে -এ বিঘ্ন ঘটে অর্থাৎ লাল রক্ত কনিকার মৌলিক উপাদানের গঠন ক্ষেত্রে বাধা পায়, মেগালোব্লাষ্ট কণার বিকৃতি, লিউকোপিনিয়া ও থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া যুক্ত অ্যানিমিয়ায় ফোলিক এসিড ব্যবহার উপকার হয়। এছাড়া ট্রপিক্যাল ও নন-ট্রপিকাল স্প্র, সিলিয়াক ব্যাধি, পেলাগ্রা প্রভৃতির সাথে জড়িত অ্যানিমিয়াসহ নিউট্রিশনাল ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া কেসেও এটি সুন্দর কাজ করে। পার্নিশাস অ্যানিমিয়ায় ফোলিক এসিড প্রথমদিকে ফলপ্রদ হলেও এক্ষেত্রে ইহা কখনো একাকী ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এই রোগে নার্ভ সংক্রান্ত যে সব উপসর্গ দেখা দেয় তা ফোলিক এসিড আদৌ উপশম ঘটাতে পারে না বরং অনেক সময় বিপত্তি ঘটায়। তাই এই রোগে ইহা সর্বদাই সায়ানোকোবালামিনের সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত। ফোলিক এসিডের অভাবজনিত বিভিন্ন ধরনের রক্তহীণতার চিকিৎসায় ইহা 5mg. মাত্রায় দিনে 24 বার খেতে দেওয়া যায়।

ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (Vitamin B Complex): B Group এর সব কটি ভিটামিন একত্রে মিশিয়ে তৈরি হয় Vitamin B Complex দেহে সামগ্রিক ভাবে B Vitamin সমূহের অভাব হলে vitamin B Complex সেবন করানো হয় বা প্রয়োজনে এর ইনজেকশান দেওয়া হয়। পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিভিন্ন

রোগ, যকৃত ও পিত্তের বিকার, হজমের গোলযোগ, ডায়াবেটিস, কিডনির রোগ, পেটের অপারেশনের পর গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর, অ্যান্টিবায়োটিক ও সালফার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসাকালীন মদ্যপায়ী, হাইপার থাইরয়েডিজম সংক্রমক রোগে ভোগা, শিশুদের বাড়ন্ত বয়সে, নার্ভ সংক্রান্ত রোগ ও নার্ভের দুর্বলতা, রক্তাল্পতা, ক্ষুধামন্দা, চোখের বিভিন্ন রোগ, ঠোট মুখ ও জিভের ক্ষত, পার্কিনসনস্ ডিজিজ প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে- ব্যবহার করা যায়। এটি অনেক সময় টনিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহা ক্ষুধা ও হজমশক্তি বাড়ায় এবং দেহে B vitamin এর অভাব মেটায়।

ভিটামিন সি (Vitamin C): এর রাসায়নিক নাম Vitamin C। বিভিন্ন প্রকার টক অথবা টক-মিষ্টি ফলে এই ভিটামিন প্রচুর থাকে। দেহে এই ভিটামিনের দীর্ঘদিন ধরে অভাব হলে স্কার্ভি নামক রোগ হয়। এছাড়া ইহার অভাবে শিশুদের দাঁত ও অস্থির গঠন মজবুত হয় না, দাঁতে পোকা হয়, মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে। হাত পায়ের চামড়া শুকনো ও খসখসে হয়। স্থানে স্থানে কালশিটে দাগ প্রভৃতিও Vitamin C-এর অভাব প্রকাশ করে। Vitamin C লাল রক্ত কণিকা ও হিমোগ্লোবিনের সুস্থ ও পরিপূর্ণ গঠনেও কিছুটা সাহায্য করে। তাই বিভিন্ন প্রকার রক্তহীনতার রোগে ইহা অন্যান্য ঔষধের সাথে একত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া স্কার্ভি রোগসহ বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগে ভোগা, দেহের ক্ষত, আঘাত, পাপূরা, অপারেশনের পূর্বে ও পরে গর্ভ্যবস্থায় বারবার ঠাণ্ডা লেগে সার্দিকাশিতে ভোগা, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিভিন্ন রোগ ও আলসার, শিশু বয়সে, দাঁত ও মড়ির রোগ, মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া, শিশুদের উদারময়ে ভোগা প্রভৃতি ক্ষেত্রে Vitamin C খেতে দেওয়া হয়। আঘাত ও অপারেশনজনিত ক্ষত পোড়া ঘায়ের ক্ষেত্রে দৈনিক 500mg মাত্রায় খাইয়ে দিলে এবং বেশি দিন খাওয়ালে ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে দিতে সাহায্য করে। আজকাল বাজারে Celin Tab, Redoxon Tab, Cecon Tab ও Drops প্রভৃতি ঔষধ পাওয়া যায়। এগুলো সবই Vitamin C Group এর পেটেন্ট। 100 বা 500mg শক্তিতে তৈরি হয়।

মালটি ভিটামিন (Multi Vatamins) : ভিটামিন A, B, গোষ্ঠীর ভিটামিন, ভিটামিন C,D.E.K প্রভৃতি সব Vitamin গুলোকে একত্রে সামঞ্জস্য পূর্ণ মাত্রায় মিশিয়ে মালটিভিটামিনের অনেক পেটেন্ট Preparation যথা ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ আজকাল বাজারে যথেষ্ট পাওয়া যায়। অনেক Multi Vatamin Preparation এর সাথে আবার অল্পমাত্রায় ক্যালসিয়াম, আয়রন, কপার, ম্যাঙ্গানিজ জিংক প্রভৃতি মিনারেল সলট্সও থাকে। দেহে সামগ্রিকভাবে সব ভিটামিনের ঘাটতি হলে দেহে অনেক সময় পুষ্টির অভাব বা Malnutrition দেখা দেয়। এর ফলে সংক্রামক রোগে ভোগা, দুর্বলতা, পেটের গোলযোগ, শিশুদের বাড়ন্ত বয়সে, গর্ভাবস্থায়, স্তন্যদানকালে, অধিক শারীরিক পরিশ্রম, যকৃত ও পিত্ত সংক্রান্ত রোগ, চোখের বিভিন্ন রোগ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে মালটি ভিটামিন দেওয়া হয়।

জল এবং লবণ Water and Salts

জল (Water): জীবদেহের প্রায় ৭০% জল। শরীরে যত জল আছে তার ৫৫% আছে সেলের মধ্যে আর বাকি ৪৫% আছে সেলের বাইরে। এই সেলের বাইরের জলকে আমরা পাঁচটি বিভিন্ন অংশে ভাগ করতে পারি । যথা-১) ট্রানস্ সেলুলার জল ২.৫%। এই জল এপিথেলিয়াল মেমব্রেনের বিভিন্ন খোপের মধ্যে জমে আছে। যেমন সেরিব্রোস্পাইনাল জল, অস্থিসন্ধির মধ্যে অবস্থিত জল, সাইনোভিয়াল থলি, প্লুরা, পেরিটোনিয়াম, পেরিকার্ডিয়ামে খোলে, চোখের মধ্যে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গ্লান্ডের ও ডাক্টের মধ্যে যে জল জমে রয়েছে। ২) কানেকটিভ টিসু ও কার্টিলেজের মধ্যে যে, জল থাকে তার পরিমাণ ৭.৫%। ৩) রক্তের প্লাজমাতে ৭৫% জল আছে। ৪) ইন্টেস্টিনাল ও লিম্ফে যে জল থাকে তা হচ্ছে ২০%। ৫) হাড়ের অভ্যন্তরে জল থাকে। ৬) শরীর থেকেও দিনরাত জল বেরিয়ে যাচ্ছে শ্বাসে, ঘামে মলে ও মূত্রে। জলের এই ক্ষয় পূরণের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে আর অন্ননালীর ভেতর খাদ্যের হাইড্রোজেন অংশ অক্সিডাইজ হয়ে জল সরবরাহ করে। জলের দৈনিক চাহিদা গড়ে ২০০০ সিসি। শ্রম, বায়ুর চাপ, তাপ এবং বিভিন্ন অবস্হায় এই চাহিদা কম বেশি হয়ে থাকে। দেহের ৭০% জল, রক্তের ৭৮.৮% জল এবং বাকী জল টিস্যু ও সেলে ছড়িয়ে আছে।

জলের কাজ (Function of Water): জীবকোষ তথা প্রোটোপ্লাজমের জন্য জল অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। জীব কোষ বাঁচিয়ে রাখতে নিরন্তর ভাবে জল সরবরাহ থাকা চাই। আমাদের দেহ কারখানায় জল নিয়েই কাজ চলছে। জলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ১) এনজাইমরা জল বিনা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে । ২) খাদ্যের সার ও খাদ্যাবশেষ জলে ভরা এবং জলই চলাফেরা করে। ৩) দেহের সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়া, হইড্রোলিসিস, অসমোসিস, ডিফিউসন্ ইত্যাদি প্রক্রিয়া জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, জলের কমতি হলেই পিপাসা পায় । ৪) মলমূত্র, ঘর্ম, শ্বাস-প্রশ্বাস, সব দিক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। পূরণ করার একমাত্র পথ, মুখ দিয়ে পান করা। আমাদের চামড়া জল টানে না। বিপদ-আপদে ইনজেকশান বা মলপথে জল দেওয়া হয়। পাকস্থলীতে জল বেশি শোষিত হয় না, ক্ষুদ্র অন্ত্রই বেশি জল টানে, বাকি জল শোষে বৃহৎ অন্ত্র। খালি পেটে জল পান করতে তা শীঘ্রই পাইলোরাস খুলে অন্ত্রে চলে যায় এবং চট করে কিডনি দিয়ে বেরিয়ে যায়। ভরা পেটে জল খেলে নির্গত হতে দেরি হয়। জলের অভাবে চামড়া শুকিয়ে কুঁচকে আসে, মূত্রের পরিমাণ কমে যায়। ক্রমে ডি-হাইড্রেশান লক্ষণ প্রকাশ প্রায়। দেহের কলকব্জা আটকে গিয়ে নানা বিপর্যয় ঘটে। চিকিৎসককে এই বিষয় সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। গ্লুকোজ স্যালাইন দিয়ে এবং ইনজেকশান প্রয়োগ করে জীবকোষদের বাঁচিয়ে কার্যকরী রাখাই চিকিৎসার কৌশল।

জল বিপাক (Water digestion): প্রত্যহ খাদ্য থেকে এক কিলো এবং পানি থেকে প্রায় দেড় কিলো জল আমরা গ্রহণ করি। তাছাড়াও মুখের লালা ও থুথু অনেক গিলে থাকি। অসংখ্য লালা গ্রন্থির রস তৈরি হয় রক্তরস থেকে। রক্ত তার জলীয় রসের ভাগ গ্রহণ করে অন্ত্ররস থেকে। এই ভাবে একটা বিপুল স্রোত সারাদেহে অবিরত প্রবাহিত হচ্ছে। একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, যত জলই আমরা খাই না কেন, রক্তের জলীয় ভাগ (প্লাজমা) ও অসমোটিক চাপ সকল সময় এক রকম থাকে। সারা দেহে প্রায় ছয় কিলো রক্ত আছে তার মধ্যে সাড়ে চার কিলো জল। অন্ত্র, যকৃৎ মাংসপেশী, কিডনি, মূত্রনালী এবং মস্তিষ্ক জলে বোঝাই। এইসব যন্ত্রে জল নিয়ত প্রবাহিত। জলকেন্দ্র মস্তিষ্কে বসে সারা দেহের জল প্রবাহ আবশ্যক অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করে। বাড়তি জল মূত্র ও ঘর্ম দিয়ে বার করে দেয়। শক হলে রক্তের জলীয় ভাগ টিস্যুর মধ্যে দিয়ে পড়ে। এর ফলে রক্ত ঘন হয়। এই অবস্থায় স্যালাইন দ্রবণ না দিয়ে প্লাজমা ইনজেকশন করা বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্হা। কারণ রক্তের কোলয়েড অসমোটিক চাপ রক্ষা স্যালাইনে হয় না। কিন্তু কলেরা উদরাময় ও বমন জনিত রক্তক্ষয়ে স্যালাইন ইনজেকশান সুফল ব্যবস্থা।

সুষম খাদ্য (Balance Diet)**:**

সুসম খাদ্য বলতে খাদ্যের একটি তালিকাকে বোঝানো হয় যেখানে খাদ্যের প্রতিটি উপাদান পরিমিত বা আনুপাতিক হারে লিপিবদ্ধ থাকে। একজন মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম, চলাফেরা, শরীর গঠন, দেহের অভ্যন্তরে রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ, স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক গতিশীলতা রক্তের প্রবাহ এবং পর্যাপ্ত তাপ উৎপাদনের জন্য খাদ্যের উপাদানগুলো যথা, শর্করা (Carbohydrate), আমিষ (Protein), এবং স্নেহ (Fat), ভিটামিন (Vitamins), খনিজ (Minerals) এবং পানি (Water), কী পরিমাণে প্রয়োজন তার পূর্ণাঙ্গ তালিকাকে সুষম খাদ্য তালিকা বলে।

যে খাদ্য দেহের ক্যালরির চাহিদার যোগান দিতে পারে, কলা-কোষের বৃদ্ধি ও গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখতে পারে এবং দেহের শরীরবৃত্তিয় কার্যাবলিকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে সুষম খাদ্য বলে। একটি পূর্ণাঙ্গ সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে অনুসরণ করতে হবে।

সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুতের মূলনীতি: একটি সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুতে নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করা উচিৎ-

- কাজের প্রকৃতি (স্বাভাবিক মাঝারী এবং পরিশ্রমী) বিবেচনা।
- লিঙ্গ, বয়স এবং ওজন অনুসরণ।
- প্রতিদিনের ক্যালরির চাহিদা (Kcal) নির্ধারণ।
- প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের আনুপাতিক হার (%) নির্ণয়।
- (Kcal)- কে গ্রামে (gm) রূপান্তর।
- খাদ্য চয়ন।
- খাদ্য বিতরণ (Serving)।

সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুতের ধাপ:

১. প্রতিদিনের ক্যলরির চাহিদা নির্ধারণ (উদাহরণস্বরূপ দেখানো হলো):

লিঙ্গ	ওজন (Kg)	উচ্চতা (ft/in)	কাজের প্রকৃতি	ক্যালরির চাহিদা (Kcal)
পুরুষ	৬০	৫´ ৬´´	স্বাভাবিক	২৩৫০
পুরুষ	৬০	৫´ ৬´´	মাঝারি	২৭০০
পুরুষ	৫০	৫´ ৩´´	স্বাভাবিক	১৮০০
পুরুষ	৫০	৫´ ৩´´	মাঝারি	২১০০

২. প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের আনুপাতিক হার (মোট চাহিদার):

ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস্ (Macronutrients) - শর্করা (Carbohydrate) - ৫৫%
আমিষ (Protein) - ৩০%
এবং স্নেহ ((Fat) - ১৫%
ভিটামিন (Vitamins)

খনিজ (Minerals) -
খাদ্যকে ভাঙ্গতে এবং রূপান্তর করতে সাহায্য করে।
এবং পানি (Water) -
খাদ্যকে ভঙ্গতে এবং রূপান্তর করতে সাহায্য করে।

৩. ক্যালরির মান (কিলোক্যালরি/kcal/থেকে গ্রাম/gm - এ) পরিবর্তন:

শর্করা (Carbohydrate)	-	৪ কিলোক্যালরি = ১ গ্রাম
আমিষ (Protein)	-	৪ কিলোক্যালরি = ১ গ্রাম
এবং স্নেহ (Fat)	-	৯ কিলোক্যালরি = ১ গ্রাম

৪. ক্যালকুলেশন:
নিম্নে একজন মাঝারি পরিশ্রমী কর্মজীবী পুরুষের খাদ্য তৈরি করতে কোনো খাদ্য কত পরিমাণ প্রয়োজন তার একটি নমুনা দেয়া হলো:
ধরা যাক ক্যালরির চাহিদা ২৭০০ Kcal তাহলে -

শর্করা (Carbohydrate)	- ২৭০০ এর ৫৫%	= ১৪৮৫ kcal/ ৪ = ৩৭১.২৫ গ্রাম
আমিষ (Protein)	- ২৭০০ এর ৩০%	= ৮১০ kcal/ ৪ = ২০২.৫০ গ্রাম
এবং স্নেহ ((Fat)	- ২৭০০ এর ১৫%	= ৪০৫ kcal/ ৯ = ৪৫ গ্রাম

নোট: মোট চাহিদার ৫৫% অর্থাৎ ১৪৮৫ kcal শর্করা প্রয়োজন। তাকে ৪ দিয়ে ভাগ দিলে ৩৭১.২৫ গ্রাম হয় (কারণ ১ গ্রাম =৪ kcal)।
মোট চাহিদার ৩০% অর্থাৎ ৮১০ kcal আমিষ প্রয়োজন। তাকে ৪ দিয়ে ভাগ দিলে ২০২.৫০ গ্রাম হয় (কারণ ১ গ্রাম =৪ kcal)।
মোট চাহিদার ১৫% অর্থাৎ ৪০৫ kcal স্নেহ প্রয়োজন। তাকে ৯ দিয়ে ভাগ দিলে ৪৫ গ্রাম হয় (কারণ ১ গ্রাম =৯ kcal)।

৫. খাদ্য বিতরণ: এখন উপযুক্ত চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য চয়ন ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি খাদ্যের একটি নির্দিষ্ট ক্যালরিক ভ্যালু রয়েছে। এই ক্যালরিক ভ্যালু অনুযায়ী মোট চাহিদা পূরণ করতে পারে।
৬. সার্ভিং (Serving): প্রতিদিনের খাদ্য চাহিদাকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে ভাগ করে রাখা উচিৎ। সাধারণত দিনে ৫-৬ বার খাওয়া উত্তম।
মনে রাখা উচিৎ সবার জন্য একই খাবার গ্রহণযোগ্য নয়। কাজের প্রকৃতি, ধরন, তীব্রতা ও শারীরিক উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে সুষম খাদ্য (Balance Diet) প্রস্তুত করা প্রয়োজন। উপরের বিষয়গুলো একটি পূর্ণাঙ্গ সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুতি করতে সাহায্য করবে।
বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যসমূহের পুষ্টিমাণ
বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যসমূহের পুষ্টিমান খাদ্যমান বা পুষ্টিমানের উপর ভিত্তি করে এ ছকটি তৈরী করা হয়েছে। এটি The Institute of Nutrition and Food Science (INFS, 1975) কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রকাশিত একটি ছক। প্রতি ১০০ গ্রাম গ্রহণযোগ্য খাদ্যাংশের ভিত্তিতে পুষ্টিমান নির্ধারণ করা হয়েছে।

খাদ্যদ্রব্যের নাম	আমিষ (গ্রাম)	তেল/চর্বি (গ্রাম)	মিনারেল (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	শক্তি (কিলোক্যলরি)
চাল	৬.৪	০.৪	০.৭	৭৯.০	৩৪৬
গম (আটা)	১২.১	১.৭	২.৭	৬৯.৪	৩৪১
ছোলা	১৭.১	৫.৩	৩.০	৬০.৯	৩৬০
মসুর	২৫.১	০.৭	২.১	৫৬.০	৩৪৩
গাজর	০.৯	০.২	১.১	১০.৬	৪৮
গোল আলু	১.৬	০.১	০.৬	২২.৬	৯৭
কলমিশাক	২.৯	০.৪	২.১	৩.১	২৮
পুঁইশাক	২.০	০.৭	১.৭	২.১	২৬
কুমড়া (ছোটো)	২.১	১.০	১.৪	১০.৬	৬০
বেগুন	১.৪	০.৩	০.৩	৪.০	২৪
ফুলকপি	২.৬	০.৪	১.০	৪.০	৩০
বাঁধাকপি	১.৮	০.১	০.৬	৪.৬	২৭
বরবটি	২.৫	০.১	২.০	৩.৪	২৬
শিম	৭.২	০.১	০.৪	১৫.৯	৯৬
ইলিশ মাছ	২১.৮	১৯.৪	২.২	২.৯	২৭৩
কাতলা মাছ	১৯.৫	২.৪	১.৫	২.৯	১১১
চিংড়ি	১৯.১	১.০	১.৭	০.৮	৮৯
গো-মাংস	২২.৬	২.৬	১.০	-	১১৪
ডিম	১৩.৩	১৩.৩	১.০	-	১৭৩
মুরগির মাংস	২৫.৯	০.৬	১.৩	-	১০৯
খাসির মাংস	১৮.৫	১৩.৩	১.৩	-	১৯৪
গরুর দুধ	৩.২	৪.১	০.৮	৪.৪	৬৭
মায়ের দুধ (মানুষ)	১.১	৩.৪	০.১	৭.৪	৬৫
গরুর দুধের ঘি	-	১০০.০০	-	-	৯০০
রান্নার তেল	-	১০০.০০	-	-	৯০০

পুরুষ, মহিলা, নবজাতক ও শিশুর দৈনিক ক্যালরির চাহিদা (Energy Requirements)

পুরুষ:

দেহের ওজন (Kg)	সাধারণ পরিশ্রমী (kal)	মাঝারী পরিশ্রমী (kal)	অধিক পরিশ্রমী (kal)	ব্যতিক্রম (kal)
৫০	১৯০০	২২৫০	২৯৮০	৩০৯০
৫৫	২১৩০	২৪৮০	২৯৫০	৪৩০০
৬০	২৩৫০	২৭০০	৩২০০	৩৭১০
৬৫	২৫৭০	৩০০০	৩৪৮০	৩৯৯০
৭০	২৮০০	৩২২০	৩৭৬০	৪৩৩০

৭৫	৩০২০	৩৪৫০	৪০৩০	৪৬৪০
৮০	৩২৫০	৩৬৮০	৪৩০০	৪৯৫০

মহিলা:

দেহের ওজন (Kg)	সাধারণ পরিশ্রমী (kal)	মাঝারী পরিশ্রমী (kal)	অধিক পরিশ্রমী (kal)	ব্যতিক্রম (kal)
৪০	১৪৪০	১৭০০	১৯৮০	২২০০
৪৫	১৬২০	১৯০০	২২২০	২৪৭০
৫০	১৮০০	২১০০	২৪৫০	২৭৫০
৫৫	২০০০০	২৩০০	২৬৮০	৩০২০
৬০	২১৬০	২৫০০	২৯১০	৩৩০০
৬৫	২৩৪০	২৭০০	৩১৫০	৩৫৭০
৭০	২৫২০	২৯০০	৩৩৭০	৩৮৫০

নবজাতক শিশু কিশোর ও যুবক:

বৃদ্ধের অবস্থা	বয়স	দৈনিক ক্যালরি চাহিদা
নবজাতক	০ - ৬ মাস	১০৮ (Kcal)
	৭ - ১২ মাস	১১৮ (Kcal)
শিশু	১ - ৩ বছর	১১২৫(Kcal)
	৪ - ৬ বছর	১৬০০(Kcal)
	৭ - ৯ বছর	১৯২৫ (Kcal)
	১০ - ১২ বছর	ছেলে ২১৫০, মেয়ে ১৯৫০ (Kcal)
কিশোর	১৩ - ১৫ বছর	ছেলে ২৪০০, মেয়ে ২০৫০
	১৬ - ১৮ বছর	ছেলে ২৬০০, মেয়ে ২০৫০
যুবক	১৯ - অধিক	ছেলে ২৩৫০ (সাধারণ), মেয়ে ১৮০০ (সাধারণ)
		ছেলে ২৭০০ (মাঝারি), মেয়ে ২১০০ (মাঝারি)
		ছেলে ৩২০০ (পরিশ্রমী), মেয়ে ২৪৫০ (পরিশ্রমী)

প্রি-গেম মিল (Pre-Game Meal)

সুষম খাদ্য যেমন খেলোয়াড়ের পারফরমেন্সর ওপর প্রভাব পরে তেমনই খাদ্যের তারতম্য ও সার্ভিং পারফরমেন্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। খেলার পূর্বে, খেলা চলাকালীন এবং খেলার শেষে কী ধরনের খাবার প্রয়োজন তা জানা অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রি-গেম মিলে ভালো পারফরমেন্স ও সর্বোচ্চ শক্তিপ্রয়োগের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। খেলার পূর্বে পরিমিত গ্লাইকোজেন খেলার সময় পূর্ণশক্তি প্রেরণে সক্ষম হয়। এর জন্য নির্দিষ্ট সময় ও প্রক্রিয়া প্রয়োজন। সকলের উচিৎ খেলার পূর্বে অন্তত এক সপ্তাহ খাবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

প্রি-গেম মিল- এর কর্যকারিতা -

- হাইপোগ্লাইসেমিয়া সরবরাহ করে ।
- খেলার সময় ক্ষুধা থেকে বিরত রাখে।
- প্রয়োজনীয় গ্লাইকোজেন সঞ্চিত রাখে।
- মানসিক দিক থেকে ধনাত্নক ক্রিয়া সম্পাদান করে।

প্রি-গেম মিল- এর জন্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা:

- প্রি-গেম মিল অধিক শর্করা সমৃদ্ধ এবং স্বল্প স্নেহ পর্দার্থ দ্বারা গঠিত যা সহজে পরিপাক হবে।
- প্রতিযোগিতার এক ঘণ্টার মধ্যে কোনো মিষ্টিজাত অথবা পানিয় বর্জন করা উচিৎ।
- প্রতিযোগিতা শুরুর এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে প্রচুর পানীয় পান করা উচিৎ।
- সহজে হজমের জন্য সরল বা তরল খাবার এই সময় খাওয়া উচিৎ।
- কোনো ভারি খাবার ৩-৪ ঘণ্টা পূর্বে এবং হালকা খাবার ২-৩ ঘণ্টা পূর্বে খাওয়া উচিৎ।
- খেলাধুলার সময় শর্করা / Carbohydrate অতিরিক্ত energy সরবরাহ করে। তাই কোনো ট্রেনিং বা প্রতিযোগিতার পূর্বে (কমপক্ষে ২-৩ ঘণ্টা পূর্বে) Carbohydrate drink or meal গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- স্নেহ জাতীয় খাদ্য বা অম্ল হতে পারে এমন খাবার কোনো ট্রেনিং বা প্রতিয়োগিতার পূর্বে গ্রহণ করা উচিৎ নয়।
- খেলার দিনে হঠাৎ করে খাবার মেন্যুতে কোনো নতুন খাবার সংযোজন করা উচিৎ নয়।
- খেলা শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যে কোনো গ্লুকোজ গ্রহণ করা উচিৎ নয়। কারণ এতে রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় রক্ত সঞ্চালনের গতি মন্থর করে। ফলে দ্রুত গতি সম্পন্ন খেলা বাহত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid)

একজন আঘাতপ্রাপ্ত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসকের পরিচর্যা গ্রহণের পূর্বে যে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা করা হয় তাই প্রাথমিক চিকিৎসা।

প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্বঃ
আমরা যদি প্রাথমিক চিকিৎসার যথাযথ প্রয়োগ জানি, তাহলে অন্যদের যখন খুব প্রয়োজন হবে তখন সাহায্য করতে সক্ষম হবো। যখন কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন তাকে সর্বদাই কেউ না কেউ সাহায্য করতে চায়। কিন্তু প্রায়ই তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান না থাকার কারণে তারা ভুল করে এবং আঘাতপ্রাপ্ত বা ভুক্ত ভোগীর আরও অনেক ক্ষতি হতে পারে। একজন ভালো প্রাথমিক চিকিৎসক জানে কী করা উচিৎ এবং কী করা উচিৎ নয়।

যথাযথ প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা কারো জীবন রক্ষা করতে পারি অথবা তাকে পঙ্গুত্বের হাত থেকেও রক্ষা করতে পারি। এর মাধ্যমে যন্ত্রণা কমে যাবে এবং অসুস্থতার মাত্রা কমে যাবে। অনেক অল্প বয়স্ক ব্যক্তি বা তরুণ (বীরপুরুষ হয়ে যায় কারণ তারা) জানে যে, ডুবে যাওয়া, আঘাতপ্রাপ্ত বা রক্তাক্ত ব্যক্তিকে কি করা উচিৎ। প্রাথমিক চিকিৎসার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হলো আমাদের এ সম্পর্কে জানা থাকলে দুর্ঘটনার সময় আমরা আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবো এবং কিছু দুর্ঘটনা আমরা নিজেরাই সমাধান করতে পারবো। উপরন্তু এটা ঠিক যে, আমরা যদি আঘাতপ্রাপ্ত হই তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ভালো প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে সক্ষম হবো অথবা অন্যদেরকে সরাসরি বলে দিতে পারবো আমাদের যথাযথ কি করা উচিৎ।

Principle of first aid (প্রাথমিক চিকিৎসার মূলনীতি):

১। তাৎক্ষণিক জরুরি কার্যক্রম পরিকল্পনা
২। জীবনের অবলম্বন রক্ষা করা।
৩। প্রচুর রক্তক্ষরণ দমন করা।
৪। নিয়মতান্ত্রিক কলাসমূহকে (tissue) ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।
৫। Splint unstable injuries(বা ভাঙ্গা অস্থিকে splint দেয়া)
৬। আস্তে বা গতির রক্তক্ষরণ দমন করা ।
৭। পার্শ্বীয় কলা (Tissue) কে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা ।

Description of principles: (মূলনীতিসমূহের বর্ণনা)

(১) তাৎক্ষণিক জরুরি কার্যক্রম পরিকল্পনাঃ
ক) History- ধীরতার সাথে বর্ণনা নিতে হবে। নেয়ার সময় যা লক্ষ্য রাখতে হবে

a. Injury location (আঘাতের স্থান)
b. Whether a re in‡jvury (আঘাতের পুনারাবৃত্তি)
c. Injury medanism (ইনজুরি কিভাবে হলো)
d. Symptoms. (লক্ষণ যেমন-ব্যথা,মাজা ব্যথা অনুভূতি আছে কিনা)

খ) Inspection look -

(i) Profuse bleeding
(ii) Skin appearance
(iii) Pupil size and reaction
(iv) Deformities
(v) Swelling
(vi) Dislocation

গ) Toach feel for

(i) Find tenderness
(ii) Skin temperature
(iii) Sedation
(iv) Deformity

১. Maintain life support: দেহের স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস রক্ত সঞ্চালনের প্রতি ABCS (Airway, breathing and circulation) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সাথে শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রগুলোর দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকে।

২. Control profuse bleeding: যে কোনো সময় একজন খেলোয়াড় বা সাধারণ মানুষের চামড়া, মাংসপেশী থেতলে যেতে পারে অথবা কেটে যেতে পারে অথবা ক্ষত হতে পারে এবং তা হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে পারে। শরীর থেকে যাতে অতিরিক্ত রক্ত বের হতে না পারে তার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রক্তবাহী জীবাণু যাতে অন্য কারো শরীরে প্রবেশ করতে না পারে সেই দিকে খেয়াল রেখে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে। এজন্য জীবাণু মুক্ত গজ, ব্যান্ডেজ, গ্লাভস ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত।

3. Minimize widespread systemic tessue damage: আঘাত অসুস্থতা ও পানি স্বল্পতার কারণে শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন পানি ও অক্সিজেন প্রবাহে এক ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যা শরীরে অতিপ্রায়াজনীয় তন্ত্রে যেমন হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, মস্তিষ্কসহ অন্যান্য তন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে। এতে রোগির মারত্নক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমন কি জীবন হানী হতে পারে। এ জন্য যথাযথ প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে হিট শক, হিট স্ট্রোক, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট শক প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

4. Splint unstable injuries: হাড় ভাঙ্গা, জয়েন্ট সম্পূর্ণ বা আংশিক বিচ্যুতি ঘটলে অথবা জয়েন্ট মচকে গেলে মাংস বা পেশী ছিঁড়ে গেলে আক্রান্ত অংশকে slint এর সাথে এমনভাবে বেঁধে রাখতে হবে যাতে নড়াচড়া করতে না পারে। এতে আশপাশের টিসু, লিগামেন্ট ও হাড়ে'র সুরক্ষা হবে।

৫. Control slow, steady bleeding: Splint ব্যবহার করার রসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে না যায়। ও slint এর ঘর্ষণের ফলে যাতে চামড়া ছিঁড়ে বা ফেটে না যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। সাধারণ মুখ, হাত, বাহু, পা এসব জায়গায় স্প্লিন্ট ব্যবহারের ফলে কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সতর্কতার সাথে উক্ত স্থানে Splint ব্যবহার করা উচিৎ।

৬। Minimize local tissue damage: যদি শরীরের কোনো অংশে ইনজুরি হয়, তাহলে ইনজুরির আশে পাশের শরীরে অন্যান্য অংশের tissue গুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় Ankle Sprain এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লিগামেন্টের রক্তক্ষরণ এবং ফোলা-ই নয় এর চারপাশের tissue গুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য আমরা Ankle জয়েন্টের চারপাশে বিবর্ণতা ও ফোলা দেখতে পাই।

একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত বা ইনফেকশনের ফলে তার আশে পাশের tissue গুলোতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারে-

১) রক্তক্ষরণ হতে পারে বা fluid (তরল পদার্থ) কমে যেতে পারে।
২) Swelling বা ফুলে যেতে পারে।
৩) তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে।
৪) ব্যথা হবে।
৫) কার্যক্ষমতা কমে যাবে বা হ্রাস পাবে। (শরীরের ঐ নির্দিষ্ট অংশের অক্ষমতা)।

একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স (First Aid Box)

একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী প্রাথমিক চিকিৎসাসম্পন্ন করতে হাতের নাগালে প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স রাখতে হয়। একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বক্সে নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি থাকা আবশ্যক --

১. ছোটো এক শিশি ডেটল/স্যাভলন ,
২. এক শিশি বেনজিন
৩. এক শিশি আয়োডিন
৪. এক প্যাকেট সালফার নিলামাইড পাউডার
৫. একটি তুলার বান্ডিল
৬. ছোট একটি কাঁচি (সিজার)
৭. একটি চিমটা
৮. কিছু সেফটিপিন
৯, সার্জিক্যাল ব্লেড বা হোল্ডার
১০. জীবাণুমুক্ত কিছু গজ/কাপড়
১১. কিছু স্পিরিট
১২. কয়েকটি সার্জিক্যাল নিডেল
১৩. একটি নিডেল হোল্ডার
১৪. কয়েকটি আর্টারি ফরসেপ
১৫. কিছু ব্যথানাশক ট্যাবলেট
১৬. এক শিশি গ্লিসারিন
১৭. একটি ঔষধের ট্রে
১৮. একটি থার্মোমিটার
১৯. একটি স্টেথোসকোপ
২০. একটি ট্যাং ডিপ্রেসার
২১. কয়েকটি ত্রিকোণী ব্যান্ডেজ
২২. কয়েকটি রোলার ব্যান্ডেজ

২৩. একটি লিউকোপ্লাস্টার
২৪. একটি টুর্নিকেট
২৫. এক শিশি প্যারাফিন
২৬. এক টিউব বার্নোল মলম
২৭. এক শিশি দাঁতের ঔষধ
২৮. চোখ, কান ও নাকের ড্রপ
২৯. কিছু জীবাণুমুক্ত সিল্ক সুতা
৩০. একটি বিপি মেশিন
৩১. কিছু আইপ্যাড
৩২. কয়েকটি জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ
৩৩. একটি মাউথ প্যাগ
৩৪. একটি টর্চ লাইট
৩৫. একটি ব্যথানাশক স্প্রে
৩৬. কয়েকটি ৫% ডেক্সাট্রোজ স্যালাইন
৩৭. এক প্যাকেট গ্লুকোজ
৩৮. একটি পানির জার
৩৯. ছোটো একটি নোটবুক/কাগজ
৪০. একটি কলম

তৃতীয় অধ্যায়
স্পোর্টস মেডিসিন (Sports Medicine)

স্পোর্টস মেডিসিন

প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার ফলে খেলার জগতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। খেলার কৌশল রপ্ত করার সাথে সাথে খেলাধুলার চূড়ান্ত সাফল্যের জন্যে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেক বছর আগেই। ক্রীড়াবিজ্ঞান এরই একটি সফলতার রূপ। ক্রীড়া নৈপুণ্যতা বৃদ্ধির জন্যে যেসব তত্ত্বীয় বিষয় অধ্যয়ন প্রতি জরুরি স্পোর্টস মেডিসিন তারই একটি অংশ। ক্রীড়ানৈপুণ্যতা সেসব বিষয়ের উপর শরীরবৃত্তীয় নির্ভরশীল 'স্পোর্টস মেডিসিন' সেসব বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে। অর্থাৎ স্পোর্টস মেডিসিন হলো কোনো শারীরিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে শরীরবৃত্তীয় প্রভাব পর্যালোচনা, ইনজুরি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পূর্বের সতর্ক ব্যবস্থা এবং ইনজুরি পরবর্তী পুনর্বাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিদ্যা। স্পোর্টস মেডিসিন বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত। যথা- পূর্ণশক্তিতে শারীরিক কার্যকলাপ করার প্রস্তুতি, ক্রীড়াঘাত না হয় তার ব্যবস্থা (Prevention), আঘাত পেলে তার ব্যবস্থা (Cure) এবং আঘাত পরবর্তী পুনঃস্থাপন ব্যবস্থা। আমাদের একটি ভুল ধারণা আছে যে, স্পোর্টস মেডিসিন শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের ক্ষত এবং তার চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। মূলত স্পোর্টস মেডিসিন আসল উদ্দেশ্য হলো খেলোয়াড় গঠন।

স্পোর্টস মেডিসিন তিনটি সাধারণ অংশে বিভক্ত। যথা- ১. ক্লিনিক্যাল স্পোর্টস মেডিসিন ২. স্পোর্টস সার্জারি ৩. ফিজিওলজি অ্যান্ড এক্সারসাইজ। 'ক্লিনিক্যাল স্পোর্টস মেডিসিন' ক্রীড়াঘাতের Prevention, চিকিৎসা, উপযুক্ত ব্যায়ামের তালিকা এবং চূড়ান্ত শারীরিক নৈপুণ্যতার জন্যে খাদ্য ও পুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। 'স্পোর্টস সার্জারি' ক্রীড়াঘাতের দ্বারা সংগঠিত আঘাতের চিকিৎসার সাথে যুক্ত এবং 'এক্সারসাইজ ফিজিওলজি' শারীরিক চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রতিক্রিয়ার সাথে লিপ্ত। **স্পোর্টস মেডিসিনের সংজ্ঞা:**

According to Dr. D.R. Lamb –"Sports Medicine is concerned with the physical activities and scientific application of sports and sports In‡jvuries"

Dr. Aloke Ghosh has defined Sports Medicine as, "The application of Medical science and arts i.e. theory, practice and research, for sports on healthy and handicapped human beings to maintain positive health and to avoid physical damage connected with hypo-or hyper-activities, in order to devise ways and means to adequate effective, preventive, therapeutic and rehab measures as well as sensible and scientific improvements of performing capabilities in stage, in all age groups"

"Sports Medicine is defined as the observation of positive or negative effects in competition, training and physical activities. - Dr. V. N Smodlake

অর্থাৎ স্পোর্টস মেডিসিনের সংজ্ঞায় বলা যায়, স্পোর্টস মেডিসিন হলো কোনো ট্রেনিং, প্রতিযোগিতা বা শারীরিক কর্মকাণ্ডে দেহের ক্ষমতা, চাহিদা, ঘাটতি এবং চোট-আঘাতের প্রতিকার সংক্রান্ত গবেষণা।

স্পোর্টস মেডিসিনের ক্ষেত্র বা পরিধি:

ছোট্ট পরিসরে স্পোর্টস মেডিসিনের ক্ষেত্র বা পরিধি ব্যাখ্যা করা কঠিন। রোগবালাই দূর করার জন্যে যেমন ঔষধ প্রয়োজন হয় তেমনই খেলাধুলার নৈপুণ্যতার জন্যে রয়েছে স্পোর্টস মেডিসিন। একজন খেলোয়াড়ের জন্যে উপযুক্ত খেলা নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বা ক্যাম্প করে ভালো খেলোয়াড় খুঁজে বের করে তাদেরকে দিয়ে দল গঠন করলে হয়েত ভালো ফল পাওয়া যাবে কিন্তু তাদেরকে দিয়ে সব সময় ভালো ফল আশা করা যাবে না। কিন্তু যদি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সর্বপ্রথম

খেলোয়াড়দের উপযুক্ত খেলা নির্বাচন করে তাদেরকে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া যায় তবে তার কাছ থেকে নিশ্চিত ভাল ফল পাওয়া যাবে। অর্থাৎ খেলোয়াড় খুঁজে বের না করে খেলোয়াড় তৈরি করা হবে অনেক ফলপ্রসূ। স্পোর্টস মেডিসিন ঠিক এই যায়গাতে সঠিক পথের দিক নিদর্শন করে থাকে। এছাড়াও স্পোর্টস মেডিসিন বিভিন্ন খেলার উপযুক্ত শারীরিক সক্ষমতা ও এর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যায়াম নির্ধারণ করে। খেলোয়াড়দের খাদ্য-পুষ্টি, সুষম খাদ্যাভাস, চোট-আঘাত, চোট-আঘাতের পরর্বর্ত প্রতিকার ব্যবস্থা পূর্ণ শক্তিতে খেলায় ফিরে আসার জন্যে পুনর্বাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে স্পোর্টস মেডিসিন কাজ করে। যেমন-

ইনজুরি
ইনজুরি প্রতিরোধ
ইনজুরি পুনর্বাসন
ফিজিওথেরাপি
হেল্‌থ
ফিজিক্যাল ফিটনেস ও এক্সারসাইজ,
খাদ্য ও পুষ্টি
সুষম খাদ্য
ডোপিং
ম্যাসাজ
ফাস্ট এইড
প্রতিভা সনাক্তকরণ
মানবদেহের গঠন ও বিভাজন

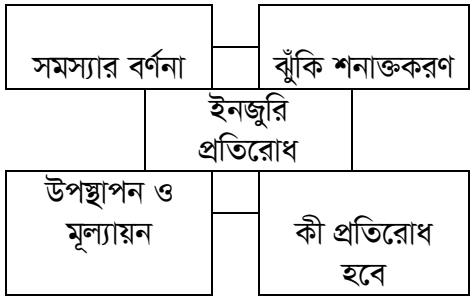

চতুর্থ অধ্যায়
স্পোর্টস ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট(Sports Injury management)

'খেলাধুলায় ইনজুরি' বাক্যটি অতি পরিচিত। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা শুরু হওয়ার অনেক আগেই এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ইনজুরির কারণে অনেক মেধাবী খেলোয়াড় অসময়ে হারিয়ে গেছে। গবেষণা ও তত্ত্বীয় বিচার-বিশ্লেষণ তথাপি শারীরিক শিক্ষার অনুশীলন এর মাত্রাকে অনেকাংশে কমিয়ে এনেছে। গবেষণায় দেখা যায় খেলাধুলার ভিন্নতার ওপরেও ইনজুরির ভিন্নতা নির্ভর করে। দীর্ঘ দৌড়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় পেশী টান পড়ে, ফুটবল খেলার সময় ব্লিস্টার বা পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা, ছিলে যাওয়া, ক্রিকেট খেলার সময় মাথায় ইনজুরি, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেনিস এলবো প্রভৃতি। সাধারণত মাসকুলোস্কেলেটাল বোন বা অস্থি, টিস্যু এবং স্পাইনাল কর্ডের উপর এর প্রভাব অতিমাত্রায় লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ ইনজুরি হলো কোনো শারীরিক ক্ষতি সাধন। খেলাধূলার আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাই খেলার মাঠে ক্রীড়া চিকিৎসকের থাকা উচিৎ অথবা কোচের ইনজুরি এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

স্পোর্টস ইনজুরির মৌলিক কারণ (Fundamental Causes of Sports Injuries):

বিভিন্ন কারণে স্পোর্টস ইনজুরি হতে পারে। সাধারণত অপরিমিত ওয়ার্মআপ এবং কন্ডিশনিং স্পোর্টস ইনজুরির প্রধান কারণ। দুর্বল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, দেহের কাঠামোতে ত্রুটি, দুর্বল পেশী, টেনডেন, লিগামেন্টস এবং সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকাও স্পোর্টস ইনজুরির অন্যতম কারণ। এ ছাড়াও স্পোর্টস ইনজুরির মৌলিক কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। অ্যানাটমিক্যাল ত্রুটি
২। ফিজিওলজিক্যাল ত্রুটি
৩। বায়োকেমিক্যাল ত্রুটি
৪। কাইনেসিওলজিক্যাল ত্রুটি
৫। নিউট্রিশনাল ত্রুটি
৬। ভুল ট্রেনিং পদ্ধতি
৭। ভুল কৌশল অসংশোধন
৮। মানসিক চাপ
৯। পরিমিত সুযোগ-সুবিধা
১০। খেলা পরিচালনার পক্ষপাতিত্ব

১। অ্যানাটমিক্যাল ত্রুটি

দেহের গঠন প্রকৃতির ওপরেও ইনজুরি অনেকটা নির্ভর করে । যেমন মেরুদণ্ডের ত্রুটিপূর্ণ বাঁক শারীরিক কর্মকাণ্ডের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ। তেমনই অস্থির গঠন, আয়তন এবং সন্ধিস্থলে ত্রুটির কারণেও ইনজুরি সংগঠিত হয়। অসমান পা, ফ্লাট ফুট (মসৃন পায়ের পাতা), বো-লেগ (পায়ের দুই হাঁটু অর্ধচন্দ্রের ন্যয় বাঁকা), নক লেগ (পায়ের দুই হাঁটু লেগে যাওয়া) এঙ্কল, হাঁটু এবং হিপ ইনজুরির জন্য দায়ি। দেহের গঠন-প্রকৃতির উপর খেলাধুলার ভিন্নতা নির্ভরশীল। শরীর গ্রহণ করতে পারে এরকম খেলা নির্বাচন করা খেলোয়াড়দের অতিব জরুরি বিষয়।

২। ফিজিওলজিক্যাল ত্রুটি

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করে। হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহ চালু থাকে, ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বাসকার্য সম্পাদিত হয়, পেশী সংকোচন চলনে সাহায্য করে, স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহ CNS (Central Nervous System) থেকে পেশীকোষে পৌঁছায় পেশীয় কার্য সম্পাদনের জন্যে। সুতরাং এর যে কোনো স্থান কোনো গোলযোগ দেখা দিলেই ইনজুরি সংগঠিত হতে পারে।

৩। বায়োকেমিক্যাল ত্রুটি

শরীরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যামিক্যাল রিয়াক্শন শারীরিক বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন হরমোন, এনজাইম এবং রাসায়নিক পদার্থ দেহের চলন, বৃদ্ধি, বিকাশ ও প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো শারীরিক কর্মকাণ্ডের সময় এর ঘাটতি দেখা দিলে ইনজুরি ঘটতে পারে।

৪। কাইনেসিওলজিক্যাল ত্রুটি

কাইনেসিওলজি হলো চলন বিজ্ঞান। অর্থাৎ কাইনেসিওলজি মুভমেন্টের সাথে জড়িত। অস্থি, পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয়ে সঞ্চালন সংঘটিত হয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট সঞ্চালনে পেশী ও অস্থি কীভাবে সম্পৃক্ত, এদের অবস্থান এবং স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত জ্ঞান কাইনেসিওলজিতে লিপিবদ্ধ। অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ মুভমেন্ট বা সঞ্চালন স্পোর্টস ইনজুরির কারণ।

৫। নিউট্রিশনাল ত্রুটি

খাদ্য ও পুষ্টি খেলোয়াড়ের শারীরিক যোগ্যতার প্রধান কারণ। মানুষের দৈহিক গঠন, কর্মক্ষমতা এবং কাজের ধরন খাদ্যের চাহিদা নির্ধারণ করে। এজন্যে সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা অত্যন্ত জরুরি। পরিমিত পুষ্টি না পেলে শরীর কোনো বিশেষ কাজে সাড়া দিতে পারে না। তাতে ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬। ভুল ট্রেনিং পদ্ধতি

ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো খেলোয়াড়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বুঝে পুরাতনের পাশাপাশি নতুন কিছু সংযোজন এবং এই নতুন সংযোজিত বিষয়টি খেলোয়াড়কে খাপ খাওয়ানো। অর্থাৎ একজন খেলোয়াড়কে কোনো বিশেষ বিষয়ে 'স্কিলফুল' করতে কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করা হলো প্রশিক্ষণ। যেমন একটি নির্দিষ্ট সময় সূচি, বিষয় উপযোগী ব্যায়াম নির্ধারণ, সঠিক ওয়ার্ম-আপ এবং এর লোড প্রয়োগের যৌক্তিকতা, বিষয় উপযোগী কন্ডিশনিং (ফিটনেস প্রোগ্রাম), টেকনিক্স, ট্যাকটিক্স অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নিয়োগ, সর্বোপরি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া হলো একটি কার্যকরী প্রশিক্ষণ। ভুল প্রশিক্ষণে ভালো অ্যাডাপটেশন হবে না ফলে ইনজুরির সম্ভাবনা দেখা দিবে। প্রয়োজনীয় রিকভারি/বিশ্রাম অ্যাডাপটেশনের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

৭। মানসিক চাপ

খেলাধুলায় মানসিক অস্বস্তি এবং প্রস্তুতি পারফরমেন্সের উপর অনেক প্রভাব পড়ে। মানসিক দিক দিয়ে শক্তিশালী খেলোয়াড় চূড়ান্ত পারফরমেন্স অর্জনে সক্ষম হবে। বিভিন্ন ধরনের মানসিক দুর্বলতা খেলাধুলার উপর প্রভাব ফেলে। এই দুর্বলতাগুলো হলো

ক. খেলার সময় মনোযোগের অভাব।
খ. প্রেষণার অভাব।
গ. দৃঢ়তার অভাব।

ঘ. উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা, আবেগ এবং স্বনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার চ্যুতি।

৮। পরিমিত সুযোগ-সুবিধা

সুরক্ষিত অনুশীলন এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ইনজুরির মাত্রা কমাতে সক্ষম। সমান এবং পরিচ্ছন্ন মাঠ, খেলার সাজ-সরঞ্জামাদি এবং পর্যাপ্ত ইনডোর সুবিধা ইনজুরিকে প্রভাবিত করে। দেহগঠনের জন্যে 'মাল্টি জিম', ক্রিকেট খেলার সময় হেলোমেট, প্যাড, হাতের গ্লাভস, অ্যাবডোমেনাল গার্ড, ফুটবল খেলার সময় সিনগার্ড, জিমন্যাস্টিকসে্ ম্যাট, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রভৃতি খেলোয়াড়ের ইনজুরি কমায় পাশাপাশি ভয়-ভীতি কাটিয়ে ভালো পারফরমেন্সের জন্যে সহায়ক।

৯। খেলা পরিচালনার পক্ষপাতিত্ব

খেলাধুলা পরিচালনার সময় অফিসিয়ালদের পক্ষপাতিত্ব খেলার উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে। এই পক্ষপাতিত্ব অনেক সময় খেলোয়াড়ের এগ্রেসনের বা ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে একদিকে যেমন সঠিক যোগ্যতা যাচাই হয় না অপরদিকে খেলোয়াড়দের প্রতিহিংসার দিকে ঠেলে দেয়। তাতে খেলার মাঠে সংঘর্ষ দেখা দেয়।

স্পোর্টস ইনজুরির সাধারণ কারণ (Common Causes of Sports Injuries):

অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম বা কোনো অঙ্গের অতিরিক্ত ব্যবহার সাধারণত ইনজুরির অন্যতম কারণ। এর কারণে বেশিরভাগ ইনজুরি দৌড়, সাঁতার, টেনিস, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলার সংগঠিত হয়। নিম্নে কিছু সাধারণ কারণ উল্লেখ করা হলো:

১। দ্রুত সঞ্চালিত খেলাধুলার হঠাৎ হঠাৎ থামতে হয়, শরীরে মোচড় দিতে হয় বা স্ট্রেইন এবং স্প্রেইনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২। ওয়ার্মিং আপ ও স্ট্রেচিং এর ওপর গুরুত্ব না দেয়া। খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সময় অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালন এবং অক্সিজেন সরবরাহ প্রয়োজন। যা ইনজুরি পরিহার এবং পারফরমেন্সের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। আবার ভালো পারফরমেন্সের জন্যে পেশীর নমনীয়তা প্রয়োজন। যার ফলে পেশী ক্র্যাম্প (Cramp) হতে পারে না।

৩। ইনজুরির আরেকটি সাধারণ কারণ হতে পারে জুতা। জুতা পায়ে ঠিকমতো না লাগলে এর ফলে পায়ে ফোস্কা, পিছ্লে পড়ে ফ্র্যাক্চার হতে পারে।

৪। সুরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রোটেক্শন ব্যবস্থা না থাকা । যথা- হেলোমেট, প্যাড, গার্ড প্রভৃতি।

৫। ত্রুটিপূর্ণ কৌশল (Wrong training method) সঠিক গ্রিপ না হলে হাতের কব্জি ব্যথা হতে পারে। আবার ফুটবলের লং চিপ শট্ করতে হাটুর পজিশন ঠিক রাখা এবং সঠিক জায়গায় লাথি দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় হিপজয়েন্ট ইনজুরি হতে পারে।

৬। পুষ্টির অভাব- শরীরকে চালনা করতে প্রয়োজন শক্তি। শরীরে এই শক্তি সঞ্চালিত হয় খাদ্যসার থেকে। একেক ধরনের খেলাধুলার জন্যে একেক ধরনের পুষ্টি দরকার। তাই খেলাধুলার তারতম্য অনুযায়ী সুষম খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। অন্যথায় শারীরিক দুর্বলতার কারণে ইনজুরি হতে পারে।

৭। ফ্যাটিগ এবং ওভারলোড অতিরিক্ত পুনরাবৃত্তি বা চাপ পেশীতে ফ্যাটিগ দেখা দেয় ফলে খেলোয়াড়রা ইনজুরির সম্মুখীন হয়।

স্পোর্টস ইনজুরির শ্রেণিবিভাগ (Classification of sports Injuries)
বিভিন্ন খেলাধুলায় বিভিন্ন ধরনের ইনজুরি পরিলক্ষিত হয়। ইনজুরি সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত । যথা দেহের অভ্যন্তরীণ ত্রুটির (Intrinsic causes) কারণে এবং দেহে বাহ্যিক আঘাত থেকে প্রাপ্ত (Extrinsic causes) ইনজুরি। নিম্নে স্পোর্টস ইনজুরিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হলো:

১. স্কিন ইনজুরি (Skin Injuries)
* ছিলে যাওয়া (Abration)
* ক্ষত বিশেষ (Laceration)
* থ্যাতলানো (Contusion)
* ফোস্কা (Blister)

২। পেশী ইনজুরি (Muscle Injuries)
- পেশী ছেঁড়া (Strain)
- পেশী টান (Muscle Pull)
- পেশী সংকোচন (Muscle Cramp)

৩। টেনডোন ইনজুরি (Tendon Injuries)
- আংশিক ছিঁড়ে যাওয়া (Partial Ruptures)
- সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যাওয়া (Complete Ruptures)
- টেনডোনের প্রদাহ (Pretendinitis)

৪। লিগামেন্টস্/সন্ধি ইনজুরি (Ligaments Injuries /Joint Injuries)
- স্প্রেইন (Sprain)
- আংশিক ছেঁড়া (Partial Ruptures)
- সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যাওয়া (Complete Ruptures)

৫। অস্থি ইনজুরি (Bone Injuries)
- অস্থি ভাঙ্গা (Bone Fracture)
- অস্থি ফাটা (Stress Fracture)

৬। মাথার ইনজুরি (Head Injuries)
- স্ক্যাল্প ক্ষত বিশেষ (Scalp Laceration)
- অস্থি ভাঙ্গা (Bone Fracture)

৭। সফ্ট টিস্যু ইনজুরি (Soft Tissue Injuries)
- পেশী ছেঁড়া (Muscular Tears)
- ফ্রাইব্রোসাইটস্ (Fibrosities)
- স্টিফনেস (Stiffness)

সাধারণ ইনজুরি (Common Injuries)
খেলাধুলায় সংঘটিত বিভিন্ন ইনজুরির মধ্যে স্ট্রেইন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্ট্রেইন এবং স্প্রেইন ছাড়াও খেলাধুলায় আরও কিছু সাধারণ ইনজুরি রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

স্ট্রেইন (Srrain) এবং স্প্রেইন (Sprain)

খেলাধুলার সময় যতরকম ইনজুরি হয় তার মধ্যে স্ট্রেইন এবং স্প্রেইন সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়। স্ট্রেইন প্রধানত পেশী এবং টেনডোনে সংঘটিত হয় এবং স্প্রেইন লিগামেন্টসে। সাধারণত পেশীর টান এবং টেনডোনের অতিরিক্ত স্ট্রেচিং স্ট্রেইনের অন্যতম কারণ। পেশীর দুর্বলতা, ফ্যাটিগ এবং অসম খেলার স্থান স্প্রেইনের জন্যে দায়ী। পেশীর উপর অতিরিক্ত চাপ ও টান এর ফলে পেশীর সূক্ষ্ম ফাইবার ছিঁড়ে যায়। সাধারণত পায়ের অ্যাঙ্কেল মচকে স্প্রেইন সংঘটিত হয়। এর ফলে লিগামেন্টস্ ছিঁড়ে যায়। স্ট্রেইন দুই ধরণের যথা- ১. ক্রনিক স্ট্রেইন ২. অ্যাকুউট স্ট্রেইন। অতিরিক্ত ব্যবহার হলো ক্রনিক এবং তীব্র চাপ হলো অ্যাকুউট।

স্ট্রেইন এর কারণ-

১. অতিরিক্ত ঘামের ফলে শরীরে পানি স্বল্পতা হলে।
২. পেশীতে ফ্যাটিগ দেখা গেলে।
৩. শারীরিক ভারসাম্যতার অভাব।
৪. শরীরে নমনীয়তার অভাব হলে।
৫. অপরিমিত ওয়ার্ম-আপ।
৬. অ্যাগোনিস্ট ও অ্যান্টাগোনিস্ট পেশীর সমন্বয়ের অভাব।
৭. ওভার লোড।
৮. শরীরে পুষ্টির অভাব।
৯. ট্রমা প্রভৃতি।

স্ট্রেইনের লক্ষণ-

১. খেলোয়াড়রা টিস্যু ছেঁড়ার শব্দ পেতে পারে।
২. স্ট্রেইনের সময় পেশী স্পাজম।
৩. দেহাঙ্গের কার্যক্ষমতা হ্রাস।
৪. তীব্র যন্ত্রণা।

স্পেইনের কারণ-

২. হঠাৎ পা মচ্‌কিয়ে যাওয়া।
৩. হঠাৎ ঝাঁকুনি ।
৪. অমনযোগে পায়ের ধাপ দেয়া।
৫. শরীরের ভারসাম্যহীনতা।
৬. জুতার সমস্যা প্রভৃতি।

স্পেইনের লক্ষণ-

১. ইনজুরির স্থানে তাৎক্ষণিক যন্ত্রণা।
২. ইনজুরির স্থান ফুলে যাওয়া।
৩. চলার সময় যন্ত্রণা বৃদ্ধি।

স্ট্রেইন (Srrain) এবং স্প্রেইন (Sprain) সাধারণ চিকিৎসা

৬. হ্যামারেজের তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ-

- RICE (R-Rest, I-Ice, C-Compression, E-Elevation) প্রয়োগ।
- ফোলা কমানোর জন্যে ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪০-৬০ মিনিট পর্যন্ত বরফ প্যাক দেয়া।
- তাৎক্ষণিক যন্ত্রণা কমানোর চেষ্টা।

- আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গ হৃৎপিণ্ডের উচ্চতা থেকে ওপরে তুলে ধরা।
- উৎক্ষিপ্ত রক্তের চাপ কমাতে প্রেসার ব্যান্ডেজ।

২। দ্বিতীয় দিন-
- আঘাত প্রাপ্তির দ্বিতীয় দিনেও যদি ফোলা থেকে যায় তবে প্রেসার ব্যান্ডেজ ও বরফ দেয়া যেতে পারে।
- যদি ফোলা না থকে তবে ইনফ্রা-রেড-ল্যাম্প, গরম ভেঁজা টাওয়াল অথবা জল-ঘুর্ণির মধ্যে স্নান।
- হালকা ম্যাসেজ (ইনজুরি স্থানের ওপরে এবং নিচে)।

৩। তৃতীয় দিন-
- এর পরও যদি ফুল থেকে যায় বরফ দেয়া উচিৎ নয়। ৪৮ ঘণ্টা পর বরফের পরিবের্ত উষ্ণ গরম সেক, গরম ভেঁজা টাওয়াল অথবা জল-ঘুর্ণির মধ্যে স্নান খুবই কার্যকরী। - ফুলা কমে যন্ত্রণা থাকলে শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি খুবই উপকারী।

৪। চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনেও তৃতীয় দিনের ন্যায় চিকিৎসা নেয়া যাবে কিন্তু যদি যন্ত্রণা না থাকে তাহলে সেই অঙ্গের শক্তি বাড়ানোর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করতে হবে।

বি. দ্র. ইনজুরির মাত্রা বেশি হলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নেয়া উচিৎ।

অন্যান্য সাধারণ ইনজুরি

- কনটিউশন (Contusion): বাহ্যিক আঘাতের কারণে পেশী থ্যাতলিয়ে যায়। এর কারণে চামড়ার উপরিভাগে কালসিয়া বা লালচে ভাব লক্ষ্য করা যায়।
- মাস্‌ল ক্র্যাম্প (Muscle Cramp) মাস্‌ল ক্র্যাম্প পেশীর এক প্রকার খিঁচুনি বা বেদনা। অনৈচ্ছিক ও বল প্রয়োকৃত পেশী সংকোচনের ফলে মাস্‌ল ক্র্যাম্প সংঘটিত হয়।

- মাস্‌ল ক্র্যাম্পের কারণ-

সাধারণত শারীরিক দুর্বলতা, নার্ভের অতিরিক্ত উত্তেজনা, অপরিচিত রক্ত সঞ্চালন, টাইট জুতা বা মুজা, ফ্যাটিগ, ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও পুরাতন ইনজুরি মাস্‌ল ক্র্যাম্প এর অন্যতম কারণ।

ফ্যাটিগ, ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও পুরাতন ইনজুরি মাস্‌ল ক্র্যাম্প এর অন্যতম কারণ।

- মাস্‌ল ক্র্যাম্পের চিকিৎসা
- পরিমিত ওয়ার্ম-আপ, পরিমিত তরল বা পানি সেবন, উপযোগি সরঞ্জামাদি, সঠিক ট্রেনিং পদ্ধতি ও সচেতনতা মাস্‌ল ক্র্যাম্পকে রোধ করতে পারে।
- মাস্‌ল পুল (Muscle Pull): বেদনাদায়ক পেশী সংকোচন হলো মাস্‌ল পুল। খেলাধুলার সময় অনেক ক্ষেত্রে পেশী সংকুচিত হয়ে শক্ত হয়ে যায়, এ অবস্থায় পেশীতে যন্ত্রণা অনুভব হয়। মাস্‌ল পুল সাধারণত ঐচ্ছিক পেশীতে (গ্যাসট্রোকনেমিয়াস ও হ্যামস্ট্রিং) বেশি সংঘটিত হয়।

মাস্‌ল পুলের কারণ-

- হঠাৎ করে বা তীব্র বল প্রয়োগ মাস্‌ল পুলের অন্যতম কারণ। এছাড়াও পেশীর ক্ষমতার বাহিরে পেশী স্ট্রেচ করলেও মাস্‌ল পুল হতে পারে। ওয়ার্ম-আপের ফলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং রক্তের মাধ্যমেই পেশীতে অক্সিজেন ও খাদ্যসার পৌঁছায়। যার ফলে পেশী স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে সক্ষম হয়। তাই অপরিমিত ওয়ার্ম-আপের কারণেও মাস্‌ল পুল হয়। কোনো শক্তিশালী পুলের কারণে পেশীর তন্ত্র ছিঁড়েও যেতে পারে।

মাস্‌ল পুলের লক্ষণ-

- আহত স্থানে যন্ত্রণা অনুভূত হয়।
- আহত স্থান সংকোচিত হয়ে ফুলে উঠে।
- গ্যাসট্রোকনেমিয়াস ও হ্যামস্ট্রিং মাসল পুল হলে আহত ব্যক্তি পা ধরে বসে পড়ে, পা সোজা করতে কষ্ট হয়।

মাস্‌ল পুলের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা-

মাস্‌ল পুল হয়ে প্রথমেই আহত ব্যক্তিকে আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে। এর পর পুল হওয়া মাস্‌ল স্ট্রেচ করে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারলে সংকুচিত মাস্‌ল ছেড়ে যাবে এর পর আহত স্থানটি হালকা ম্যাসাজ দিয়ে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করতে হবে তাহলে আহত ব্যক্তি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে। দীর্ঘক্ষণ পুল অবস্থায় থাকলে যন্ত্রণা অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রদাহ নাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

*** মাস্‌ল রাপচার (Muscle Rupture):**

এই ধরনের ইনজুরি পেশীতে লক্ষ্য করা যায়। ওভার স্ট্রেচ্ এবং ওভার লোডের কারণে মাস্‌ল রাপচার বেশি হয়। মূলত মাস্‌ল রাপচার হলো পেশীর তত্ত্ব ছিঁড়ে যাওয়া। মাস্‌ল রাপচারের কারণ:

* দুর্বল মাস্‌ল
* পুরানো ইনজুরি
* ফ্যাটিগ
* উত্তেজিত মাস্‌ল
* অনেকক্ষণ মাস্‌ল ঠাণ্ডার মধ্যে থাকা।

এছাড়াও অন্যান্য ইনজুরির মধ্যে নিম্নোক্ত ইনজুরিগুলো উল্লেখযোগ্য-

* চামড়ার ফোস্কা (Blister)
* চামড়া ছিলে যাওয়া (Abration)
* সন্ধিচ্যুতি (Dislocation)
* অস্থি ফেঁটে যাওয়া (Stress fracture)
* টেনডোনের প্রদাহ (Tendonitis)
* লিগামেন্টসের প্রদাহ (Ligaments)

পঞ্চম অধ্যায়
ইনজুরি প্রতিরোধ (INJURY PREVENTION)

"Prevention is better than cure" উল্লেখিত প্রবাদ বাক্যটি আমাদের অতি পরিচিত। বিশেষজ্ঞের মতে কোনো আহত ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হওয়ার আনন্দের চেয়ে অসুস্থ না হওয়ার প্রচেষ্টা অনেকগুণ শ্রেয়। তাই কোনো প্রতিযোগিতা বা ট্রেনিং এর সময় খেলোয়াড়দের যাতে ইনজুরি না হয় তার জন্যে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে খেলায় অংশগ্রহণ করা উচিৎ। খেলাধুলার বৈচিত্র্য অনুযায়ী তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ভিন্নতর যেমন ক্রিকেট খেলায় ব্যাট করার সময় প্যাড, গার্ড, গ্লাভস, হেলোমেট প্রভৃতি ব্যবহার করা হলো ইনজুরি প্রতিরোধক। ইনজুরি প্রতিরোধের জন্যে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাই ইনজুরি প্রতিষেধক (Preventive Measures)।

ইনজুরির প্রতিষেধক ব্যবস্থা:
যত দিন যাচ্ছে খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাত্রাও বেড়ে যাচ্ছে। তার সাথে বেড়ে যাচ্ছে স্পোর্টস ইনজুরির মাত্রা। স্পোর্টস ফিজিশিয়ান, স্পোর্টস ট্রেইনার, কোচ অর্গানাইজার সবাই মিলে স্পোর্টস ইনজুরির মাত্রা কমানোর জন্যে ইনজুরি প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করে। শারীরিক সক্ষমতা, প্রতিরোধ উপকরণ, উপযোগী খেলার সামগ্রী, খেলার পরিচ্ছন্ন মাঠ, আবহাওয়া প্রভৃতি ইনজুরি প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে পরিগণিত। নিম্নে ইনজুরির কতিপয় প্রতিরোধক (Preventive Measures) ব্যবস্থা উল্লেখ করা হলো-

১। ফিজিক্যাল ফিট্‌নেস: স্পোর্টস ইনজুরির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ফিজিক্যাল ফিটনেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেশীর শক্তি, নমনীয়তা, সহনশীলতা, গতি, সমন্বয়, ভারসাম্যতা এবং ক্ষিপ্রতা ফিট্‌নেসের মৌলিক উপাদান। তাই এই উপাদানগুলোর উন্নয়ন ইনজুরি রোধে অপরিহার্য। আবার শারীরিক যোগ্যতা পারফরমেন্সের ওপরেও সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই ভালো পারফরমেন্স ও ইনজুরির হাত থেকে রক্ষা পেতে শরীরকে খেলার ধরন ও মান অনুযায়ী তৈরি করা বাঞ্ছনীয়।

২। ওয়ার্ম-আপ: ওয়ার্ম-আপ স্পোর্টস ইনজুরি পরিহার করার জন্যে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এর ফলে পেশীর তাপমাত্রা বেড়ে যায়, হৃদস্পন্দনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতা বেড়ে যায়, নার্ভের মাধ্যমে পেশীকোষে তথ্য আদান-প্রদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং পেশীর কার্যক্ষমতা অনেকগুণ বেড়ে যায়। এই সব ক্রিয়া-কলাপ ব্যক্তিকে ইনজুরি থেকে রক্ষা করে।

৩। ইকুপমেন্টস: খেলার সময় ব্যবহৃত উপকরণগুলো অবশ্যই মানসম্পন্ন হতে হবে। নিজেকে প্রতিরক্ষার জন্যে প্রতিরোধক উপকরণ ব্যবহার করা উচিৎ। যেমন- ফুটবল খেলার সময় সিনগার্ড ব্যবহার, ক্রিকেট প্যাড, হেলোমেট ব্যবহার, বক্সিং এ গ্লাভস, হেড গার্ড ব্যবহার। তাই প্রয়োজনীয় ইকুপমেন্টস ব্যবহার ইনজুরি পরিহারের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।

৪। আবহাওয়া: পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, ঠাণ্ডা ও গরম আবহাওয়া ইনজুরির ওপর প্রভাব ফেলে। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অপরিমিত ওয়ার্ম-আপ এবং গরম আবহাওয়ায় অতিরিক্ত ওয়ার্ম-আপ ইনজুরির কারণ হতে পারে।

৫। ফ্যাটিগ: অতিরিক্ত লোড ও প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহের ঘাটতির কারণে পেশীতে ল্যাকটিক এসিড জমে পেশীকে অবসন্ন করে দেয়। পেশীর কর্মক্ষমতা হ্রাসের ফলে ব্যক্তি হঠাৎ পড়ে যেতে পারে। পেশীতে ক্র্যাম্প হতে পারে। তাই যেন ফ্যাটিগ না আসে তার জন্যে সজাগ থাকতে হবে।

৬। লোডের মাত্রা শনাক্ত: লোডের মাত্রা শনাক্তকরণ ইনজুরির মাত্রা কমাতে পারে।

৭। সঠিক ট্রেনিং পদ্ধতি: সঠিক ট্রেনিং পদ্ধতি ইনজুরি এড়াতে সাহায্য করে। ভুল ট্রেনিং পদ্ধতি ইনজুরির অন্যতম কারণ।

৮। এছাড়াও প্রয়োজনীয় ক্লথিং, উপযোগী ফুটওয়ার ও খেলাধুলার আইনকানুন মেনে চলা স্পোর্টস ইনজুরি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে বলা যায় খেলোয়াড়ের ইনজুরির মাত্রা কমাতে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ওয়ার্ম আপ

Warm-up

ওয়ার্ম-আপের লক্ষ্য:

সাধারণ ভাবে বলা হয় পেশীর উষ্ণতা বৃদ্ধিই হলো ওয়ার্ম-আপের প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃত অর্থে ওয়ার্ম-আপ শুধু পেশীর উষ্ণতা বৃদ্ধি নয়, কোনো ট্রেনিং বা প্রতিযোগিতার পূর্বে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতিই হলো ওয়ার্ম-আপের প্রকৃত লক্ষ্য।

ওয়াম-আপের সুবিধা:

* পেশীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে পেশী কাজ করার জন্যে স্বয়ংক্রিয় হয়।
* পেশীর গতি ও সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
* শরীরে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।
* পেশী কোষে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।
* দেহের সম্পৃক্ত তন্ত্রসমূহকে সক্রিয় করে।
* ট্রেনিং বা প্রতিযোগিতার জন্যে মানসিকভাবে খেলোয়াড়কে প্রস্তুত করে।
* ইনজুরি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ওয়ার্ম-আপের প্রকারভেদ:

ওয়ার্ম-আপ সবসময় দুই ভাগে ভাগ করে করা উচিত। একটি সাধারণ ও অপরটি বিশেষ ওয়ার্ম-আপ। সাধারণ ওয়ার্ম-আপ প্রতিটি ঐচ্ছিক পেশীর উষ্ণতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধি এবং সন্ধিস্থলের মবিলিটি ও সংকোচন-প্রসারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আর বিশেষ ওয়ার্ম-আপ নির্দিষ্ট খেলার উপযোগী বিশেষ ব্যায়াম। এটি খেলার ধরন ও গতির সাথে শরীরকে খাপ খাওয়ানোর জন্যে বিশেষ ব্যয়াম।

ওয়ার্ম-আপের ধাপ: কোনো প্রতিযোগিতা বা ট্রেনিং এর পূর্বে ওয়ার্ম-আপ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই কতগুলো বিশেষ পদ্ধতি মেনে ওয়ার্ম-আপ করাও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ধাপে ধাপে বা পর্যায়ক্রমে ওয়ার্ম-আপ সম্পন্ন করতে হয়। নিম্নে ওয়ার্ম-আপের একটি ছক উদাহরণ হিসাবে দেখানো হলো ঃ

ক্রমিক নং	ব্যায়ামের ধরণ	লোডের মাত্রা (%) ও ধরন	উদ্দেশ্য
১।	হালকা স্ট্রেচিং	বৃহৎ পেশীর ক্রিয়া পরিহার করে হালকা স্ট্রেচিং। (২ মিনিট)	রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি। ফলে পেশীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
২।	জগিং	সর্বোচ্চ ক্ষমতার ২০%-৩০% গতি (৫মিনিট)	শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি এবং হিপ জয়েন্টের মবিলিটি বৃদ্ধি।
৩।	স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ	বৃহৎ পেশীর স্ট্রেচিং (৩ মিনিট)	পেশীর নমনীয়তা বৃদ্ধি
৪।	ডাইনামিক এক্সারসাইজ	গতির সাথে ব্যায়াম (৩ মিনিট)	পেশীর শক্তভাব দূর করা এবং সংকোচন প্রসারণের গতি বৃদ্ধি।
৫।	স্প্রিন্টিং	সর্বোচচ ক্ষমতার ৭০%-৮০% গতি। (২ মিনিট)	শরীরকে পুরোপুরী সক্রিয় করা।
বি. দ্র. ওয়ার্ম-আপ ব্যক্তির শারীরিক ক্ষমতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। তাই এর মাত্রা ও সময় কম বা বেশি হতে পারে। তবে কোনোক্রমেই ২০%-৩০% এর বেশি শক্তি খরচ বাঞ্ছনীয় নয়।			

ওয়ার্ম-আপের সময় মনে রাখতে হবে শক্তি সঞ্চিত রেখে ওয়ার্ম-আপ করতে হবে। কোনোমতেই ২০-৩০ শতাংশের বেশি শক্তি খরচ করা যাবে না। অর্থাৎ এমন ধরনের ব্যায়াম নির্বাচন করতে হবে যাতে পূর্ণ ওয়ার্ম-আপ হবে আবার শক্তিও সঞ্চিত থাকবে। খেলা শুরুর পূর্বে ওয়ার্ম-আপ প্রয়োজন তেমনই খেলা শেষে ওয়ার্ম-ডাউন বা কুলিং-ডাউন বা Limbering down বিশেষ প্রয়োজন।

কুল ডাউন

Cooling Down

ওয়ার্ম-আপ যেমন প্রয়োজন তেমনই শরীরকে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রয়োজন ওয়ার্ম-ডাউন। লিম্বারিং ডাউন হলো কতিপয় হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। কোনো ব্যায়াম বা প্রতিযোগিতা অথবা ট্রেনিং এর সময় শরীরে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে দ্রুত পরিত্যাগ করা অতীব জরুরি। ৫-১০ মিনিট হালকা ব্যায়াম এবং হাটা বা হালকা জগিং খেলার পরে জমে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড দ্রুত অপসারণ করে। ওয়ার্ম-ডাউনের জন্যে স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ করা উচিৎ ডাইনামিক এক্সারসাইজ করা উচিৎ নয়।

কুল-ডাউনের সুবিধা ঃ

* ল্যাকটিক এসিড ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে নিষ্কাশন করে।
* হৃদস্পন্দনের হার স্বাভাবিক করে।
* পেশী রিল্যাক্স করে।
* শরীরের উষ্ণতা কমিয়ে স্বাভাবিক করে।
* পরবর্তী কাজের জন্যে শরীরকে প্রস্তুত করে।

অবসাদ/ফ্যাটিগ

According to Karpovich, ''Fatigure amy be defined as decrease in working capacity caused by worked itself'' অর্থাৎ কোনো কার্যের দ্বারা কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া হচ্ছে ফ্যাটিগ বা অবসাদ। সাধারণভাবে বলা যায় যে, দীর্ঘক্ষণ কোনো কাজে লিপ্ত থাকলে বা শারীরিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত

থাকলে মস্তিষ্ক, মাংসপেশী ও স্নায়ুর কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে, এইরূপ অবস্থাকে ফ্যাটিগ বলে। ফ্যাটিগ অবস্থায় পেশীসমূহ উদ্দীপনায় সারা দিতে অপারগ হয়। ফলে শরীরের বিভিন্ন অংগ সঞ্চালন ব্যাহত হয়। ফ্যাটিগ দুই প্রকার । যথা -

১। শারীরিক অবসাদ (Physical Fatigure)
২। মানসিক অবসাদ (Mental Fatigure)

১। শারীরিক অবসাদ (Physical Fatigue):

দীর্ঘক্ষণ কাজ করার ফলে শরীরে অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে যায়। কাজের মাত্রা যত বাড়তে থাকে এই চাহিদা মাত্রাও ততটাই বাড়তে থাকে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় খাদ্যসার বা অক্সিজেন সরবরাহ কম হয় তবে পেশী কোষে ল্যাক্টিক এসিডের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং এক সময় পেশী তার কার্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পেশীর এইরূপ অবস্থাকে শারীরিক অবসাদ বা Physical Fatigue বলে।

২। মানসিক অবসাদ:

কাজের চাপ বা কাজের তীব্রতা যদি বেশি হয় তাহলে ওভার লোড হয়ে যায়। ওভার লোড হলে খেলোয়াড়ের শারীরিক ক্ষমতা যেমন হ্রাস পায় তেমনই মানসিক ক্ষমতাও হ্রাস পায়। কাজের মধ্যে মনোযোগ কমে যায়। বারবার ভুল হতে থাকে। এতে খেলোয়াড়ের মনোবল ভেঙে যায়। অর্থাৎ ওভার লোড কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলে যা খেলোয়াড়কে মানসিক দিক থেকে দুর্বল করে তোলে। খেলোয়াড়ের এই অবস্থাকে মানসিক অবসাদ বলে।

ফ্যাটিগের কারণ:

১। পেশীতে ল্যাকটিক এসিড ও কার্বনডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে গেলে।
২। পেশী ক্লান্ত হলে।
৩। ঠাণ্ডা ও গরম আবহাওয়া বিবেচনায় না আনলে।
৪। দীর্ঘক্ষণ কাজ করলে।
৫। বিশুদ্ধ বায়ুর ঘাটতি হলে।
৬। ফ্রাস্টেশন ও মনোবল হ্রাস পেলে।

ফ্যাটিগের লক্ষণ:

১। কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।
২। মনোযোগ হ্রাস পায়।
৩। ঘুম বিঘ্নিত হয় ও দুঃস্বপ্ন দেখা দেয়।
৪। পেশীতে যন্ত্রণা অনুভূত হয়।
৫। ভুল-ত্রুটি বেশি হয়।

ফ্যাটিগ দূরীকরণের উপায়:

১। ফ্যাটিগ অপসারণ করতে পর্যাপ্ত ঘুম প্রয়োজন।
২। অনুশীলনের ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিৎ ।
৩। প্রেষণার মাধ্যমে ফ্যাটিগ দূরীকরণ।
৪। ফ্রেশ আবহাওয়াতে অনুশীলন।
৫। দ্রুত ল্যাকটিক অ্যাসিড ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ দূর করার জন্য ওয়ার্ম-ডাউন এক্সারসাইজ করা।
৬। একঘেয়ে ভাব দূর করা।
৭। শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৮। মনোবল দৃঢ় করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইনজুরি পুনর্বাসন (INJURY REHABILITATION)

পুনর্বাসন (Rehabilitation)

Rehabilitation- এর আভিধানিক অর্থ হলো পুনর্বাসন। অর্থাৎ আহত ব্যক্তিকে খেলায় ফিরিয়ে আনার জন্যে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্হার উন্নতি ঘটিয়ে পূর্বের অবস্হায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্হা হলো রিহ্যাবিলিটেশন বা ইনজুরি পুনর্বাসন। কোনো খেলোয়াড় আহত হওয়ার পর দীর্ঘদিন মাঠের বহিরে থাকায় তার যেসব শীরিক কর্ম ক্ষমতা হ্রাস পায় তা পুনরুদ্ধারই পুণর্বাসনের প্রধান লক্ষ্য। আহত ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ আক্তারের নিকট পাঠিয়ে তার পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা করে তারপর তাকে এক্সারসাইজ ও বিভিন্ন ধরনের থেরাপির মাধ্যমে পূর্বের অবস্হায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হলো পুনর্বাসন। একজন স্পোর্টস ট্রেইনার এই দায়িত্ব পালন করে। দলের ফিজিও আহত খেলোয়াড়ের ইনজুরি ও তার চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে এবং কোচ খেলার পারফরমেন্স, কৌশল, স্ট্যাটেজি, ফরমেশন, দক্ষতা ও টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে কাজ করে।

শারীরিক সক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্যে পেশীর বল, গতি, সহনশীলতা ও মননীয়তা বৃদ্ধি অতীব জরুরি। সন্ধিস্থলের কৌণিক দূরত্ব বৃদ্ধি, ২০-৩০ মিনিট অবিরাম দৌড় দ্রুত গতিতে দৌড় এসবই সক্ষমতার প্রধান লক্ষণ, এর পাশাপাশি যন্ত্রণা ও ফুলে যাওয়া রোধ পুনর্বাসনের(Rehabilitation) লক্ষ্য।

পুনর্বাসনের লক্ষ্য:

পুণর্বাসনের প্রধান লক্ষ্য হলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদে এবং সুস্থ ও সবল ভাবে খেলোয়াড়কে খেলায় ফিরিয়ে আনা। পুনর্বাসনের লক্ষ্য দুই প্রকার যথা-

১. স্বল্পকালীন লক্ষ্য

২. দীর্ঘকালীন লক্ষ্য।

১। স্বল্পকালীন লক্ষ্য:

ক) ব্যথা ও ফুলে যাওয়া রোধ।

খ) সন্ধি স্থলের কৌণিক দূরত্ব বৃদ্ধি।

গ) পেশীর শক্তি, সহনশীলতা ও ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি।

ঘ) নিউরোমাসকুলার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ।

ঙ) হৃদস্পন্দন ক্রিয়ার ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখা

চ) সঠিক কর্মকাণ্ডের পরিচালনা।

২। দীর্ঘকালীন লক্ষ্য: পুনর্বাসনের দীর্ঘকালীন লক্ষ্য হলো খেলোয়াড়কে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদের সাথে প্রতিযোগিতা বা প্র্যাকটিসে ফিরিয়ে আনা। আহত খেলোয়াড়কে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট পাঠিয়ে তার সুস্থ হওয়ার পর টিম ফিজিশিয়ানের হাত ঘুরে প্রথমে স্পোর্টস ট্রেনারের নিকট আসে। ট্রেনারই মূলত সেই খেলোয়াড়ের পুনর্বাসনের প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। পুনর্বাসন শেষে ট্রেনার উক্ত খেলোয়াড়কে কোচের নিকট প্রেরণ করে। এর পর কোচ তার রিকভারি যাচাই করে প্র্যাকটিস বা প্রতিযোগিতায় ফিরিয় আনে, অন্যথায় কোচ তাকে আবারও পুনর্বাসনের জন্যে ফেরত পাঠায়।

পূনর্বাসের ধাপ

খেলোয়াড় ইনজুরি কাটিয়ে ফিরে আসার পর সাথে সাথে তাকে অনুশীলনে/খেলায় অংশগ্রহণের জন্যে পাঠানো উচিৎ নয়। কারণ দীর্ঘদিন খেলার বাহিরে থাকার কারণে তার যে সব শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা সাধিত হয়েছে প্রথমে তার পুনর্বাসন প্রয়োজন। অর্থাৎ আঘাতপ্রাপ্ত খেলোয়াড়কে ব্যায়াম, থেরাপির ও অনুশীলনের মাধ্যমে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পর তাকে ট্রেনিং বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো উচিৎ। এই পুনর্বাসনের কতগুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। ধাপে ধাপে পুনর্বাসন ব্যবস্হা করা হয়। নিম্নে পুনর্বাসনের ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো:

					Ready to play
				Competitive Exercise	6
			Training Basic	5	
		Strenthening	4		
	Stretching	3			
RICE	2				
1					

RICE : (R-Rest, I-Ice, C-Compression, E-Elevation), পুনর্বাসনের প্রথম ধাপ হলো RICE খেলোয়াড় আহত হওয়ার পর প্রথমেই তাকে খেলা থেকে বিরত রাখতে হবে। তাপর আঘাতপ্রাপ্ত স্হানে বরফপ্যাক লাগাতে হবে। এরপর ফুলে যাওয়া বা রক্তপাত বন্ধের জন্যে প্রেসার ব্যান্ডেজ দেয়া যেতে পারে। অথবা ফোলা কমানোর জন্যে আহত অঙ্গটি হৃদপিণ্ডের লেভেল লেকে উঁচুতে তুলে রাখতে হবে।

Stretching: প্রকৃত অর্থে পুনর্বাসন শুরু হয় স্ট্রেচিং দিয়ে। কারণ দীর্ঘদিন বিশ্রামে থাকায় পেশী, সন্ধি, টেনডোন ও লিগামেন্টেসের নমনীয়তা কমে যায়। তাই কোনো ব্যায়াম বা ট্রেনিং শুরু করার পূর্বে ঐ সব অঙ্গের নমনীয়তা বৃদ্ধি জরুরি।

Strenthening: স্ট্রেচিং এর পর পণর্বাসনের পরবর্তি ধাপ হলো শক্তি ও শরীরের ক্ষীপ্রতা বৃদ্ধি। শক্তি ও ক্ষীপ্রতা হলো সকল কর্মের বাহক। তাই সেই সকল ব্যায়ম করা উচিৎ যেসব ব্যায়াম দ্বারা শরীরের শক্তি ও ক্ষীপ্রতা, বৃদ্ধি পায়। এরপর ধীরে ধীরে গতি, দম ও সমন্বয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

Training Basic: বেসিক ট্রেনিং-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট কৌশলের সাথে শরীরকে খাপ খাওয়ানো। দীর্ঘ বিশ্রামের পর অনুশীলনের মাধ্যমে কৌশলগুলো আয়ত্বে আনা। অর্থাৎ প্রাথমিক দক্ষতা বৃদ্ধিই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

Competitive Exercise: প্রতিযোগিতামূলক ব্যায়াম পরীক্ষামূলক ছোটো ছোটো প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছুই না। আহত ব্যক্তির মনে একটি ভয় আচ্ছন্ন করে রাখে। পুনর্বাসনের পর সে যখন খেলায় ফিরে আসে সে তার স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে না তাই তাকে নিজেদের মধ্যে দল তৈরি করে বা অন্য দলের

সাথে চ্যারিটি ম্যাচ বা প্র্যাকটিস ম্যাচ দিয়ে আহত খেলোয়াড়ের মনের শক্তি বাড়ানো হয়। এতে সে তার স্বাভাবিক খেলার ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

Ready to play: পুনর্বাসনের পর আহত খেলোয়াড় ট্রেনিং বা প্রতিযোগিতার জন্যে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত কিনা তা যাচাই করা উচিৎ। পুণর্বাসনের প্রধান দায়িত্ব পালন করে স্পোর্টস ট্রেইনার। স্পোর্টস ট্রেইনারের পর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে কাজ করে কোচ। কোচ আহত খেলোয়াড় সম্পূর্ণ সুস্থ কিনা তা যাচাই-এর জন্যে পরীক্ষা করবে।

কতিপয় বিশেষ ইনজুরি পুনর্বাসন

গোড়ালি (Ankle)

বেশির ভাগ গোড়ালি (Ankle) ইনজুরি সংঘটিত হয় বাস্কেটবল, ভলিবল ও হপ-স্টেপ-জাম্পে। এছাড়াও অসম মাঠে খেলাধুলা করলেও গোড়ালি ইনজুরি হতে পারে। বেশির ভাগ গোড়ালি ইনজুরি পা মচকানো থেকে হয়ে থাকে। গোড়ালি পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যন্ত্রণা হ্রাস, ফোলা কমানো, সন্ধিস্থলের মবিলিটি বৃদ্ধি, সন্ধিস্থলের শক্তি বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতে যেন আবারও ইনজুরি না হয় তার ব্যবস্থা করা উচিৎ। ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে এই পুণর্বাসন করা হয়। গোড়ালি ইনজুরির পুনর্বাসন ব্যবস্থা:

১। যন্ত্রণা ও ফুলে যাওয়া রোধ:

পুনর্বাসনের প্রথম ধাপ হলো যন্ত্রণা ও ফুলে যাওয়া রোধ করা। এখানে প্রথমেই PRICE (Protection, Rest, Ice Compression and Elevation) অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ আহত ব্যক্তিকে প্রথমেই বিশ্রাম দিতে হবে। তার পর ইনজরির স্থানে বরফপ্যাক নিতে হবে। সরাসরি বরফ লাগানো উচিৎ নয়। প্রথম দিন এক ঘণ্টা পর পর ১৫ মিনিট করে বরফ দেয়া, এর পর দুই-তিন দিন দিনে তিন-চার বার দেয়া যেতে পারে। কিন্তু সরাসরি বরফ লাগানো যাবে না। এতে স্নায়ুর উপর প্রভাব পড়তে পারে এবং ত্বকের প্রদাহ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে বরফপ্যাক, টাওয়াল ও অন্যকিছু ব্যবহার করা উচিৎ। ফুলা কমানোর জন্যে প্রেসার ব্যাণ্ডেজ এবং আহত অঙ্গটি হৃদপিণ্ডের স্তর থেকে উঁচুতে তুলে রাখা উত্তম। এর পরও যদি যন্ত্রণা না কমে তাহলে গরম পানি এবং ঠাণ্ডা পানিতে থেরাপি করতে হবে। এখানে ৩ মিনিট গরম পানিতে এবং ৫ মিনিট ঠাণ্ডা পানিতে পা ডুবিয়ে রাখতে হবে। এভাবে ২০ মিনিট পর্যন্ত গরম ও ঠাণ্ডা পানিতে কয়েকদিন পা ডোবালে যন্ত্রণা কমবে।

২। সন্ধিস্থলের মবিলিটি ও নমনীয়তা বৃদ্ধি:

যন্ত্রণা এবং ফোলা কমার পর মবিলিটি বৃদ্ধির ব্যায়াম করা হয়। তাতে আহত স্থানটি স্বল্প স্ট্রেস নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করবে। প্রথম ২-৭ দিন গোড়ালি ওপরে এবং নিচে সঞ্চালন করতে হবে। পায়ের পাতাকে ওপরে এবং নিচে ওঠানো ও নামানোকে বলা হয় Dorsiflexion এবং Plantarflesion । এই সময় ভেতরে (Inversion) এবং বাহিরে (Eversion) ঘোরানো উচিৎ নয়। কয়েকদিন এই ব্যায়াম ৩০ বার করে ২ সেট করা যেতে পারে। এর পর ব্যথা কমলে Inversion, Eversion ও Circumdation movement মবিলিটি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। প্রাথমিক অবস্হায় পরবর্তি কয়েকদিন Inversion এবং Eversion করতে হবে। প্রতিবার ৬ সেকেন্ড ধরে রাখতে হবে। এভাবে ৫-৬ বার করা যেতে পারে। এর পর আহত স্থানের পেশী, অস্হি, লিগামেন্টস ও টেনডোনের উদ্দীপনা (Sense) বৃদ্ধির জন্যে Wobble Board Exercises করা যেতে পারে। এখানে ব্যালান্সবিমের ওপর পা রেখে আলতোভাবে সামনে-পেছনে, দুই পাশ ঘোড়াতে হবে। এতে পায়ের আহত স্থানের উদ্দীপনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

৩। সন্ধিস্হলের শক্তি বৃদ্ধি:
সন্ধিস্থলের মবিলিটি বৃদ্ধির পর শক্তি বৃদ্ধি অতি গুরুত্বপূর্ণ। গোড়ালি শক্তি বৃদ্ধির জন্যে প্রথমে টো-এর উপর ভর করে পায়ের গোড়ালি উঁচু করে ১০ সেকেণ্ড ধরে রাখতে হবে, এর পর গোড়ালি নামিয়ে ১০ সেকেন্ড, এভাবে ১০ বার করে ৩ সেট করতে হবে। Eversion এবং Inversion exercise একইভাবে করতে হবে। Weight নিয়ে ক্রমান্বয়ে Dorsiflexion, Plantar flexion, Eversion এবং Inversion movement করতে হবে। প্রতি ক্ষেত্রেই ১০ সেকেন্ড করে ১০ বার ধরে রাখতে হবে । ২-৩ সেট করা বাঞ্ছনীয়।

৪। পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতায় ফিরে আসা:
রিহ্যাবিলিটেশনের পর কোনো ট্রেনিং বা প্রতিযোগিতায় ফিরে আসার পূর্বে আহত খেলোয়াড়ের পরিপূর্ণ ভাবে পুনর্বাসন হয়েছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করা উচিৎ। অর্থাৎ ট্রেইনার যখন কোচের কাছে পুণর্বাসিত খেলোয়াড়কে প্রেরণ করবে তখন কোচের উচিৎ পুনরায় পরীক্ষা করে তাকে খেলায় ফিরিয়ে আনা। অন্যথায় আবার ইনজুরি হতে পারে।

Shoulder Injury পুনর্বাসনের ব্যায়াম: কাধের রিহ্যাবিলিটেশন বা পুনর্বাসন দুই অংশে করা হয়েছে।

প্রথম অংশ
১। পেন্ডুলাম এক্সারসাইজ: প্রথমে সামনে একটু ঝুঁকে একটি চেয়ারের ওপর এক হাত ভর দিয়ে অন্য হাতটি সামনের দিকে ঝুঁলিয়ে রাখতে হবে। এর পর ঝুলন্ত হাতটি ১০ বার পেন্ডুলামের মতো ডানে-বামে এবং সামনে-পেছনে দোলাতে হবে।

২। আইসোমেট্রিক সোল্ডার এক্সারসাইজ: একটি দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আহত হাতটি সোজা রেখে সামনের দেয়ালের নিচের দিকে চাপ দিতে হবে। এর পর পিছন ফিরে হাতটি পিছনের দিকে দেয়ালে চেপে ধরতে হবে। অর্থাৎ ১০ সেকেণ্ড করে ১০ বার সামনে, পিছনে ও পাশে আহত হাতটি সোজা রেখে দেয়ালের সাথে চাপ দিতে হবে।

৩। স্ক্যাপুলার সংকোচন: শরীরে দুই পাশে দুই হাত ভাঁজ কওে সোজা হয়ে বসতে হবে। এর পর পিছনের দিকে দুই স্ক্যাপুলা কাছে আনার চেষ্টা করতে হবে আবার স্বাভাবিক অবস্হায় আনতে হবে। এই ভাবে ১০ সেকেন্ড ধরে রাখতে হবে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে হবে ১০ বার করা বাঞ্ছনীয়।
৪। সুপিরিও ক্যাপস্যুল স্ট্রেচ: একটি টাওয়াল রোল করে আহত কাঁধের বগলের নিচে চেপে ধরতে হবে। তারপর হাতটি ভাঁজ করে বুকের সাথে রাখতে হবে। এরপর আহত কাঁধটি অন্য কাঁধের কাছে আনার চেষ্টা করতে হবে। যতদূর সম্ভব কাছাকাছি এনে ১০ সেকেন্ড হোল্ড করতে হবে, এইভাবে ১০ বার করতে হবে।

শেষ অংশ
১। নেক (Neck) প্রেস: একটি শক্ত বিছানায় বালিশ ছাড়া চিৎ হয়ে শুতে হবে। তারপর থুতনি নিচের দিকে নামিয়ে ঘাড়ের পিছনের দিক বিছানার সাথে চেপে ধরতে হবে। প্রতিবার ১০ সেকেণ্ড হোল্ড করে ১০ বার করতে হবে।

২। ডাইগোনাল প্লেন এক্সারসাইজ: হালকা ওজন বা ব্যান্ড নিয়ে হাত উপরে তুলে আড়াআড়িভাবে ডান দিক থেকে বাম দিকে অথবা বাম দিক থেকে ডান দিকে ওঠা-নামা করতে হবে। ১০ বার করে ২-৩ সেট করতে হবে।

৩। পুল ডাউন এক্সারসাইজ: একটি ওজন বা ব্যান্ড নিয়ে হাত উপরে তুলে কাধের দুই পাশে ওঠা-নামা করতে হবে। এটিকে বলা হয় ল্যাটারাল মুভমেন্ট। ১০ বার করে ২-৩ সেট করতে হবে।

৪। সোল্ডার পুল এক্সারসাইজ: দুই হাত দুই পাশে সোজা রেখে দুই কাঁধ উপরের দিকে চেড়ে তুলতে হবে। তাপর কিছুক্ষণ ধরে রেখে আবার নিচে নামাতে হবে। এইভাবে ১০ বার করে ২-৩ সেট করতে হবে।

৫। চেস্ট্ পাস: একটি মেডিসিন বল নিয়ে আরেকজনের সাহায্য নিয়ে চেস্ট্ পাস করতে হবে। অর্থাৎ একটি মেডিসিন বল চেস্টে রেখে একই লেভেলে অপর একজনের দিকে ছুড়তে হবে এবং অপরজন পাস দিলে তা আবার ধরতে হবে। এই আবে ১০ বার করে ২-৩ সেট করতে হবে।

৬। হ্যান্ড ওয়াকিং ঃ দুই হাতের তালু সমানভাবে ফ্লোরের ওপর সোজা রেখে একই উচ্চতায় পায়ের নিচে একটি মুভেবল্ চেয়ার অথবা মেডিসিন বল পায়ের নিচে নিয়ে সামনে-পেছনে ও দুই পাশে হাঁটতে হবে। অর্থাৎ হাতের সাহায্যে মেঝের উপর- ৩০-৪০ সেকেন্ড হাঁটতে হবে।

হাঁটু (Knee)

হাঁটুর ইনজুরি পুণর্বাসনের সময় মনে রাখতে হবে তা যেন ধীরে ধীরে এবং আরামদায়ক হয়। হাঁটুর ইনজুরি সাধারণ লিগামেন্ট, সফ্ট টিস্যু, কাটিলেজ এবং ডিজ্লোকেশন হতে পারে। ইনজুরির মাত্রা ও ধরণ অনুযায়ী চিকিৎসা হওয়া উচিৎ। পুনর্বাসনের পূর্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া ভাল।
হাঁটুর পুনর্বাসনের জন্যে স্ট্রেচিং এবং স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ করা উচিৎ। প্রতিটি এক্সারসাইজ ১০ সেকেন্ড হোল্ড করে ১০ বার করে ২-৩ সেট করতে হবে। নিম্নে এক্সারসাইজগুলো দেখানো হলো:

কোমর ব্যাথা (Back Pain)

পৃষ্ঠ বেদনা আমাদের একটি নিত্য দিনের ব্যপার। অভার-ইউজ, ক্যালসিয়ামের ঘাটতি, স্কেলেটালমাসল্ এর দুর্বলতা, লো-বোন ডেনসিটি Back Pain এর অন্যতম কারণ। এছাড়াও পেশীর দুর্বলতার কারণে মেরুদণ্ডের অস্হিগুলোর মধ্যে দুরত্ব কমে যায় ফলে যন্ত্রণা অনুভুত হয়। তাই আহত স্হানে পেশীর শক্তি বৃদ্ধি করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। নিম্নে Back Pain হ্রাসের কতিপয় ব্যায়াম দেখানো হলো ঃ

ফিজিওথেরাপি (Physiotherapy)

রোগ বা ব্যথা নিরাময়ের একটি পদ্ধতি হলো থেরাপি। বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী ও তীব্র নিরাময়ের অভিনব পন্থা। সাধারণত পেশী, সন্ধি, লিগামেন্টেসের ব্যথা নিরাময়ে থেরাপি খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ফিজিওথেরাপি শব্দটা প্রথম ব্যবহৃত হয় বৃটেনে ১৯৪৩ সালে। এটি হলো জ্ঞানের একটি ধারা যা তাপ, আলো, রশ্মি, পানি ও ম্যাসাজের মাধ্যমে ইনজুরির চিকিৎসা অথবা ইনজুরির রিহ্যাবিলিটেশনে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ফিজিওথেরাপি হলো শারীরিক চিকিৎসার একটি কলা বা বিজ্ঞান যা থেরাপিউটিক মডালিটির তাৎক্ষণিক ও পুরোনো ব্যথা নিরাময় করে।

ফিজিওথেরাপির লক্ষ্য ঃ

১। ব্যথা নিরাময়।

২। পেশী এবং স্নায়ুর ওপর ক্রিয়া করে দেহাঙ্গ সঞ্চালনে সাহায্য করা।

৩। স্নায়ুর ক্রিয়া সচল রাখা।

৪। পেশীর নমনীয়তা ও শক্তি বৃদ্ধি করা।

৫। সন্ধিস্থলের মবিলিটি বাড়ানো।

৬। রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করা।

৭। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস বজায় রাখা।

৮। শরীর থেকে দূষিত পদার্থ শরীরের বাহিরে বের করে আনা।

বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে ফিজিওথেরাপিকে বিভাজন করেছেন। মূলত ফিজিওথেরাপি তিন ভাগে বিভক্ত। যথা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থেরাপি, পানীয় ব্যবহার (হাইড্রোথেরাপি) এবং ফিজিক্যাল থেরাপি।

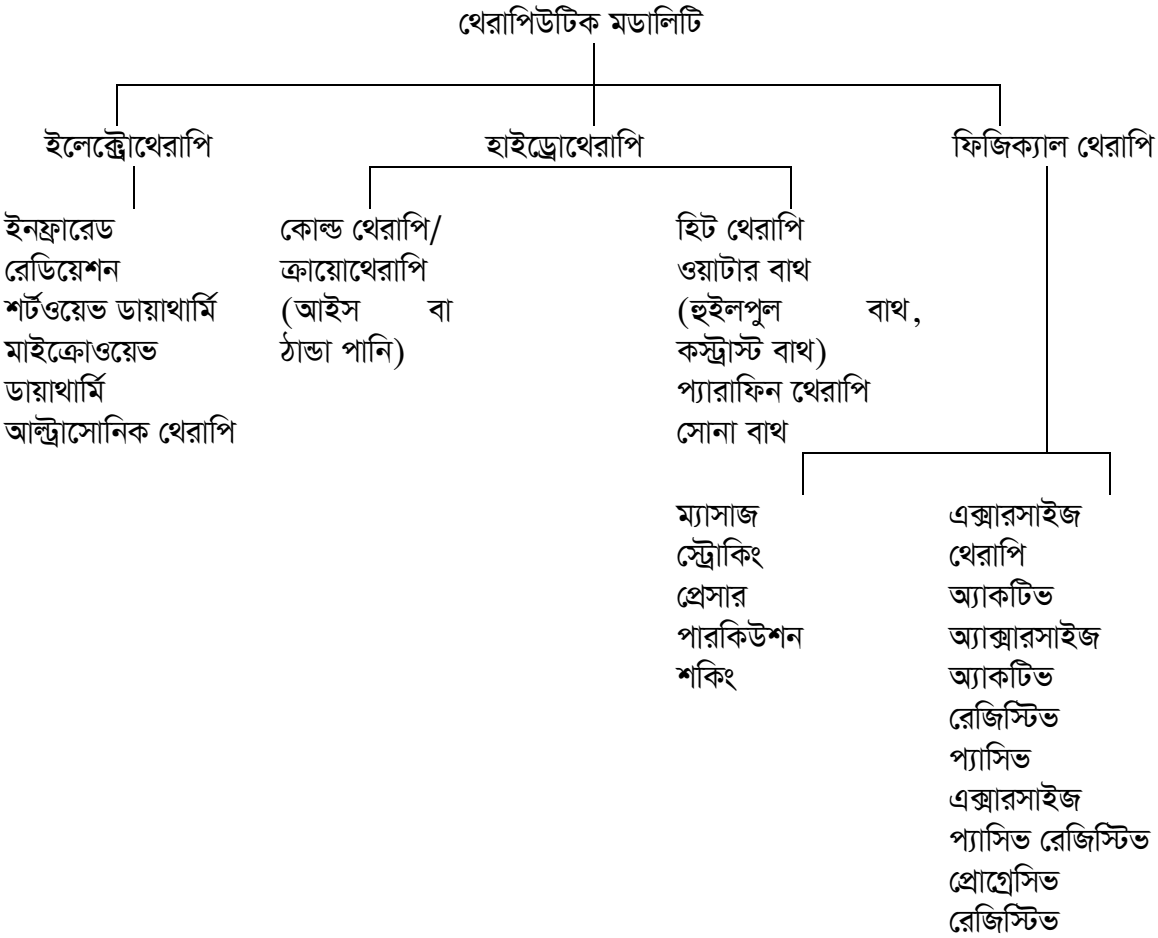

সপ্তম অধ্যায়
কোমর ব্যথা

Low back pain বা কোমর ব্যথা সকলের কাছেই পরিচিত একটি সমস্যা। জীবনের কোন না কোনো সময় কোমড় ব্যথ্যায় ভোগেনি এমন লোকের সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন। গবেষণায় দেখা গেছে ৭০% লোক জীবনের কোনো এক সময়ে কোমড় ব্যাথায় আক্রান্ত হয়েছেন। খেলোয়াড়গণ এর ব্যতিক্রম নয়। বরং তাদের সংখ্যা আরও বেশি।

ইনজুরি খেলারই একটি অংশ। সম্পূর্ণ রূপে ইনজুরি প্রতিকার সম্ভব নয়। প্রতিরোধই এর একমাত্র পন্থা। যে কোনো খেলোয়ার যে কোনো সময় ইনজুরিতে আক্রান্ত হতে পারে, তবে কিছু নিয়ম কানুন ও বিষয় মেনে চলার মাধ্যমে ইনজুরির মাত্রা কমিয়ে আনা সম্ভব। আমরা সবাই জানি Prevention is better than cure. গবেষণায় দেখা গেছে ৭০-৮০% কোমর ব্যথাই ম্যাকানিক্যাল কারণে হয়ে থাকে, যা বিভিন্ন থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ ও দৈনন্দিন কার্য সঠিক ভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

খেলোয়াড়রাও বিভিন্ন সময়ে কোমর ব্যথা নিয়ে ডাক্তার ও ফিজিওথেরাপিস্টদের শরনাপন্ন হয়ে থাকে। তাদের কোমরের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য যে শারীরিক পরীক্ষা করা হয় তাহলো-Back Flexion, Back Extension, Lateral Flexion, Slump Test,Tenderness ইত্যাদি। তাছাড়া এক্সরে, এমআরআই মাধ্যমে কোমড় ব্যথার কারণ ও এর গাঠনিক অবস্থা- (Anatomy), Flexibility, Strength, Prolapse Lumber Intervertibral Disc (PLID), Muscle Spasm, Facet joint Syndrome, Lumbago Sciatica ইত্যাদি নিরূপন করা হয়।

কোমর ব্যথার কারণসমূহ:

১. Muscle Spasm
২ Prolapse Lumber Intervertibral Disc (PLID)
৩ Arthrities
৪ Over Weight
৫ Injury
৬ Dieaseas

চিকিৎসা:

- সম্পূর্ণ বিশ্রাম
- বরফ/গরম সেক (ক্রয়োথেরাপি)
- চিকিৎসাকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ
- ফিজিওথেরাপি, হাইড্রোথেরাপি
- এক্সারসাইজ থেরাপি
- দৈনন্দিন কাজ সঠিকভাবে করা
- আকুপাংচার
- জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে অপারেশন

কোমর ব্যথা প্রতিরোধের কিছু উপায়ঃ

সঠিকভাবে ওয়ার্ম-আপ ও কোল্ড-ডাউন করা

* সঠিকভাবে কোমরের Flexibility Exercise , Strengthening Exercise করা।
* ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ।
* Postural Correction- সঠিকভাবে দাড়ানো, সঠিকভাবে বসা সঠিক ভাবে শোয়া।
* সঠিক নিয়মে বসে কাজ করা, সঠিক নিয়মে ওজন উত্তোলন করা, দীর্ঘ সময় ঝুকে কাজ না করা।
* দীর্ঘ সময়ে একই অবস্থা থেকে বসে বা দাঁড়িয়ে কাজ না করা। অল্প সময়ের জন্য হলেও অবস্থার পরিবর্তন করা।
* সমতল বিছানায় ঘুমানো।
* খুব নরম বিছানা পরিহার করা ।
* মেয়েদের হাইহিলো জুতা ব্যবহার না করা ।
* খেলাধুলার নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা ।
* কোমর ব্যথায় আক্রান্তদের উঁচু টয়লেট ব্যবহার করা।
* সঠিক টেকনিক অবলম্বন করে অনুশীলন করা।
* টেকনিক আয়ত্তে সমস্যা হলে সাথে সাথে কোচকে অবগত করা এবং কোচের নির্দেশে বিকল্প টেকনিক ব্যবহার করা।
* উপর হয়ে শুয়ে ঘুমানোর অভ্যাস পরিহার করা।
* কোমর ব্যথায় আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেয়া । ব্যথা থাকা অবস্থায় কোনো প্র্যাকটিস না করা।
* কামরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় এক্সারসাইজ করা।
* কোনো রোগের কারণে ব্যথা হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে উক্ত রোগের যথাযথ চিকিৎসা করা।
* পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।
* হঠাৎ কোনো ঘূর্ণন মুভমেন্ট না করা ।
* দীর্ঘ সময় ডেস্ক ওয়ার্ক করার সময় ফুটস্টুল ব্যবহার করা এবং উচ্চতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডেস্ক , চেয়ার ব্যবহার করা।
* কোনো ইনজুরি থাকলে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রামে থাকা।
* শরীরে যাতে পানি স্বল্পতা না দেখা দেয় সেদিকে খেয়াল রাখা, বিশেষ করে প্রতিযোগিতার সময় বিশুদ্ধ পানি ও স্পোর্টস ড্রিংকস পান করা ।

কোমর ব্যথা যেকোনো খেলোয়াড়ের ক্রীড়ার মান উন্নয়ন ও ক্রীড়া নৈপুণ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, এমনকি দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই কোমর ব্যথার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও ফিজিওথেরাপিস্টদের পরামর্শ মেনে চলা উচিত।

অষ্টম অধ্যায়

খেলোয়াড়দের হাঁটুর ইনজুরি

হাঁটুতে হঠাৎ তীব্র আঘাতের ফলে খেলাধুলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি খেলাধুলা বন্ধও হয়ে যেতে পারে। সবধরনের খেলাতেই হাঁটু আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। তবে যেসব খেলায় হাঁটু হঠাৎ ঘুরে যায় (Twisting Movement) ও হঠাৎ গতির দিক পরিবর্তন করতে হয়, সেসব খেলায় একটু বেশি মাত্রায় এ ইনজুরি হয়ে থাকে। যেমন- ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি।

হাঁটু টিবিওফিমোরাল ও প্যাটেলোফিমোরাল নামক দুটি সন্ধির সমন্বয়ে গঠিত। কোল্যাটারাল লিগামেন্ট, ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ও মেনিসকাসের সমন্বয়ে টিবিওফিমোরাল সন্ধি গঠিত। প্যাটেলোফিমোরাল সন্ধি যা মেডিয়াল রেটিনোকুলাম থেকে স্হিতিশীল এবং প্যাটেলার বড়ো টেন্ডন প্যাটেলার সামনের দিক দিয়ে অতিক্রম করেছে।

দুটি লিগামেন্ট, সামনের ক্রুসিয়েট (ACL) এবং পেছনের ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (PCL) নামে টিবিয়ার সাথে সংযুক্ত যা খেলাধূলার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ACL এর কাজ হচ্ছে ফিমারের সাথে সম্পর্কিত টিবিয়ার সামনের নড়াচড়া (movement) প্রতিরোধ করা এবং ঘুর্ণন নড়াচড়া (Rotational movement) কে নিয়ন্ত্রণ করা। আবর্তনশীল নড়াচড়ার জন্য (Pivoting movement) ACL অপরিহার্য। যদি ACL ভালো না থাকে তাহলে লাফ দিয়ে মাটিতে অবতরণের সময় টিবিয়ার আংশিক বিচ্যুতি ঘটতে পারে।

মেডিয়াল এবং ল্যাটারাল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট দুটি হাঁটুর স্থিতিশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্টের উৎপত্তি হচ্ছে ফিমারের সন্ধিরেখার ৩ সে. মি. উপরে মেডিয়াল ইপিকন্ডাইল থেকে এবং শেষ হয়েছে এন্টিরিয়র মেডিয়াল অংশে। মেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্টের (MCL) কাজ হচ্ছে ফিমার এর ভালগাস স্ট্রেচের সময় বাইরের অতিরিক্ত চাপ থেকে টিবিয়াকে রক্ষা করা।

ল্যাটারাল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট (LCL) ফিমার (Femur) এর ইপিকন্ডাইল (epicondyle) এর বাইরেরর অংশ হতে উৎপত্তি হয়ে এর নিম্নাংশ অতিক্রম করে ফিবুলার (Fibula) অগ্রভাগে সংযুক্ত হয়েছে। LCL একটি ক্ষুদ্র শক্তিশালী রজ্জু যা ল্যাটারাল মেনিসকাসের সাথে সংযুক্ত নয়। এটি ফিমারের (Femur) ভ্যারাস স্ট্রেচের সময় ভেতরের দিকে টিবিয়ার অতিরিক্ত কাত হওয়াকে প্রতিরোধ করে।

মেডিয়াল ও ল্যাটারাল মেনিসকাস হাঁটুর সন্ধিতে অবস্থিত এবং টিবিয়ার (Tibia) সাথে সংযুক্ত। মেনিসকাস হাঁটুর চাপকে কমানোর জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এভাবে হাঁটুকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

হাঁটুর ইনজুরি নিরূপনে বিভিন্ন পরীক্ষাসমূহঃ

রেঞ্জ অব মোশন (ROM): হাঁটু শরীরের সব চেয়ে বড়ো একটি সন্ধি যাকে সাইনোভিয়াল হিং জয়েন্ট ও বলা হয়। এই জয়েন্টে সাধারণত ফ্লেকশন (Flexion) ও এক্সটেনশন (Extension) নামে দুটি মুভমেন্ট হয়ে থাকে, যা এ টেনশন অবস্হায় ০° এবং ফ্লেকশন অবস্থায় ১২০°-১৩৫°। এই জয়েন্টের কৌণিক দূরত্ব পরিমাপের জন্য গনিওমিটার নামক যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়।

ভালগাস টেস্ট: এই টেস্টের মাধ্যমে মেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট (MCL) এর মচকানো বা ছিঁড়ে যাওয়া নির্ণয় করা হয়।

ভ্যারাস টেস্ট: এই টেস্টের মাধ্যমে ল্যাটারাল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট (LCL) এর ছিঁড়ে যাওয়া নির্ণয় করা হয়।

এন্টিরিয়র ড্রয়ার টেস্ট: এই টেস্টের মাধ্যমে এন্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (ACL) এর ছিঁড়ে যাওয়া নির্ণয় করা হয়।

পোস্টিরিয়র ড্রয়ার টেস্ট: এই টেস্টের মাধ্যমে পোস্টিরিয়র ক্রুসিয়েন্ট লিগামেন্ট (PCL) এর ছিঁড়ে যাওয়া নির্ণয় করা হয়।

ম্যাকমারী ও ডাক টেস্ট: এই টেস্টের মাধ্যমে মেনিসকাসের আঘাত নিরূপণ করা হয়।
এমআরআই (MRI): আঘাতের ফলে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার শতভাগ নিশ্চয়তার জন্য কিছু ক্ষেত্রে এমআরআই (MRI) পরীক্ষা করা হয়।

হাঁটুর লিগামেন্ট ইনজুরি সমূহ:
আংশিক ভাঁজকৃত হাঁটুর ওপর ভালগাস স্ট্রেচের ফলে সাধারণত মেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট (MCL) ইনজুরি হয়। যখন ডাউন হিলো রানিং, স্পর্শমূলক খেলায় প্রতিপক্ষ বাইরে এব ভেতরের দিক থেকে পার্শ্ব চাপ দেয় বা পড়ে যায়, তখন এই লিগামেন্টের ইনজুরি হয়ে থাকে। আঘাতের তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে একে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন গ্রেড-১ (সামান্য) ১ম ডিগ্রি, গ্রেড-২ (মাঝারি) ২য় ডিগ্রি এবং গ্রেড-৩ (সম্পূর্ণ) ৩য় ডিগ্রি।

গ্রেড-১ এ মেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট (MCL) আঘাত প্রাপ্ত খেলোয়াড়ের মেডিয়াল ফিমোরাল কনডাইলের উপর MCL এ চাপ দিলে ব্যথা অনুভব হয় কিন্তু কোনো ফোলা থাকে না। কিন্তু যখন হাঁটুকে ৩০° ভাঁজ করে চাপ প্রয়োগ করা হয় তখন ব্যথা অনুভব হয় তবে কোনো শৈথিল্য (Laxity) থাকে না।
গ্রেড-২ এ মেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট (MCL) ছেড়া, তীব্র ভালগাস স্ট্রেচের কারণে হয়ে থাকে ৩০° ভাঁজ করে ভালগাস পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, MCL চাপজনিত ব্যথা অনুভূত হয়েছে। MCL এর ওপর চাপে ব্যথা পাওয়ায় ও এর আশেপাশে কিছু ফোলা দেখা গেছে। কিছু শৈথিল্যের (Laxity) দেখা যায় তবে শেষাংশে স্পষ্ট।

গ্রেড-৩ এ মেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট (MCL) ছেঁড়া সাধারণত তীব্র ভালগাস স্ট্রেচের কারণে হয়ে থাকে, যার ফলে লিগামেন্ট ফাইবার সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যায়।

মেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট (MCL) এর চেয়ে ল্যাটারাল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট (LCL) এর ছিঁড়ে যাওয়ার মাত্রা কম। ইহা সাধারণত হাঁটুর উপর সরাসরি ভ্যারাস স্ট্রেচের ফলে হয়ে থাকে। এর মাত্রা ও চিকিৎসা মেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট (MCL) এর মতোই। সম্পূর্ণ ল্যাটারাল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট (LCL) এর ছিঁড়ে যাওয়া সাধারণত অন্যান্য ইনজুরির সাথে সংগঠিত হয়ে থাকে। এর ফলে হাঁটুর পার্শ্বীয় পশ্চাৎ ঘূর্ণনের অস্থিতিশীলতা দেখা যায়। এন্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (ACL) ছিঁড়ে যাওয়াটা খেলাধুলায় অস্বাভাবিক নয়। এটা সাধারণত ফুটবল, বাস্কেটবল, হকি, ক্রিকেটে বেশি লক্ষ্য করা যায়। খেলাধুলায় দীর্ঘসময় অনুপস্থিতির কারণে এই ইনজুরি বেশি হয়। সাধারণত খেলোয়াড় লাফ দিয়ে ওপর থেকে নিচে অবতরণের সময় হাঁটু যখন হঠাৎ ঘুরে যায় তখনই সবচেয়ে বেশি ACL ছিঁড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। খেলার সময় অন্য খেলোয়াড় যদি হাঁটু বরাবর পড়ে যায় তাহলেও এই লিগামেন্ট ছিঁড়ে যেতে পারে।

হাঁটুর ভাঁজ অবস্হায় এন্টিরিয়র টিবিয়ায় বাইরের দিকে অতিরিক্ত টানের কারণে বা সরাসরি আঘাতের ফলে পোস্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (PCL) ইনজুরি হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে রোগী সাধারণত হাঁটুর পেছনে কাফ মাসল (Calf muscle) সহ সামান্য ব্যথা অনুভব করে। লিগামেন্টের আঘাৎ পর্যবেক্ষণ করে ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে ইংরেজি বর্ণ দ্বারা সংক্ষিপ্তরূপ PRICED-MM চিকিৎসা পদ্ধতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।

অন্যান্য ইনজুরি বা সমস্যাসমূহ:

Knee Arthrities (Osteoarthrities) ,
Meniscus Injury ,
Patellar Dislocation ,
Patellar Tendonitis ,
Patellofemoral Pain Syndroms ,
Quadriceps Tendonites ,
Osgood Schlatter Disease .

চিকিৎসা ও পুনর্বাসন :

PRICEMMD প্রটোকল অনুযায়ী চিকিৎসা

P - Protection (রক্ষা)
R - Rest (বিশ্রাম)
I - Ice (বরফ)
C - Compression (চাপে রাখা)
E -Elevation (আঘাত প্রাপ্ত স্থানকে উঁচুতে রাখা)
D- Diagnosis (রোগ নির্ণয়)
M - Medication (যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করা)
M - Modality (যন্ত্রপাতির সাহায্যে চিকিৎসা করা) বোঝানো হয়েছে

ভাল চিকিৎসার জন্য রোগীকে ডাক্তার বা ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিৎ। একজন খেলোয়াড়কে তার ইনজুরির পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য অবশ্যই পুনর্বাসন প্রয়োজন। তাই প্রত্যেক খেলোয়াড়কে পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পন্ন করা উচিত।

নবম অধ্যায়
ম্যাসাজ (MASSAGE)

(ম্যাসাজ) Massage: চিকিৎসার উদ্দেশ্যে শরীরের নরম কোষকলাসমূহকে বৈজ্ঞানিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মালিশ করা এবং তা একই রূপে স্কিনের উপর দিয়ে সরাসরি সম্পাদন করাকে ম্যাসাজ বলে।

(ম্যাসাজের ইতিহাস) History of Massage: রোগ আরোগ্যের বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে ম্যাসাজ এইটি অতি পুরাতন ও গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি। প্রাণিরা নিজেদের শরীরের ক্ষতস্থান বা তাদের বাচ্চাদের জিহ্বা চেটে যে আরামবোধ উপলব্ধি করে থাকে তাও একধরনের ম্যাসাজ। এতে করে তাদের ব্যাথারও উপশম হয়। সাধারণত ম্যাসাজের সূচনা প্রথমে চীনে হয় বলে জানা যায়। তবে ইন্ডিয়া, মিশর, ইরান এবং জাপানেও বহুকাল আগে থেকেই ম্যাসাজের প্রচলন ছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। সুইডেনের পার হেনরেক এক ধরনের ম্যাসাজ আবিষ্কার করেন যাকে বলা হয় সুইডিস ম্যসাজ।

Principles of Massage (ম্যাসাজ মূলনীতিসমূহ):

ম্যাসাজ টেবিল: এই টেবিল টি বিশেষ একধরনের টেবিল যার উচ্চতা হবে ম্যাসিউরডের দাঁড়ানো অবস্থায় তার হাতের মধ্যমা আঙ্গুলের সমান এবং এই টেবিলের মাঝখানে একটি গর্ত থাকবে, যাতে উপুড় হয়ে শুয়ে গর্তে মুখ রেখে সহজেই শ্বাস- প্রশ্বাস নেওয়া যায়।

Clothing (কাপড়): ম্যাসাজের সময় অবশ্যই টাইট ফিটিং কাপড় পরিহার করতে হবে এবং খোলা বা ঢিলাঢালা পোশাক বা কাপড় পরিধান করতে হবে। প্রয়োজনে তোয়ালে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া এমনিতেই দুটি তোয়ালে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি ম্যাসিউরডের এবং অপরটি যাকে ম্যাসাজ করা হবে তার জন্য।

ম্যাসাজের সময় সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা থাকবে শুধু যে অংশটুকু ম্যাসাজ করতে হবে ঐ অংশটুকুই খোলা থাকবে।

ম্যাসাজের উপকরণ (Lubricants): লুব্রিকেন্টস বা উপকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, ম্যাসাজের সময় যাতে ম্যাসিউর এবং ক্লাইড উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। তারা যেন উভয়েই আরাম বোধ করেন তবে প্রয়োজনের অধিক লুব্রিকেন্টস কখনই সরাসরি রোগীর স্কিনে দেয়া উচিত নয়। প্রথমে ম্যাসিউরডের হাতে নিয়ে দু হাতের দ্বারা ভালোভাবে মিক্সড করে তারপর ম্যাসাজ করা উচিত। শীতের সময় শরীর যাতে তাড়াতাড়ি গরম হয় সেজন্য তেল ব্যবহার করাই ভাল।

সম্ভব্য উপকরণসমূহ:

১. ভেজিটিবল ওয়েল: ভেজিটিবল ওয়েলের মধ্যে রয়েছে চিনিবাদাম, ওলিভ বা জলপাই, কাটবাদাম এবং নারিকেলের তেল।
২. স্কিন ময়েশচারাইজার: যে কোনো ধরনের ভাল স্কিন ময়েশচারাইজার।
৩. সরবলিন: এক ধরনের উপকরন যা বাজারে সরবলিন নামে পরিচিত।

অ্যারোমেটিক বা সুগন্ধি জাতীয় তেল:

১. Oill of tea tree: এটি শরীরে ফাংগাস, ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে
২. Oil of Perpperment: এটি শরীরকে উত্তেজিত করতে সাহায্য করে, ডায়াজেশনে সাহায্য করে এমনকি মনকেও প্রফুল্ল রাখে।

৩. Oil of Rosemary: সাধারণত মাথাব্যথা এবং মাসকুলার পেইন থাকলে ব্যবহার করা হয়।
৪. Oil of Cypress: মিনিস্ট্রুয়াল পেইন এবং ভেরিকস পেইন রিলিভ করে।
৫. Oil of Lovender: বেদনানাশক: মাথাব্যথা, টেনশেন ইত্যাদি কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
৬. Oil of eucalyptus: অ্যান্টিসেপটিক (জীবাণুনাশক) এবং অ্যান্টিরিউমেটিক হিসেবে কাজ করে
* এছাড়া ম্যাসাজের উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন ধরনে অ্যারোমেটিক পাউডারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
প্রেসার এবং রিদম : একজন ম্যাসিউরডকে অবশ্যই অ্যানাটমি সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা শরীরের এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে ম্যাসাজ করলে হিতে বিপরিত হতে পারে। ম্যাসাজ মোভমেন্ট করার সময় ছন্দের মিল রেখে ম্যাসাজ করতে হবে , হঠাৎ করে বন্ধ করা যাবে না। ম্যাসাজ করার সময় হালকাভাবে শুরু করে আস্তে আস্তে ডিপে যেত হবে এবং হালকা ম্যাসাজ দিয়ে শেষ করতে হবে।
সময়: সাধারণত সম্পূর্ণ শরীর ভালোভাবে ম্যাসাজ করতে একজন ম্যাসিউরডের ৬০ থেকে ৮০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয় কিন্তু সিংগেল বা একটি পার্টের ম্যাসাজে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় লাগে।

ম্যাসাজের ধরন:

১. আকুপ্রেসার ম্যাসাজ: আকুপ্রেসার পয়েন্টে যে ম্যাসাজ করা হয়।
২. সুইডিস ম্যাসাজ: হালকা ম্যাসাজ এবং ফলপ্রসূ ।
৩. রিমেডিয়াল ম্যাসাজ: ডিপ কানেকটিভ টিস্যুর ম্যাসাজ।
৪. সায়েটসু ম্যাসাজ: স্পাজম বা খিচুনি রোধ করে, ট্রিগার পয়েন্টের ব্যথা উপশম করে।

ম্যাসাজের মুভমেন্ট:

১. Stroking and Efflurage
২. Kneading and Petressage
৩. Friction.
৪. Vibration
৫. Taportment or Percussion : a) Claping
b) Heeking and
c) Pounding
৬. Passive movement

ইভেন্টের পূর্বে ম্যাসাজ (Pre-Event massage): ইভেন্ট শুরু হওয়ার আঁধাঘন্টা বা ৩০ মিনিট পূর্বে এই ম্যাসাজ দেয়া হয়। এটিকে ওয়ার্ম-আপ ম্যাসাজও বলাহয়। এই ম্যাসাজ ১০ থেকে ১৫ মিনিট দেয়া হয় এবং তা কখনোই ২০ মিনিটের বেশি হওয়া উচিৎ নয়।

উদ্দেশ্য:

১. স্পিড, পাওয়ার, ইনডিউরেনঞ্জ, ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ানো এবং ইনজুরি প্রতিরোধ করা।
২. কোষসমূহে পুষ্টি সরবরাহ এবং ব্লাড ক্যাপিলারির ডায়েজেশনে সাহায্য করা।
৩. ডিপ ট্রান্সভার ফ্রিকশন করে জোরা লেগে যাওয়া মাসল ফাইবারগুলোকে ভেঙ্গে দেয়া।
৪. টেন্ডন এবং লিগামেন্টের ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ানো।
৫. মাংসপেশির খিচুনী রোধ করা এবং
৬. সাইকোলজিক্যাল বেনিফিট।

ইভেন্টের পরে ম্যাসাজ ((Post-Event massage): ইভেন্টে শেষে কুলডাউন বা ওয়ার্ম-ডাউনের পর পোষ্ট ইভেন্ট ম্যাসাজ করা হয়। এই ম্যাসাজ করা হয় ৩ থেকে ৫ মিনট ।

উদ্দেশ্য :

১. মাসলের সোরনেস (ক্ষতয়ুক্ত) প্রতিরোধ করতে সাহায্য করা।
২. ক্লান্তি দুর করা।
৩. ঘুমের ব্যঘাত যাতে না ঘঠে ।
৪. টিস্যুসমূহে রক্তের উৎপত্তি ঘটানো এবং
৫. দ্রুত রিকভারী করা ।

ম্যাসাজের কন্ট্রাইন্ডিকেশন:

১. একিইড ইনজুরি, যেমন: স্প্রেইন, স্ট্রেইন এবং বার্সাইটিস থাকলে ম্যাসাজ করা যাবে না
২. সুপারফিসিয়াল ক্ষতস্থান: সাম্প্রতিক বার্ন বা পুরে যাওয়া, সাম্প্রতিক সার্জারী হলে ম্যাসাজ করা যাবে না।
৩. স্কিনে ইনফেকশন হলে বা থাকলে ম্যাসাজ করা উচিৎ নয়।
৪. ভেইন ফুলে থাকলে ম্যাসাজ করা উচিৎ নয়।
৫. প্রেগনেন্ট মহিলোার তলপেটে ম্যসাজ করা য়াবে না।
৬. ফ্রাকচার হলে ম্যাসাজ করা যাবে না।
৭. জ্বর থাকলে করা যাবে না।
৮. হাইপারটেনশন থাকলে ম্যাসাজ করা যাবে না।

দশম অধ্যায়
টীকা

ফ্যাটিগ (Fatigue):
দীর্ঘক্ষণ একই কাজ করার ফলে সেই কাজের প্রতি মানুষের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির কর্মক্ষতার মান হ্রাস পায়। এ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার পরিবর্তনকেই অবসাদ বা ফ্যাটিগ বলে। অর্থাৎ অবসাদ বলতে কর্মশক্তির শিথিলতা বা কর্মশক্তি হ্রাস পাওয়াকেই বোঝায়।
অবসাদ দুই ধরনের, যথা- (১) মানসিক অবসাদ (২) শারীরিক অবসাদ। কাজের প্রথমদিকে কর্মীর মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা থাকে সময় অতিবাহিত হতে থাকলে তা কমতে থাকে, একেই মানসিক অবসাদ বলে। ব্যক্তি যখন কোনো কাজ করতে করতে শারীরিকভাবে অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন তাকে শারীরিক অবসাদ বলে। শরীরে শক্তি উৎপাদনকারী পদার্থসমূহ অতিরিক্ত পরিশ্রমের দ্বারা ক্ষয়পাপ্ত হতে থাকলে অবসাদ ঘটে। দীর্ঘক্ষণ ধরে কাজ করার ফলে মাংসপেশীর তন্তুর ক্ষয় সাধিত হয়ে এক প্রকার আবর্জনার সৃষ্টি হয় যা স্নায়ুমণ্ডলীর কার্যধারায় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অক্সিজেন এর অভাব ঘটলে অবসাদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশ্রাম ও নিদ্রা; যথোপযুক্ত আহার্য গ্রহণ ইত্যাদি দ্বারা অবসাদ বিদূরিত হয়। বিশ্রাম ও নিদ্রার ফলে দেহ ও মস্তিষ্কের অবসাদ দূর হয় এবং পুনরায় নতুন উদ্যমে কাজ করার স্পৃহা জন্মে।

ওয়ার্ম-আপ (Warm-up)
অনুশীলন কিংবা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পূর্বে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির লক্ষ্যে খেলোয়াড়দের জন্য ওয়ার্ম-আপ একটি অপরিহার্য বিষয়। সুতরাং প্রশিক্ষক ও খেলোয়াড়দের এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত, পদ্ধতিগত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

শরীরকে শারীরিক কসরত বা ব্যায়ামের মাধ্যমে পরবর্তী নির্দিষ্ট খেলার জন্য শারীরিক এবং মানসিকভাবে উপযুক্ত করার নাম ওয়ার্ম-আপ। অর্থাৎ নির্ধারিত কোনো ক্রীড়া কার্যক্রম শুরুর পূর্বে একজন খেলোয়াড়কে শারীরিক ও মানসিকভাবে যথোপযুক্ত প্রস্তুতির জন্য যে সব কর্মকাণ্ডের প্রয়োগ করা হয় তাকে ওয়ার্ম-আপ বলা হয়। ওয়ার্ম-আপ দু'ভাগে হতে পারে। যথা- (১) সক্রিয় ওয়ার্ম-আপ (২) নিষ্ক্রিয় ওয়ার্ম-আপ।
(১) সরাসরি অঙ্গসঞ্চালন (Motion) এবং কসরত (Exercise)-এর মাধ্যমে যে ওয়ার্ম-আপ সম্পন্ন হয় তাকে সক্রিয় ওয়ার্ম-আপ বলে। সক্রিয় ওয়ার্ম-আপকে নিষ্ক্রিয় ওয়ার্ম-আপ এর চেয়ে বেশি কার্যকর বলে গণ্য করা হয়। হাঁটা, জগিং করা বা দৌড়ানো, মাংসপেশীর সম্প্রসারণ মূলক ব্যায়ম ইত্যাদি সক্রিয় ওয়ার্ম-আপ এর অন্তর্ভুক্ত। সক্রিয় ওয়ার্ম-আপকে আবার দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে। যথা-
(ক) সাধারণ ওয়ার্ম-আপ: সাধারণ ওয়ার্ম-আপ হলো সেসব শারীরিক কার্যকলাপ, যার মাধ্যমে সঞ্চালন বা নড়াচড়ার (Movement) সাহায্যে শরীরকে সক্রিয় করে। যেমন- কোনো সরঞ্জাম ছাড়াই অঙ্গ সঞ্চালন, হাঁটা, দৌড়ানো মাংসপেশীর সম্প্রসারণ, ক্যালির্সথেনিক ব্যয়ম ইত্যাদি।
(খ) বিশেষ ওয়ার্ম-আপ: বিশেষ ওয়ার্ম-আপ হলো সেসব শারীরিক কার্যকলা, যার মাধ্যমে খেলোয়ার অঙ্গ সঞ্চালনের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট খেলার জন্য নির্ধারিত কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শরীর গরম করে।
(২) সক্রিয়ভাবে অঙ্গ সঞ্চালন ছাড়াই অন্যভাবে যে ওয়ার্ম-আপ করা হয় তাকে নিষ্ক্রিয় (Passive) ওয়ার্ম-আপ বলা হয়। যেমন- ম্যাসাজ, গরম পোশাক, গরম পানি বা বাষ্প, কফি, উদ্দীপক পানীয় ইত্যাদি। প্রাপ্ত

বয়স্ক এবং উচ্চমান সম্পন্ন খেলোয়ার ১৫-৩০ মি. পর্যন্ত ওয়ার্ম-আপ করতে পারে, অবশ্য খেলোয়াড়দের বয়স, খেলার মান, আবহাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করে ওয়ার্ম-আপ এর সময় ও ধরনের তারতম্য ঘটতে পারে। ওয়ার্ম-আপ এর ফলে খেলোয়াড়দের ক্রীড়া কৌশল দক্ষতার সাথে প্রদর্শন করতে পারে। সঠিক ওয়ার্ম-আপ খেলোয়াড়দের আঘাত কিংবা দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করে এবং শরীরের অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

কুল ডাউন (Cool Down):

খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার পর শরীরকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নিয়ে আসাকে কুলডাউন (কান্তি দূরীকরণ) বলে। কুল ডাউন করা খেলোয়ারদের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রচণ্ড এবং শ্রমসাপেক্ষ অনুশীলন কিংবা প্রতিযোগিতারপর স্বভাবতই একজন খেলোয়াড়ের মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি সীমা অতিক্রান্ত হয়। সেজন্য ক্লান্তি দূরীকরণের লক্ষ্যে কুল ডাউন অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত।

অনুশীলন কিংবা প্রতিযোগিতার পর খেলোয়াড়দের ৫-১৫ মিনিট পর্যন্ত মন্থর গতির দৌড়, সে সাথে পেশী ও অস্থিগ্রন্থিসমূহ শিথিল করাসহ হালকা পেশী সম্প্রসারণমূলক ব্যায়াম করার পরামর্শ দেয়া উচিত। উল্লেখ্য যে, শ্রম সাপেক্ষ অনুশীলন কিংবা প্রতিযোগিতার পর মাংসপেশীতে যে অপ্রয়োজনীয় ল্যাকটিক এসিড সঞ্চিত হয়, যার কারণে মাংসপেশীতে ব্যথা অনুভূত হতে পারে, তা কুল ডাউনের মাধ্যমে দূরীকরণ সম্ভব হয়। শ্রম সাপেক্ষ কাজের পর খেলোয়াড়রা স্বভাবতই কুল ডাউনের জন্য পুনরায় দৌড়ানোর আগ্রহ দেখায় না, সেক্ষেত্রে এক স্থানে দাঁড়িয়ে বা বসে শরীরের মাংসপেশীর সম্প্রসারণ ও শিথিল করার ব্যায়ামগুলো বেশি মাত্রায় প্রয়োগ করে কুল ডাউন সম্পন্ন করা যেতে পারে। কুল ডাউনের ফলে খেলোয়াড়দের শ্রম সাপেক্ষ কার্যক্রমের পর তাদের শারীরিক ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে পরবর্তী কর্মসূচিতে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে পারে। সেজন্যই ক্লান্তি দূরীকরণ এবং পুনরায় শরীর উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে কুল ডাউন অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অ্যাথলেটিক হার্ট (Athletic Heart):

হার্ট বা হৃদপিণ্ড হলো দেহের রক্ত ও যাবতীয় তরল পদার্থ পরিবহনের কেন্দ্র এবং এটি একটি পেশীবহুল যন্ত্র। হার্টের এসব পেশীকে বলা হয় হৃদপেশী (Cardiac Muscles)। এসব পেশীই সজোরে রক্তকে ধমনী দিয়ে পাঠিয়ে দেয় সারা শরীরে। হৃদপেশী নির্মিত ত্রিকোণাকার ফাঁপা প্রকোষ্ঠযুক্ত পাম্পের মতো যন্ত্র যার সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সারা দেহে রক্ত সংবহিত হয় তাকে হৃদপিণ্ড (heart) বলে। হৃদপিণ্ড মানবদেহের পাম্প যন্ত্র রূপে কাজ করে। জীবন্ত এ পাম্প যন্ত্রটি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে আনিত রক্ত ধমনীর সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে এবং অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। কোনো কারণে অক্সিজেন সরবরাহ কম হলে হার্ট দুর্বল হয় এবং তার পুষ্টি ও ক্রিয়া কমে যায়।

অ্যাথলেটিক হার্ট বলতে ক্রীড়াবিদদের হৃদপিণ্ডকে বোঝায়। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে খেলোয়াড়দের কর্মকাণ্ড (যেমন- খেলাধূলা, ব্যায়াম) অধিক পরিশ্রম সাপেক্ষ। এ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে হৃদপিণ্ডের ওপর বেশ চাপ পড়ে। ফলশ্রুতিতে হৃদপিণ্ডের গতি, নাড়ীর গতি, কার্ডিয়াক অডিটপুট বেড়ে যায় এবং রক্তে অক্সিজেন কমে এবং কার্বনডাই-অক্সাইড বেড়ে যায়। খেলাধূলা বা ব্যায়াম করলে রক্ত চলাচল বেড়ে যাওয়ার ফলে হৃদপিণ্ডের মাংশপেশী শক্তিশালী, অধিকতর কর্মক্ষম ও নিরোগ হয়, এ হার্টকে অ্যাথলেটিক হার্ট বলে।

মাসল পুল (Muscle Pool)

দেহের সংকোচী কলাকে পেশী বলা হয়। পেশীতে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি পেশীর সংকোচনের সময় যান্ত্রিক শক্তিকে রূপান্তরিত হয় এবং দেহের প্রয়োজনীয় বিচলন ঘটায়। সংকোচনের পর প্রসারিত হয়ে বিশ্রাম নেয়াই হচ্ছে পেশী ধর্ম। একটিন ও মায়োসিন নামক প্রোটিন পেশীতে অবস্থিত। এ একটিন ও মায়োসিন ক্যালসিয়ামের সহায়তায় একে অন্যের ভেতরে প্রবেশ করে, ফলে মাংসপেশী সংকোচিত হয় এবং পরে পুনরায় প্রসারিত হয়। পেশী সঞ্চালন স্বাভাবিক স্বাস্থ্য, দৈহিক যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। নিয়মিত কায়িক অনুশীলনে (খেলোয়াড়দের জন্য যা বাধ্যতামূলক) দেহের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফুসফুস, হৃদপিণ্ড ও রক্ত সংবহনের কর্মক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে ওঠে এবং দৈহিক ও মানসিক অবসাদ রোধ হয়। খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার সময় একটি বা এক গুচ্ছ মাংসপেশী বেশি উত্তেজিত হওয়ার ফলে তাকেই মাসলপুল বলা হয়। খেলাধূলা বা ব্যয়াম করার সময় কম বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। খেলাধুলার পূর্বে সঠিক ওয়ার্ম-আপ করলে মাংসপেশীর টান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

ভাইটাল ক্যাপাসিটি (Vital Capacity)

আমরা সাধারণত প্রতি মিনিটে ৪৮০-৪৪০ কিউবিক ইঞ্চি বাতাস গ্রহণ করি ও ত্যাগ করি। ঘুমের সময় এ বাতাসের পরিমাণ কম থাকে। খেলাধুলা পরিশ্রম ও ব্যয়াম করলে আমরা বেশি বাতাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি। ফুসফুসে সব রকম বাতাস মিলিয়ে মোট প্রায় ৫০০০ সি.সি. বাতাস থাকে; ৫০০০ ml ও বলা যায়। কারণ ১ সি.সি. ১ ml. এর সমান। এ হাওয়ার পরিমাণ যে যন্ত্রের দ্বারা নির্ণয় করা হয়, তার নাম spirometer। এ হাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে দৈহিক উচ্চতা, বয়স ও দেহের ওপর। স্বাভাবিক শ্বাস নিয়ে স্বাভাবিক শ্বাস ত্যাগ করলে যে পরিমাণ বাতাস আমরা ত্যাগ করি তাকে বলা হয় Tridal air। এর পরিমাণ প্রায় ৫০০ সি.সি। স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণের পরও অতিরিক্ত কিছু পরিমাণ বায়ু চাপ দিয়ে শ্বাস নিয়ে গ্রহণ করা যায় তাকে বলা হয় Complementary air। এর পরিমাণ ১৫০০ সি.সি.। স্বাভাবিক শ্বাস ত্যাগ করার পরও বেশি চাপে শ্বাস ত্যাগ করলে যতটা অতিরিক্ত বাতাস ফুসফুস থেকে বের করে দেয়া যায় তাকে বলে Supplementary air। এর পরিমাণ ১৫০০ সি.সি.। সবচেয়ে জোরে জোরে চাপ দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করে তারপর ধীরে ধীরে সর্বাধিক চাপ দিয়ে যতটা সম্ভব বাতাস ত্যাগ করা যায়, তাকেই বলে Lung capacity বা Vital capacity। তাহলে এক কথায় বলা যঅয় যে, ভাইটাল ক্যাপাসিটি=ট্রাইডাল এয়ার + কমপ্লিমেন্টারি এয়ার + সাপ্লিমেন্টারি এয়ার। এর মোট পরিমাণ হলো প্রায় ৫০০+১৫০০+১৫০০=৩৫০০ সি.সি.। খেলোয়ারদের ভাইটাল ক্যাপাসিটি বেশি হয়ে থাকে। পুরুষের ভাইটাল ক্যাপাসিটি মেয়েদের চেয়ে বেশি হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে এ বায়ুর পরিমাণ প্রায় ৪.৮ লিটার এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রায় ৩.১ লিটার।

ম্যাসাজ (MASSAGE)

(ম্যাসাজ) Massage: চিকিৎসার উদ্দেশ্যে শরীরের নরম কোষকলাসমূহকে বৈজ্ঞানিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মালিশ করা এবং তা একই রূপে স্কিনের ওপর দিয়ে সরাসরি সম্পাদন করাকে ম্যাসাজ বলে।

(ম্যাসাজের ইতিহাস) History of Massage: রোগ আরোগ্যের বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে ম্যাসাজ এইটি অতি পুরাতন ও গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি। প্রাণিরা নিজেদের শরীরের ক্ষতস্থান বা তাদের বাচ্চাদের জিহ্বা চেটে যে আরামবোধ উপলব্ধি করে থাকে তাও একধরনের ম্যাসাজ। এতে করে তাদের ব্যাথারও উপসম হয় । সাধারনত ম্যাসাজের সূচনা প্রথমে চীনে হয় বলে জানা যায়। তবে ইন্ডিয়া, মিশর,

ইরান এবং জাপানেও বহুকাল আগে থেকেই ম্যাসাজের প্রচলন ছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। সুইডেনের পার হেনরেক এক ধরনের ম্যাসাজ আবিষ্কার করেন যাকে বলা হয় সুইডিস ম্যসাজ।

সুষম খাদ্যঃ(Balance Diet)

সুসম খাদ্য বলতে খাদ্যের একটি তালিকাকে বোঝানো হয় যেখানে খাদ্যের প্রতিটি উপাদান পরিমিত বা আনুপাতিক হারে লিপিবদ্ধ থাকে। একজন মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম, চলাফেরা, শরীর গঠন, দেহের অভ্যন্তরে রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ, স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক গতিশীলতা রক্তের প্রবাহ এবং পর্যপ্ত তাপ উৎপাদনের জন্য খাদ্যের উপাদানগুলো যথা, শর্করা (Carbohydrate), আমিষ (Protein), এবং স্নেহ (Fat), ভিটামিন (Vitamins), খনিজ (Minerals) এবং পানি (Water), কী পরিমাণে প্রয়োজন তার পূর্ণাঙ্গ তালিকাকে সুষম খাদ্য তালিকা বলে।

যে খাদ্য দেহের ক্যলরির চাহিদার যোগান দিতে পারে, কলা-কোষের বৃদ্ধি ও গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখতে পারে এবং দেহের শরীরবৃত্তিয় কার্যবলীকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রন করতে পারে তাকে সুষম খাদ্য বলে। একটি পূর্ণাঙ্গ সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে নিম্নেলিখিত বিষয়েগুলো ভালোভাবে অনুসরণ করতে হবে-

সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুতের মূলনীতি: একটি সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুতে নিম্নেলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করা উচিৎ -

- কাজের প্রকৃতি (স্বাভাবিক মাঝারী এবং পরিশ্রমী) বিবেচনা।
- লিঙ্গ, বয়স এবং ওজন অনুসরণ।
- প্রতিদিনের ক্যালরির চাহিদা (Kcal) নির্ধারণ।
- প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের আনুপাতিক হার (%) নির্ণয়।
- (Kcal)- কে গ্রামে (gm) রূপান্তর।
- খাদ্য চয়ন।
- খাদ্য বিতরণ (Serving)।

ডোপিং (Dopping)

প্রদীপের নিচেই যেমন থাকে অন্ধকার, সুন্দর, সুগন্ধ ফুলে থাকে বিষাক্ত কীট, তেমনি ক্রীড়া চিকিৎসার অন্ধকারের রাজত্ব হলো উত্তেজক ঔষধের ব্যবহার। ডোপিং হলো উত্তেজক ঔষধ যার মাধ্যমে অর্থাৎ গ্রহণ করলে খেলোয়ারদের মাংসপেশীর সাময়িক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং কর্মক্ষমতা বাড়ায়। মহাভারতের লেখা আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যোদ্ধার সোমরস পান করে যুদ্ধে যেতেন। পুরাকারে গ্রীক খেলোয়াররা ব্যাঙের ছাতা থেকে একরকম রস বের করে খেলাধূলার আগে পান করতেন। রোমান খেলোয়াররাও খেলার আগে মত এবং তিলের নির্যাস পান করতেন। তাহরে দেখা যাচ্ছে, উত্তেজক ঔষধের ব্যবহার বা অপব্যবহার শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। উত্তেজক ঔষধে আসক্ত হয়ে অনেক প্রতিভাবন খেলোয়ার অকালেই নষ্ট হয়েছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬০ সালে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি খেলাধুলায় উত্তেজক ঔষধের ব্যবহার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছির। কিন্তু তারপরও বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্র এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খেলাধূলায় যেসব উত্তেজক ঔষধ সাধারণত ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে মোটামুটি চার ভাবে ভাগ করা যায়-

যথা:-

১) যেসব ঔষধ ইনজেকশন দ্বারা দেয়া হয়-

ক) হেরোইন (Heroin)
খ) কোকেন (Cocine)
গ) পুরুষ হরমোন (Anapsolic Steroids)
২) যেসব ঔষধ পানীয় হিসেবে দেয়া হয়-
ক) মদ (Alcohol)
খ) L.S.D
গ) ক্যাফিন (Caffiene)
৩) যেসব ঔষধ টেবলেট হিসেবে দেয়া হয়-
ক) এমফিটেমাইন (Amphetamine)
খ) কামপোজ (Calmpose)
গ) ম্যাডডেক্স (Mandrax)
ঘ) ডেপসোনিল (Depsonil)
ঙ) টফরেনিল (Tofranil)
৪) যেসব ঔষধ ধুমপানের সঙ্গে দেয়া হয়-
ক) মারিযুয়ানা (Marijuana)
খ) গাঁজা (Cannabis)

সহায়ক গ্রন্থ

১. অধ্যাপক ডা. এ কে চাকলাদার, হ্যান্ডবুক অফ্ অ্যানাটমি অ্যাণ্ড ফিজিওলজি, এ বি পাবলিখেশন, কালিবাতা।

২. চট্রোপাধ্যায়, বিশ্বাস, দাস এবং বিশ্বাস, 'এক নজরে শারীর শিক্ষা,' মুর্শিদাবাদ: প্রকাশক পরশি, ২০০০।

৩. ডাঃ লায়লা দাস, ডাঃ মানবেন্দ্র ভট্রাচার্য, ডাঃ সুদর্শন ভৌমিক, ডাঃ অসীম কুমার বোস এবং গোলাম কিবরিয়া।

৪. জসিম উদ্দিন আহম্মদ, অ্যানাটমি ও স্পোর্টস ফিজিওলজির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, গাজীপুর : ২০০৩

৫. ডা. রেজাউল করিম, হৃদরোগ প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান, চট্টগ্রাম : প্রমিস প্রিন্টার্স ,২০০৫

৬. ডা. এস.এন. পাণ্ডে, স্পোর্টস মেডিসিন, কলকাতা : আদিত্য প্রকাশালয়, ১৯৯০

৭. মোঃ মোকবুল মাহমুদ ভুঞা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, ঢাকা ২০০৩

8. Dr. N. Govindarajulu , Sports Medicine India : Friends Publicatoin , 2006.
9. CS Jayaprakash, Sports Medicine India : Friends Publications , 2006.
10. Evelyn Pearce , Anatomy and Physiolgy for Nurses , Calcutta : Oxford University Press , 1992.
11. William D. Mcardle , Frank I. Katch and Victor L. Katch, Exercise Physiology, USA: Lea & Febiger, 1985.
12. William E. Perntice, rehabilitation techniques, New york : Mc Graw Hill, 2004.
13. Dr. A.K. Uppal , Physical Fitness and Wellnes , India : publications, 2004.

NATIONAL UNIVERSITY

Syllabus

Subject: Sports Science

Three Years B.Sports Pass Course

Effective from the Session: 2013–2014

National University
Syllabus for Three Year B.Sports Pass Course
Subject: B. Sports
Session: 2013-2014

Course content and marks distribution

B. Sports (Arts):

Paper Code	Paper	Paper Title	Marks	Credits
First Year				
114601	Paper-I	Science of Sports Training	100	4
114603	Paper-II	Exercise Physiology & Sports Biomechanics	100	4
Second Year				
124601	Paper-III	Sports Psychology	100	4
124603	Paper-IV	Sports Nutrition, Care & Prevention of Sports Injuries & Sports Management	100	4
Third Year				
Any Two Paper (One Theory and One Practical)				
134601	Paper-V	Sport/Game (Hokey) (Theory)	100	4
134602	Paper-VI	Sport/Game (Hokey) (Practical)	100	4
134603	Paper-V	Sport/Game (Cricket) (Theory)	100	4
134604	Paper-VI	Sport/Game (Cricket) (Practical)	100	4
134605	Paper-V	Sport/Game (Football) (Theory)	100	4
134606	Paper-VI	Sport/Game (Football) (Practical)	100	4
134607	Paper-V	Sport/Game (Basketball) (Theory)	100	4
134608	Paper-VI	Sport/Game (Basketball) (Practical)	100	4
134609	Paper-V	Sport/Game (Tennis) (Theory)	100	4
134610	Paper-VI	Sport/Game (Tennis) (Practical)	100	4
134611	Paper-V	Sport/Game (Boxing) (Theory)	100	4
134612	Paper-VI	Sport/Game (Boxing) (Practical)	100	4
134613	Paper-V	Sport/Game (Shooting) (Theory)	100	4
134614	Paper-VI	Sport/Game (Shooting) (Practical)	100	4
134615	Paper-V	Sport/Game (Gymnastics) (Theory)	100	4
134616	Paper-VI	Sport/Game (Gymnastics) (Practical)	100	4
134617	Paper-V	Sport/Game (Swimming) (Theory)	100	4
134618	Paper-VI	Sport/Game (Swimming) (Practical)	100	4
134619	Paper-V	Sport/Game (Track and Field) (Theory)	100	4
134620	Paper-VI	Sport/Game (Track and Field) (Practical)	100	4
		Total=	600	24

Detailed Syllabus
First Year

Paper Code	Paper	Paper Title	Marks	Credits
114601	Paper-I	Science of Sports Training	100	4

1. **Introduction:**
   - Basic concept of sport training;
   - Principle of sport training;
   - Training means.
2. **Training load:**
   - Definition of training load, Inner load and outer load;
   - Factors of training load;
   - Overload – symptoms, causes and remedies.
3. **Training methods:**
   - Methods based on continuous principle;
   - Methods based on interval principle;
   - Circuit training, Weight training.
4. **Fitness:**
   - Concept of a) Total fitness, b) Physical fitness c) Motor fitness.
   - Components of motor fitness: (Strenght, Speed, Endurance, Agility, Flexibiltiy)
   - Coordinative components of fitness: (Orientation, Adaptation, Reaction ability, Differentiation, Coupling, Balance, Rhythm).
5. **Technique:**
   - Concept of Technique, Skill and Style;
   - Stages of Technique learning (First phase of rough coordination, Second phase of fine coordination and Third phase of automatic execution).
   - Principles of technique training.
6. **Planning:**
   - Basic concept of planning of training;
   - Principles of planning;
   - Planning of Micro-, Meso- and Macro cycles.

Reference:

1. Frank Dick : Sports Traning Principles
2. Hardayal Singh : Science of Sports Traning
3. A. K Uppal : Principle of Sports Traning
4. V. L. Garry Kumar, Mamta Manjari Panda : Modern Principles of Athletic Training.

Paper Code	Paper	Paper Title	Marks	Credits
114603	Paper-II	Exercise Physiology & Sports Biomechanics	100	4

Part A: Exercise Physiology

1. **Introduction:** Historical background of exercise physiology: Importance of exercise physiology in sports.
2. **a) Cells; Tissues and Organ:**
   - Cell structure of living organism;
   - Chemical composition;

   b) Tissue: Aggregation of cells and their derivatives of performing specific function;

c) Organ: Aggregation of various types of tissues for specific function of organ.

3. **Introduction of different systems of human body:** Skeleton system; Muscular system; Respiratory system; Cardiovascular system; Nervous system; Endocrine system; Digestive system.
4. **Muscle contraction:**
   - Types of muscle contraction: Isometric, Isotonic, Eccentric and Concentric.
   - Slow twitch and fast twitch fibers; Distribution of slow and fast twitch fibers. Characteristics and importance of slow and fast twitch fibers; Adaptational changes due to different fitness training; Muscle hypertrophy.
5. **Respiratory system:** Introduction and overview of the system; Respiratory muscles; Mechanism and function of the respiratory muscles.

   Pulmonary capacities; Tidal volume; Vital capacity; Residual volume; Forced expiratory volume; Lung volume; Volume of maximum oxygen uptake; Adaptational changes due to exercise.

   Pulmonary ventilation; Exchange of gases in lung and transport of oxygen in blood; Transport of Carbon di oxide; Exchange of gases at he tissue level.

Reference:

1. C.C. Chatterjee : Human Physiology
2. Jack H. Williams : Physiology of Sport and Exercise
3. Jack H. Wilmore : Physiology of Sports
4. Mathew & Fox : Physiology of Exercise
5. McArdle, Catch, Catch : Exercise Physiology

Part B: Sport Biomechanics

1. **Introduction:**
   - Basic concept;
   - Historical background;
   - Importance in games and sports.
2. **Kinesiology:**
   - Meaning and relation with sport biomechanics;
   - Planes and axes for human motion;
   - Fundamental movements around the joints.
3. **Kinematics:**
   - Motion: definition and type;
   - Kinematic parameters of linear and angular motion: Displacement, Speed; Velocity; Acceleration.
   - Relation between linear and angular motion parameters.
4. **Kinetics:**
   - Newton's laws of motion and their application in sports.
5. **Machine function of human body:**
   - Lever: Definition; components, types, mechanical functions, skeletal levers.
   - Wheel & axle: Definition, type, mechanical function, Wheel & Axle arrangements in human body.
6. **Equilibrium:**
   - Definition, type and conditions of equilibrium;

- Factors affecting degree of stability.

Reference:

1. M. Glady Scott : Analysis of Human Motion
2. Luttgens and Wells : Kinesiology
3. J. Dyson : Mechanics of Athletics
4. Petter McGinnis : Biomechanics of Sport and Exercise

Second Year

Paper Code	Paper	Paper Title	Marks	Credits
124601	Paper-III	Sports Psychology	100	4

1. Introduction:
- Meaning of Psychology and Sport Psychology;
- Importance of sport psychology;
- Meaning of growth and development;
- Psychological characteristics of growth and development.

2. Motor learning:
- Definition of learning and motor learning;
- Factors affecting motor learning;
- Selected theories of motor learning: Conditioned response; Insight; Trial and Error.

3. Emotion and sport performance:
- Anxiety: meaning and type: effect of anxiety on sport performance

4. Personality and sport performance:
- Definition of personality.
- Nature of personality.
- Sport participation and personality.

5. Motivation in sport:
- Meaning of motivation
- Types of motivation (Extrinsic and Intrinsic)
- Goal setting – and effective technique of motivation.

Reference:

1. M. L. Kaamlesh : Psychology in Physical Ecucation and Sports
2. Agyajit Singh : Sports Psychology
3. R. May and Michel J. Asken : Sports Psychology
4. Jhelma S. Horn : Advance Sport Psychology

Paper Code	Paper	Paper Title	Marks	Credits
124603	Paper-IV	Sports Nutrition, Care & Prevention of Sports Injuries & Sports Management	100	4

Part A: Sports Nutrition, Care & Prevention of Sports Injuries

1. Introduction: Basic concept and importance in sports;

2. Nutrition:
- Concept of nutrition, Diet, Calorie, Energy balance.
- Components of nutrition – Carbohydrate, Fat Protein, Mineral, Vitamins, Water Fibers.

3. Nutrient balance: Weight control; Blance diet; Pre competition and competition and post compitition. Meals, Diets for athletes of different age, sex and activity.

4. First Aid: Definition and Principles of First Aid.

Injury management: Soft tissue injuries of knee and ankle; rehabilitation of injuries; Injury Management program: Water training; Weight training; cycling; walking; Relaxation. Prevention of injuries through fitness; Warm up and treatment.

Reference:

1. Sue Rodwell Williams : Essentials of Nutrition and Diet Therapy
2. Nancy Clark : Sports Nutrition Guidebook
3. Malinda J. Flegel : Sprot First Aid.

Part B: Sports Management

1. Concept of Sports Management

- Introduction to Sports Management
- What is Sports Management
- Function of Sports Management
- Competency based approach and impements in Sports and Physical Education

2. Organization and Management in Sports

- Organization in sports
- Management of Sports in School. Colleges and Universites, Inter-University, District, Intra mural extrra mural, National and International level.
- Roles and responsibilities of efficient managers.

3. Leadership in Sports Management

- Defination of Leadership
- Types and Importance of leadership in Sports
- Quality of good leader - Creativity, Innovation and Motivation
- Difference between Democratic and Autocratic leadership
- Communications
- Importance of communications in leadership

4. Ethics in Sports Management

- Decision making in Sports
- Types of Decision
- Decision makers
- Effective decision making
- Smart choices

5. Preparation of Planning and Budget

- Planning and Budget
- Types of Planning and Budget
- Qualities of Ferature of good plan
- Nature of General characteristics of Planning
- Various steps in Planning
- Advantage and disadvantage of Planning
- Preparation of budget, Collection fund, Purchase of Sports goods and their Preservation.

Reference:

1. Dr. Abdul Awal Khan and Abu Bokkor Siddikey : Management
2. Cerfo (10th Edition) : Mordern Management
3. S. S. Roy. : Sports Management
4. Harold J. Vanclerzwaag : Sports Management in School & College
5. Mcgrow Hill : Management & Organization

নুসরাৎ শারমিন: জন্ম ১৯৭৫ সালে ০৩ জানুয়ারি ঢাকার তেজগাঁও এলাকায়। গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক(সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। চাকুরি জীবন শুরু হয় বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) ২০০০ সালে। তিনি ২০০২-২০০৩ সেশনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিজিডি ইন স্পোর্টস সাইকোলজি ১ বৎসর মেয়াদী কোর্সটি সম্পন্ন করেন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল রিসার্চ স্কলার হিসেবেও কাজ করেন। এরপর তিনি ২০১১ সালে সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা (স্পোর্টস সাইকোলজি) পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি বিকেএসপির ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগে ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

মো. বখতিয়ার: ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারি ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার বাড়ইপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা: মো: জসিম উদ্দিন মাতা: আয়েশা আক্তার। তিনি ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে বাংলাদেশ হেলথ প্রফেসন্স ইনস্টিটিউট, সিআরপি হতে ব্যাচেলর অব ফিজিওথেরাপি ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর নিউরোমেডিসিন বিভাগ হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ২০০৮ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিকেএসপি হতে ক্রীড়াবিজ্ঞানের এক্সারসাইজ ফিজিওলজি বিষয়ের উপর প্রথম বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ২০১১সাল হতে বিকেএসপিতে এক্সারসাইজ ফিজিওলজি বিভাগে সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা পদে কর্মরত। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক স্নাতকোত্তর কোর্সের স্কলার। দেশি-বিদেশি জার্নালে তার বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ড. আবু তারেক: ৪ জুলাই ১৯৮২সালে চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জনাব আবু তাহের এবং মিসেস নার্গিস আকতার-এর বড় সন্তান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিজিডি ইন স্পোর্ট সায়েন্স (স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স)-এ ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন ২০১০ সালে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থ বিজ্ঞানে এমফিল পার্ট-১ সম্পন্ন করেন। এবং ২০১৬সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে ইন্দিরাগান্ধি ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড স্পোর্টস সায়েন্স হতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। দেশি-বিদেশি জার্নালে তার বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

সাদেকা ইয়াসমীন: জন্ম ১৯৭০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। পিতা: মরহুম ইয়াসিন মিয়া, মাতা: মরহুম সালেহা বেগম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স (১৯৯১) সহ মাষ্টার্স (১৯৯২) করেন জিওলজিক্যাল সায়েন্স এ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োমেকানিক্স বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা (২০০২-২০০৩)-এ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে পিএইচডি গবেষণারত ও বিকেএসপিতে বায়োমেকানিক্স বিভাগে রিসার্চ এসোসিয়েট হিসেবে ২০০৭ সাল হতে কর্মরত। বিভিন্ন জার্নালে তার বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মোহাঃ শফিকুল ইসলাম: মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামে ১৯৮০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৩ সালে মনোবিজ্ঞানে বিএসসি (অনার্স), ২০০৪ সালে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস সাইন্সে স্পোর্টস সাইকোলজিতে ডিপ্লোমা এবং ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়াবিজ্ঞান শাখায় স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট হিসেবে যোগদান করেন। দেশি-বিদেশি জার্নালে তার বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

আবু ওবায়দা ভূঞা শিংকন: ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৭ সনে নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার মোজাফরপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ঢাকা হতে ৩ বছর মেয়াদী ডিপোমা ইন ফিজিওথেরাপি কোর্স সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসএস ডিগ্রি ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপোমা ইন স্পোর্টস সাইন্স (এক্সারসাইজ ফিজিওলজি) ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের সূচনা লগ্নে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের অধীনে স্পোর্টস মেডিসিন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০০১ সাল হতে অদ্যবদি বিকেএসপিতে ফিজিওথেরাপিস্ট পদে কর্মরত আছেন। দেশি-বিদেশি জার্নালে তার বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

লুৎফা আক্তার: ১১ই মে ১৯৭৮ ইং সনে মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ঘোষ্টা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের অধীনে ইনস্টিটিউট অবহেল্থ টেকনোলজি ঢাকা হতে ৩ বছর মেয়াদী ডিপোমা ইন ফিজিওথেরাপি কোর্স সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএসএস ডিগ্রি ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপোমা ইন স্পোর্টস সাইন্স (এক্সারসাইজ ফিজিওলজি) ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের সূচনা লগ্নে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের অধীনে স্পোর্টস মেডিসিন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০০১ সাল হতে অদ্যবদি বিকেএসপিতে ফিজিওথেরাপিস্ট পদে কর্মরত আছেন। দেশি-বিদেশি জার্নালে তার বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।